# বাংলা ভাষায় জাপান-চর্চা (১৮৬৩-১৯৪৭)

লোপামুদ্রা মালেক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৭৩/২০১২-২০১৩

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর ২০১৮

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

## অঙ্গীকারনামা

আমি লোপামুদ্রা মালেক (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৭৩/২০১২-২০১৩, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে পিএইচ.ডি.ডিগ্রির জন্য evsjv fvlvq Rvcvb-PPv (1863-1947) শিরোনামে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য বা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করিনি।

লোপামুদ্রা মালেক

*Dhaka University Institutional Repository*

## প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, লোপামুদ্রা মালেক কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত evsjv fvlvq Rvcvb-PPv (1863-1947) শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য বা প্রকাশনার জন্য অন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্ত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদানের জন্য অনুমোদন দেওয়া হলো।

সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

evsjv fvlvq Rvcvb-PPv (1863-1947) শিরোনামে রচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটির তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, অনুপ্রেণা, সামগ্রিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাই আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ স্যারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিবাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীস্মদেব চৌধুরী স্যারের কাছে, যিনি আমার গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিতেন, গবেষণা কর্মটি দ্রুত শেষ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন, এবং গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া জাপানের কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি ও এনভায়রনমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুও নোমা বিভিন্ন দুর্বোধ্য জাপানি শব্দের অর্থ বুঝতে ও তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর নিকটও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভের বেশ কিছু মূল্যবান উপাত্ত ও আকর কলকাতার আলীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঠাগার ও হুগলীর উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এসকল মূল্যবান উপাত্ত ও আকর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন শ্রীমান কৌশিক ভট্টাচার্য ও শ্রীমান অভিজিৎ সিদ্ধান্ত। তাদের উভয়ের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে ঋণী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যারা বিভিন্ন সময় অভিসন্দর্ভটির বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে আমার কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত স্যারের অনুপ্রেরণা ও নিয়ত তাগিদ অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই তাঁর নিকট আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভ ও জাতীয় গ্রন্থাগার হতে এই অভিসন্দর্ভ রচনার বহু উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব সংগ্রহে সহায়তা পেয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তার। তাদের সবার প্রতি আমি ঋণ স্বীকার করছি।

জন্মের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। কিন্তু এই অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুপ্রেরণা, তথ্য সংগ্রহ, দিক-নির্দেশনা ও রচনার প্রতিটি পর্যায়ে যাঁর নিরলস প্রচেষ্টা একে বাস্তব রূপদানে সহায়তা করেছে তিনি

*Dhaka University Institutional Repository*

আমার পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্ত্তী। শৈশব থেকে পিতৃগৃহে গবেষণার যে আবহে পিতার সাহচর্য পেয়েছি সে আদর্শকে কিছুটা ধারণ করার সক্ষমতার ফসল এই অভিসন্দর্ভ। তাই তাঁর সন্তান হওয়ার গর্বিত অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আর তাঁর ঋণ স্বীকার করার ধৃষ্টতাও আমার নেই। তবুও নিয়ম রক্ষার স্বার্থে আজন্ম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর নিকট।

আমার স্নেহময়ী জননী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী এই অভিসন্দর্ভ রচনা যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্রেরণা জুগিয়েছেন। সন্তান কর্তৃক তাঁর মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এক প্রকার বালখিল্যতা, তাই এখানে নিরবে শ্রদ্ধা জানানোই শ্রেয়। আমার পরম প্রিয় সন্তানদ্বয় রাহুল ও রাকা নিয়ত মৌনব্রত অবলম্বন করে তাদের জননীর গবেষণা পরিচালনার জন্য অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছে। অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে যেয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে এর প্রধান কারণ আমার পেশাগত ব্যস্ততা। পরিশেষে গবেষণা কর্মটি করতে পেরে আমি আনন্দিত।

লোপামুদ্রা মালেক

*Dhaka University Institutional Repository*

## সার-সংক্ষেপ

evsjv fvlvq Rvcvb PPv (1863-1947) শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই ছয়টি অধ্যায় হলো (ক) জাপানের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি; (খ) জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস; (গ) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য; (ঘ) জাপানের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা; (ঙ) জাপানি সাহিত্য; (চ) জাপানের সংস্কৃতি। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় স্বনামেই অর্থবহ। তবুও অভিসন্দর্ভের আনুষ্ঠানিকতার জন্য সার-সংক্ষেপ দেয়ার রীতি বিদ্যমান।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাপানের জাপানের ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি। একথা অনেকেরই জানা যে একটি দেশের ভূ-সংস্থাপনিক অবস্থা ও অবস্থান সে দেশের জনগণের খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক, অভ্যাস, রীতি-নীতি ইত্যাদিও ওপর ফেলে সুগভীর প্রভাব। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত জাপানের তিন ভাগের দুই ভাগ পাহাড় ও পর্বত। রয়েছে কয়েকটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ভূ-কম্পন এই দেশের নিত্যদিনের সঙ্গি, যার ফলে জীবনযাত্রা অনিশ্চিত। জাপানের সভ্যতার উষালগ্ন হতে এসকল অবস্থা প্রভাবিত করেছে তথাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি। তবে এসকল বিষয় সম্পর্কে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অপ্রতুল।

জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল আলোচনার বিষয়। জাপানে রাজতন্ত্রের প্রাচীনত্ব সুদীর্ঘকালের, তবে পরবর্তীকালে সেখানে সামন্ততন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। চলে দাইমিও, সামুরাই ও শোগুনদের শাসন। প্রাচীনকাল হতেই জাপান ছিলো একটি অবরুদ্ধ দেশ। সেখানে জার্মান, চীন, কোরিয়া ও ওলন্দাজদের ব্যতীত অন্য কোন সভ্যতার প্রবেশাধিকার ছিলোনা। ১৮৫৩-১৮৫৪ সালে আমেরিকার কমোডর ম্যাথিউ গলব্রেথ পেরি জাপান আক্রমণ করে সেখানে বাণিজ্যের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলে জাপান বিশ্ববাসীর নিকট হয় পরিচিত। ১৮৬৮ সালে মেইজি রাজবংশের পুন:প্রতিষ্ঠা হলে জাপান আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয় এবং ১৯০৪ সালে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে একটি পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় চীন ও কোরিয়ার সাথে যুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাংলা ভাষায় জাপানের সকল সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না গেলেও ১৯০৪ সাল থেকে মোটামুটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাপানের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের ধারা। এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে জাপানিরা খুবই অনুকরণ প্রিয়। কৃষি ও বাণিজ্যে জাপান পূর্বেই সুনাম অর্জন করেছিলো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভালো শিল্প শিখে, সে বিষয়ে তাঁরা আনে উৎকর্ষ, ফলে বাণিজ্যেও জাপানিরা হয়ে যায় অগ্রগণ্য। তাঁরা বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য তৈরি করে এবং আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজস্ব মেধা, শ্রম ও কৌশলের প্রমাণ দেয়। জাপানের এই অগ্রগতি বাঙালি লেখকগণ স্বাগত জানিয়েছেন এবং ভারতের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে জাপানের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জাপানের সমাজে আসে লক্ষনীয় পরিবর্তন। প্রাচীণপন্থি জাপানিরা এই পরিবর্তনের জোয়ারে অবগাহণ করতে অনিচ্ছুক থাকলেও তাঁদের করণীয় কিছুই ছিলো না। কেননা নবীন জাপানি পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে মুগ্ধ এবং তারা চায় উদারনৈতিক পরিবর্তন। যে জাপানি নারীর বিয়ে তার পিতা-মাতা আয়োজন করতেন, সেই নারী এখন নিজেরাই পছন্দ করেন। বক্তব্য খুব জোড়ালো ও পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ। অপরিচিতকে কোনভাবেই বিয়ে করা সম্ভব নয়। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জাপানি সাহিত্য। জাপানি কবিতায় কোন গুরু-গম্ভীর শব্দ নেই, নেই হৃদয়ের স্বাভাবিক অকুলতা। আছে দল গঠনের প্রবণতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা কিছুদিনের জন্য জাপানি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিলো। কিন্তু সরকারের রুদ্ধ রোষে সাহিত্যও সরকারি হয়ে যায়। সাহিত্য সমর্থন করে ফ্যাসিষ্ট জাপানের যুদ্ধ নীতিকে। তবে এসকল সাময়িক, কোনভাবেই স্থায়ী নয়। পরে চলে সৃজনশীল সাহিত্য রচনার চেষ্টা।

জাপানের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। জাপানের সংস্কৃতির উপাদান এতই বেশী যে, একটি ছোট অধ্যায়ে তাকে যথাযথভাবে আলোচনা করা যায়না। খুবই উপভোগ্য করে জাপানি নারী নাচে, এই নাচ উলঙ্গ হলেও নির্মল। যৌবনের প্রগল্ভতা সেখানে অনুপস্থিত। শিশুদের খেলা বিস্তর। চা একটি আধ্যাত্বিক উৎসব এবং যথেষ্ট উপভোগ্য। বর্ণমালা দু'টি হলেও লেখার সুবিধার জন্য চীন হতে কাঞ্জি ধার করে আনা হয়েছে, যদিও চীনা কাঞ্জির অর্থ স্বতন্ত্র। সিদ্ধম লিপি উত্তর ভারত হয়ে সিল্ক রোড ধরে প্রথমে চীনে এবং পরে জাপানে স্থান কওে নিয়েছে। আজো চলছে জাপানে সিদ্ধম লিপি। উপসংহার অংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারৎসার।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ভূমিকা | | ১ |
| প্রথম অধ্যায় | :জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি | ১০ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | : জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস | ৪৩ |
| তৃতীয় অধ্যায় | : কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য | ৮৩ |
| চতুর্থ অধ্যায় | : জাপানের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা | ১১৫ |
| পঞ্চম অধ্যায় | : জাপানি সাহিত্য | ১৬৫ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | : জাপানের সংস্কৃতি | ২০৬ |
| উপসংহার | | ২৩৪ |
| সহায়ক গ্রন্থ | | ২৪৮ |
| পরিভাষাকোষ | | ২৫৮ |
| পরিশিষ্ট | | ২৬৫ |
| আলোকচিত্র | | ২৮০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

# সারণির তালিকা


সারণি: ১ বৌদ্ধ ধর্মীয় কতিপয় অনুশাসন ৩৩

সারণি: ২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ও চট্টগ্রামের রাজকীয় সমাধিতে উল্লিখিত জাপানি সৈনিকদের নাম ও পুনঃসমাধিকরণের সময় ৭৭

সারণী: ৩ প্রসিদ্ধ দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান ৯৬

সারণী: ৪ ১৮৯৯ সালে জাপানে বিভিন্ন শিল্প ও বানিজ্যিক কোম্পানির সংখ্যা ১০৩

সারণী: ৫ উনিশ শতকের শেষার্ধে জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির হার ১০৩

সারণি: ৬ জাপানে পারিবারিক সদস্যদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের প্রক্রিয়া ১৩২

সারণি: ৭ বাংলা অর্থসহ জাপানি খাদ্য তালিকা ২২৩

# ভূমিকা

চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,

তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,

দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান

ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়।

—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা ভাষায় জাপানচর্চার সূচনা কবে হয়েছিল তা নিয়ে লেখকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে বাংলা ভাষায় জাপানচর্চার সূচনার ইতিহাস অনেকটা তমসাবৃত। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে আলোচনা করেন প্রবীর বিকাশ সরকার তাঁর Rvbv ARvbv Rvcvb গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। প্রবীর বিকাশ সরকার তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন ২০০৯ সালে। বাংলা ভাষায় জাপানচর্চার ক্ষেত্রে এই দুই গ্রন্থ তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে বলে ধারণা করা হয় না। এই দুই গ্রন্থে বিখ্যাত বাঙালিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল (১৮৮৬-১৯৬৭), নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭- ?), বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) প্রমুখকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে জাপানের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে কাকুজো ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬২-১৯১৩), চিত্রগ্রাহক ইচিনোসে তাইজো, মাসাআকি তানাকা প্রমুখ আলোচিত হয়েছেন। প্রবীর বিকাশ সরকারের গ্রন্থে কোনো কালানুক্রমিক ও বস্তুধর্মী আলোচনা নেই, রয়েছে আবেগ-প্রসূত বর্ণনা। এই দুই খণ্ডে আলোচিত বিষয়ের অনেকটাই জানা।

বাংলাদেশের সিলেটের সন্তান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র প্রবীর বিকাশ সরকার ছড়াকার, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক ও গবেষক। ছড়ার জন্য তিনি পুরস্কৃত হন চট্টগ্রামের অধুনালুপ্ত ^‘wbK Rgvbv পত্রিকা থেকে। বৈবাহিকসূত্রে প্রবীর বিকাশ সরকার জাপানি নাগরিক। দুই

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ডের বইয়ে তিনি বাঙালি ও জাপানি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ভারত, বাংলাদেশ ও জাপানের ইতিহাসের খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছেন (প্রবীর, ১৪১৪)।

প্রবীর তাঁর গ্রন্থে জাপানের মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় ১৯৬৮ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। একে মুদ্রণ প্রমাদ বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি এমন কিছু শাসনব্যবস্থার তথ্য প্রদান করেছেন যার পক্ষে ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক সাক্ষ্য নেই। তিনি লিখেছেন, 'জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়', অবশ্য এই বক্তব্যের শেষে তিনি বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) প্রদান করেছেন। কিন্তু সঠিক অর্থে এভাবে তথ্য প্রদান প্রকৃত গবেষণার নীতি-বিরুদ্ধ। তিনি কয়েকজন ইউরোপীয়, জাপান ও আমেরিকার পণ্ডিতের মতের উপর ভিত্তি করে উপর্যুক্ত অনুমিতি প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডা. এ্যালান রোনাল্ড একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব। ডা. এ্যালান রোনাল্ড (জন্ম ১৯৩০) আমেরিকার একজন মনঃসমীক্ষণবিদ যিনি ১৯৮৮ সালে *In Search of Self in India and Japan : Towards a Cross-Cultural Psychology* শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রবীর বিকাশ সরকার এই গ্রন্থকে 'একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ডা. এ্যালান রোনাল্ড ভারত ও জাপানের সম্প্রসারিত পরিবার প্রথাকে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারত ও জাপানে ফ্রয়েড বা পাশ্চাত্য ভাবধারা অচল। এ্যালান রোনাল্ডের এই গ্রন্থের সমালোচক হলেন কানাডার কালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারল্ড কাউওয়ার্ড, যিনি এটিকে নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী বলেছেন। সবশেষে KvDIqvW মন্তব্য করেছেন : The treatment of Japan, however, is weak. Analysis of Indian experience is overly influenced by Vedanta philosophy and shows no sensitivity to the cultural diversity within India(Harold Coward, 1990 : 27).অথচ এই গ্রন্থকে প্রবীর 'একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করে উল্লেখ করেছেন যে, জাপানিদের পূর্বপুরুষ ভারতীয়। প্রবীর মনে করেন জাপানের প্রাচীন বর্ণমালার উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতের পার্বত্যাঞ্চলে। ভারতের উত্তরাঞ্চল উল্লেখ করলে বক্তব্যে কিছুটা হয়তো ভিত্তি থাকতো। কেননা প্রাচীনকালে উত্তর ভারতের একটি 'সিদ্ধম্' বর্ণমালা প্রাচীনকালে 'সিল্ক রোড' দিয়ে চীনে চলে যায় এবং সেখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় জাপানে। সিদ্ধম্ লিপিকে বলা হয়েছে 'অবুগিদা' (abugida)যা একপ্রকার আদ্য-অক্ষরমালা এবং একপ্রকার বিখণ্ডিত লিখন পদ্ধতি(লোপামুদ্রা, ২০১২: ১৯৪)। এই লিখন পদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো ব্যঞ্জনবর্ণ, তবে এখানে স্বরবর্ণ ব্যবহারের আবশ্যকীয়তা থাকলেও তা অপ্রধান। এখানে প্রচলিত বর্ণমালার সঙ্গে এই লিপির বৈশাদৃশ্য লক্ষণীয়, কেননা প্রচলিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সমান অবস্থান ও মর্যাদা থাকে। কিন্তু এই লিপির ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ প্রায় অনুপস্থিত অথবা ঐচ্ছিক। আরো পরিষ্কারভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায় যে সিদ্ধম্ লিপির প্রতিটি বর্ণ এক একটি শব্দ, সুতরাং শব্দ গঠনের জন্য এই লিপিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যৌথ ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় নয়।

সিদ্ধম্ লিপি হলো প্রাচীন ভারত উপমহাদেশের ‘ব্রাহ্মী’ লিপির উত্তরসূরী ও ‘দেবনাগরী’ লিপির পূর্বসূরি’। সিদ্ধম্ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষার ‘সিদ্ধ’ শব্দ হতে—যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সাফল্যমণ্ডিত। সিদ্ধম্ লিপি আনুমানিক ৬০০-১২০০ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধম্ লিপি উদ্ভূত হয় ‘গুপ্ত’ লিপির মাধ্যমে ‘ব্রাহ্মী’ লিপি থেকে এবং পরিণতি লাভ করে দেবনাগরীসহ কয়েকটি এশিয় লিপি হিসেবে—যার মধ্যে ‘তিব্বতীয়’ লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধম্ লিপি বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লক্ষ্য করা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ‘গৌতম’-এর পূর্ণ নাম ‘সিদ্ধার্থ-গৌতম’। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্র ও অন্যান্য বিষয় রচনার জন্য এই লিপির ব্যবহার, সেজন্য ‘সিদ্ধার্থ-গৌতম’-এর নামানুসারে এই লিপিটির নামকরণ করা হয়েছে সিদ্ধম্। লিপিটির নাম ‘সিদ্ধম্’ না ‘সিত্তম্’ সে বিষয়ে যে মতানৈক্য তা আধুনিককালের। কেবল জাপানিরাই সিদ্ধম্ লিপিকে ‘সিত্তম্’ লিপি হিসেবে অভিহিত করে। জাপানিরা সিদ্ধম্ লিপিকে ‘বন্‌জি’ (Bonji)হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তাদের সহজাত উচ্চারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সিদ্ধম্‌কে উচ্চারণ করে সিত্তম্। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলাদেশে প্রাচীন ইতিহাসের উৎস ও উপাত্তের মধ্যে কেবল একটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধম্ লিপি ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। এগারো শতকের প্রারম্ভ হতে প্রায় দেড়শত বছর চন্দ্রবংশ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় তথা তৎকালীন বঙ্গ ও সমতটে শাসন পরিচালনা করে (রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬ : ৩৫৪)। বাংলাদেশে চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামন্ত সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র। তিনি এই বংশের স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং আনুমানিক ৯০০ থেকে ৯৩০ সাল পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন। চন্দ্র বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজা ছিলেন শ্রীচন্দ্র, যিনি সাফল্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর শাসন পরিচালনা করেন। শ্রীচন্দ্রের শাসনামলেই সমগ্র বঙ্গ অঞ্চল ও উত্তর-পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত চন্দ্রবংশের শাসন সম্প্রসারিত হয়। বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রশাসনে শ্রীচন্দ্রের কামরূপ অভিযান ও সিলেট এলাকায় বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। আর এই পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রয়েছে প্রতীক হিসেবে ‘সিদ্ধম্’। এই তাম্রলিপির একেবারে উর্ধ্বে উৎকীর্ণ রয়েছে প্রতীক হিসেবে ‘সিদ্ধম্’ এবং এখানে লিপিটিও ‘সিদ্ধম্’। জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সেক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে ‘সিদ্ধম্’-এর ব্যবহার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশের শাসনের চূড়ান্ত দক্ষতা ও উৎকর্ষ অর্জনের জন্যই পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে প্রতীক হিসেবে সিদ্ধম্ উৎকীর্ণ হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে ‘সিদ্ধমাতৃকা’ শব্দটির অবতারণা করা হয়েছে যার অর্থ ‘প্রসিদ্ধ দেশ’।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

একথা সত্য যে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাপানের সঙ্গে ভারতের মিল রয়েছে আর এই সাযুয্যের পশ্চাতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের অবদান। সুতরাং প্রবীরের বক্তব্যের কোনো সরবত্তা রয়েছে, এটা বলা যায় না।

২০১২ সালে সুব্রত কুমার দাস সেকালের বাংলা সাময়িকপত্রে Rvcvb শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জাপান ১৮টি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন। সুব্রত তাঁর গ্রন্থটি প্রবীর বিকাশ সরকারকে উৎসর্গ করেছেন। সুব্রত গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন : ‘১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) ভারতীতে জাপান বিষয়ক প্রধান লেখক হলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)। সে বছর তাঁর যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো হলো ‘জাপানে ভিক্ষুক’ (বৈশাখ), ‘জাপানের সভা সমিতি’ (শ্রাবণ), ‘জাপানের শহর’ (কার্তিক, অগ্রহায়ণ), ‘জাপানের সংবাদপত্র’ (মাঘ), ‘জাপানের খেলা (ফাল্গুন)। ‘জাপানের শহর’ প্রবন্ধটি দুই কিস্তিতে ছাপা হয়। এটি ছিল সচিত্র প্রবন্ধ। খেলা বিষয়ক প্রবন্ধটিও সচিত্র ছিল।...ধারণা করা হয় জাপান থেকে ফিরে যদুনাথ সরকার তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হতে থাকে (সুব্রত, ২০১২ : ২৬-২৭)। তিনি লিখেছেন :

> ‘ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের জীবনী সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্যের অভাবে এটি অস্পষ্ট, ঠিক কোন সালে কত দিনের জন্য তিনি জাপানে অবস্থান করেছিলেন। তবে বোঝা যায় তাঁর জাপান যাত্রা ছিল ডিগ্রি লাভের জন্য এবং আট মাসের বেশি তিনি সেখানে অবস্থান করেন’ (সুব্রত, ২০১২ : ৩০)।

জানা যায়, সুব্রত বাংলা একাডেমি চরিতাবিধান থেকে ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের জীবনী দেখেছেন এবং সেজন্য যদুনাথ সরকারের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিক। তবে তিনি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন যা সঠিক নয়। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের জীবনী ও রচনাপঞ্জি তৈরি করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু দে ও বিনয়ভূষণ রায়। কিংবদন্তি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ইতিহাস ও ইংরেজিতে সম্মান নিয়ে এমএ পাশ করেন এবং এরপর তিনি আর কোনো ডিগ্রি অর্জন করেননি। যদিও পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি পেয়েছিলেন। ভারতী সাময়িকপত্রের লেখক যদুনাথ সরকার এবং কিংবদন্তি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এক ব্যক্তি নন। ভারতী সাময়িকপত্রের লেখক যদুনাথ সরকার জাপানের কৃষি কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি বাংলার কৃষি বিভাগের সহকারী পরিচালক ছিলেন (হংসনারায়ণ, ১৯৯২ : ১২)।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতী সাময়িকপত্রের লেখক যদুনাথ সরকার সম্পর্কে সুব্রতর তথ্য বিভ্রান্তির শেষ এখানেই নয়। মাসিকপত্র ভারতীতে প্রকাশিত যদুনাথ সরকারের ‘জাপানে ভিক্ষুক’ প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখেছেন– ‘জাপানে ভিক্ষুক আছে কি নাই তা নিয়ে শুরু করে লেখক বলেছেন যে রাস্তায় একদিন তিনি পড়ে থাকা দুটি মুদ্রা পান। মুদ্রা দুটি কোনো কোনো ভিক্ষুককে দিয়ে দেবেন সিদ্ধান্ত নিলেও সে সিদ্ধান্ত তিনি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। শেষে একজন আতুরকে মুদ্রা দুটি দান করেন’। তিনি লিখেছেন যে, ‘শেষে একজন আতুরতে মুদ্রা দুটি তিনি দান করেন’। এই বক্তব্য মিথ্যা। মাসিকপত্র ভারতীতে যদুনাথ সরকার নিম্নোক্ত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশ করেছিলেন (১) ‘জাপানে ভিক্ষুক’, ভারতী, ৩৪ বর্ষ বৈশাখ, ১৩১৭ (১৯১০), পৃ. ২৯-৩২ ও (২) ‘নীপনীসমাজ’ ভারতী, ৩১ বর্ষ আষাঢ়, ১৩১৪, পৃ. ২০০-১২। এই প্রবন্ধ দুটির কোনো স্থানে এই তথ্য নেই যে– ‘শেষে একজন আতুরকে মুদ্রা দুটি তিনি দান করেন’। এরূপ তথ্যভ্রান্তি সঠিক ইতিহাস গবেষণা বহির্ভূত বিষয় ব্যতীত বৈ আর কিছু নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নির্বাণ বসু BwZnv‡mi c‡_ c‡_: Aa¨vcK Awbiæ× ivq m¤§vbbv গ্রন্থে (২০১৬) ‘বাংলায় জাপানচর্চা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে– ‘বাংলাদেশে আধুনিক জাপানের ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটেছে প্রধানত পাঠ্যসূচির (পাঠ্যসূচির) তাগিদে। শ্রদ্ধেয় নিবেদিত প্রাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত জাপানের ইতিহাসকে এক পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।’ অবশ্য অতীত বাংলায় জাপানচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক নির্বাণ বসু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথনাথ গুপ্ত, ড. বিনয়কুমার সরকার, হরিপ্রভা তাকেদা ও সরোজনলিনী দত্ত প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক নির্বাণ বসু জাপানকে পরিচিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান-যাত্রী থেকে বেশ কিছু তুলে দিয়েছেন। সঠিক অর্থে এই প্রবন্ধে ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জাপানের ইতিহাস–এই তথ্য ব্যতীত আর নতুন কোনো চিত্তাকর্ষক আলোচনা নেই।

প্রকৃতপক্ষে অনেকটা বাংলার ইতিহাসচর্চার মতো বাংলায় জাপানচর্চা শুরু হয়। ১৮৪০ সালে জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭) *Outline of the History of Bengal Compiled for the Youths in India*শীর্ষক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই গ্রন্থই ছিল কালিদাস মৈত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস রচনার মতো একমাত্র আকার গ্রন্থ। ১৮৫৩ সালে আমেরিকার নৌ-জরিপকারক কমোডোর ম্যাথিউ কলব্রেইথ পেরি (১৭৮৪-১৮৫৮) জাপান আক্রমণ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি *Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, Performed in the Years 1852, 1853, and 1854, under the Command of Commodore M.C. Perry, United States Navy*শীর্ষক গ্রন্থ

*Dhaka University Institutional Repository*

রচনা ও প্রকাশ করেন। পেরির এই গ্রন্থ ১৮৬৩ সারে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় †Rcvb শিরোনামে অনুবাদ করেন। বহুসংখ্যক চরিতাভিধান খুঁজেও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের কোনো পরিচয় জানা যায়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্বেও এটিকে নিঃসন্দেহে জাপান সম্পর্কে বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ১৮৬৩-১৯৪৭ সালের মধ্যে জাপান সম্পর্কে বাংলায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আনোয়ার হোসেন, AvaywbK Rvcvb, (কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪১); সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, nvbwl, (কলিকাতা, ১৩১৯; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Rvcvb, কলিকাতা, ১৩১৭); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rvcvb-cvi‡m¨, (কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩২৬); সত্যেন্দ্রনাথ বসু, Rvcvbx e›`x-wkwe‡i, (কলিকাতা, ১৯৪৫) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, (কলিকাতা, ১৯৪৩); মন্মথনাথ ঘোষ, Rvcvb-প্রবাস, (কলিকাতা, ১৯১০); রামানাথ বিশ্বাস, hhrm Rvcvb, (কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫২); মন্মথনাথ ঘোষ, mwPÎ mß Rvcvb, (কলিকাতা ১৩২২); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rvcvb-hvÎx, (কলিকাতা, ১৯১৯); হরিদাস ভট্টাচার্য, জাপানের অভ্যুদয়, (কলিকাতা, ১৯১৩); সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Rvcvb, (কলিকাতা, ১৯১০); নলিনীভঞ্জ চৌধুরী, iæI-Rvcvb h‡×i BwZnvm, (কলিকাতা, ১৯১০); চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, †bvOi †Qov †bŠKv, (কলিকাতা, ১৯২৪); সরোজনলিনী দত্ত, Rvcv‡b e½bvix, (১৩৩৫); মন্মথনাথ ঘোষ, be¨ Rvcvb, (কলিকাতা, ১৩২২); হরিপ্রভা তাকেদা, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা,(১৯১৫); নামিকো Kenjino Tokutomiলিখিত এবং Sakae Shioyaও Edwin Francis Edgittকর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদিত গল্পের বঙ্গানুবাদ করেছেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা, ১৯১৫); সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, GKwU emšÍ-cv‡Zi cùwUZ mvKivc®ú, (১৯০৪), (১৭ শতকে জাপানের একটি সত্য গল্প); রসিকলাল গুপ্ত, bexb Rvcvb, কলিকাতা, (১৯০৭); gvLbjvj †mb, জাপান, (কলিকাতা, ১৯৪৫); নলিনীবালা সোম, Rvcvb Kwnbx, (কলিকাতা, ১৯১৯); চারুচন্দ্র ঘোষ, Rvcv‡bi DbwZ nBj wKi/‡c, (কলিকাতা, ১৯১৭); মাখনলাল সেন, Rvcv‡bi mswÿß BwZnvm, (কলিকাতা, ১৯২৩); চিত্ত গুহ, Rvcvb, (কলকাতা, কালচারাল ক্লাব, ১৯৪১); বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, Rvcvbx h‡×i Wv‡qix, (কলিকাতা, ১৯৪৫); উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জাপান রহস্য, (১৯২৩); প্রাণকৃষ্ণ পাল, Rvcvbx g¨wRK ev Wxgwe`¨v, (কলিকাতা, ১৯২৯), হিমাংশু গুপ্ত, Rvcvbx wdd_ Kjvg, (কলিকাতা ১৯৪৫); বিজয় কুমার ব্যানার্জী, Rvcvbx iYbxwZ, (কলিকাতা, ১৯৪৭); বিজয় রায়, Rvcvbx kvm‡bi Avmj i/c, (কলিকাতা, ১৯৪৬); সতীশচন্দ্র গুহ, Rvcv‡bi K_v I wkí msev`, (কলিকাতা, ১৯৩৫); দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, eZgvb Rvcvb, (কলিকাতা, ১৯৪৭); গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন চীন ও নবীন জাপান, (কলিকাতা, ১৯৪৭); নরেন্দ্রনাথ সিংহ, AvaywbK Rvcvb I eZgvb h×, (কলিকাতা, ১৯৪৭); উমাকান্ত হাজারী, be¨ Rvcvb I iæI-Rvcvb h‡×i mswÿß BwZnvm, (কলিকাতা, ১৯০৫)।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ে জাপান সম্পর্কে বাংলায় গদ্য ও পদ্য উভয় ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়। তবে গদ্য রচনার সংখ্যা বেশি। ১৯১৩ সালে খিদিরপুর একাডেমীর প্রধান শিক্ষক হরিদাস ভট্টাচার্য বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্যে জাপানের অভ্যুদয় রচনা করেন। এখানে পদ্যছন্দে জাপানের উত্থান ও অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

১৯২৮ সালে আবদুল আমিন ভূঁঞা জাপান ও বঙ্গে প্রলয় ভূমিকম্প সম্পর্কে গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ দেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার বিশেষভাবে কোলকাতার অবস্থার উপর কবিতা রচনা করেন। অনুরূপভাবে ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উনিশ শতকের শেষের দিকে চীন বিজয়ী জাপানি সমর নায়ক জেনারেল নোগি বিরচিত কবিতার খুব সুন্দর অনুবাদ করেছেন। এই কবিতাটি পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। জাপান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যত আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে জাপানের সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রণী ভূমিকা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে সুব্রত কুমার দাস, যদুনাথ সরকারের সাহিত্য পত্রিকা-য় প্রকাশিত প্রবন্ধের যে সংখ্যা দিয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। সম্ভবত তিনি সাহিত্য পত্রিকার সকল সংখ্যা বাংলাদেশে পাননি; অন্যদিকে তিনি সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় রচনাপঞ্জি শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থটিও হয়তো পাননি। ফলে তাঁর জাপান সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের রচনাপঞ্জি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ।

জাপান ভ্রমণ করে জাপানি বিষয় নিয়ে যারা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড দুঃখবোধ কাজ করেছে। অনেক সময় ভারতের প্রসঙ্গ এসেছে এবং মূল বক্তব্য হলো ভারত কেনো তখনও পিছিয়ে ছিল। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারতে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলছিল। ফলে সেসময় ভারতে জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে পরিচালিত হচ্ছিলো সম্পদ লুণ্ঠনের আপ্রাণ চেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জাপানের মতো হয়ে ওঠার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। উল্লেখ্য যে, জাপানের দীর্ঘকালীন ইতিহাসে কখনোই দেশটি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিলনা।

আর একটি প্রশ্ন আলোচনার দাবি রাখে। প্রতিটি দেশ ও সভ্যতার নিত্যদিনের খাদ্য বা উৎসবে পরিবেশিত খাদ্যের প্রকৃতি নির্ভর করে সেদেশ ও সভ্যতার ভূমি, জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশ, খাদ্য উৎপাদন ও প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি ভূ-সংস্থাপনিক অবস্থার উপর। যাঁরা জাপান ভ্রমণ করেছেন জাপানের খাবার সম্পর্কে তাঁরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মত ভিন্ন। হরিপ্রভা তাগেদা ও সরোজনলিনী দত্ত উভয়ের মতে জাপানের খাবার খারাপ। এতটাই খারাপ যে, খাবারের গন্ধে তাঁদের বমির ভাব হতো। কিন্তু মন্মথনাথ ঘোষ, যদুনাথ সরকার এবং আরো যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত পুরুষ জাপানে ছিলেন তাঁদের তেমনটা মনে হয়নি। সম্ভবত হরিপ্রভা তাকেদা ও সরোজনলিনী দত্ত প্রত্যাশা করেছিলেন জাপানি খাবার বাংলার খাবারের মতই হবে। তাঁরা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারত থেকে ৫,৯৬৮ কিলোমিটার দূরত্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বহুসংখ্যক পাহাড়, পর্বত ও দ্বীপময় জাপানের তাপমাত্রা, আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূ-সংস্থাপনিক অবস্থা ভারত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং সেখানে ভারতীয় খাবার পাওয়া যাবে এরূপ প্রত্যাশা সঠিক নয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)-এর কন্যা শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪) তাঁর স্বামীর সঙ্গে ১৯৩৭ সালে জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সরোজনলিনী দত্ত ও হরিপ্রভা তাকেদার ন্যায় জাপানি খাবার সম্পর্কে শান্তা দেবী একই মনোভাব পোষণ করতেন। সে সময় জাপানের কোবেতে 'ইস্টার্ন লজ' নামে একটা ভারতীয় হোটেল ছিল। এই 'ইস্টার্ন লজ'-ই ছিল শান্তা দেবির খাদ্য গ্রহণের একমাত্র স্থান।

সরাসারি জাপান নিয়ে নয়, অথচ জাপানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত সরস গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক। তবে এসব গ্রন্থে খুব বেশি অভিনবত্ব নেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় সমরূপতা। অন্যদিকে কোনো কোনো গ্রন্থকার নিজের পেশাগত জীবনে আরব্ধ তথ্য ও জ্ঞান নিয়ে জাপান সম্পর্কে সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করা যায়। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ˆ'wbK emgZx, mZ¨hM ও fviZK_v পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি-প্রাপ্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৩ সালে জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী প্রকাশ করেন। এই বিষয়টি তাঁর সৈনিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু লেখক রয়েছেন যাঁরা জাপান ভ্রমণ করেননি এবং ভারতে অবস্থান করে ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে জাপান সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এছাড়া কয়েকজন লেখক আছেন যাঁরা জাপান ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কোনো গ্রন্থ লেখেননি। তবে প্রবন্ধ লিখেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং অনুবাদও করেছেন জাপানি বিষয় ফরাসি থেকে বাংলায়। ঠাকুর বাড়ির এরূপ প্রাজ্ঞ ও চিরস্মরণীয় ব্যক্তির নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। বাংলা ভাষায় লিখিত কোনো চরিতাভিধানে এই তথ্যের উল্লেখ নেই যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯১৫ সালে আশ্বিনের মাসিক ভারত 'আধুনিক জাপান (ফরাসি হইতে) বলসঞ্চয় ও আত্মরক্ষণের চেষ্টা' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন,

> 'জাপানে যে তিন মাস ছিলাম, সেই সুমধুর ভ্রমণকালের মধ্যে আমি কলকারখানায় যে সময়টা অতিবাহিত করিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে জাপানী ধরণের প্রফুল্ল হাস্যময় জীবন, আর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ধরণের বিষাদগম্ভীর ভাব এই উভয়ের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহা নিতান্তই কষ্টকর।

*Dhaka University Institutional Repository*

> কলকারখানা হইতে ধূম-নল উত্থিত হইয়া জাপানের সুন্দর দৃশ্যগুলিকে পরিম্লান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমশিল্পের মনুষ্যত্ব-নাশক ইউরোপীয় পদ্ধতি, এই সুখী জাতিকে নিষ্পেষিত ও উহাদের আনন্দকে হ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে' (দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯১৫ : ২৭২)।

অন্যদিকে সুব্রত কুমার দাস রচিত জাপানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং লেখক যদুনাথ সরকারের রচিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা বিভ্রান্তিকর। সম্ভবতঃ তিনি সাহিত্য পত্রিকার সকল সংখ্যা বাংলাদেশে পাননি; সাহিত্য পত্রিকার রচনাপঞ্জী শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থখানাও হয়তো খুঁজে পাননি। ফলে তার উল্লেখিত জাপান সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের রচনাপঞ্জী নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ।

## তথ্যনির্দেশ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫), 'আধুনিক জাপান (ফরাসী হইতে): বলসঞ্চয় ও আত্মরক্ষণের চেষ্টা', fviZx, আশ্বিন

প্রবীর বিকাশ সরকার (১৪১৪), Rvbv ARvbv, দ্বিতীয় পর্ব, মানচিত্র পাবলিশার্স, ঢাকা

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও সুস্নাত দাশ সম্পাদিত (২০১৬) BwZnv‡mi c‡_ c‡_ : Aa¨vcK Awbiæ× ivq m¤§vbbv MÖš, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

লোপামুদ্রা মালেক (২০১২), সিদ্ধম লিপির ইতিবৃত্ত, AvawbK fvlv Bbw÷wUDU cwÎKv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২৩, ফেব্রুয়ারি

সুব্রত কুমার দাস (২০১২), ‡mKv‡ji evsjv mvgwqKc‡Î Rvcvb, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৯৯২), e½mwnZ¨wfavb তৃতীয় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

Harold Coward (1990), 'Book Review: In Search of Self in India and Japan: Towards a Cross-Cultural Psychology', *Journal of Hindu-Christian Studies,* Vol. 3, P. 27.

*Dhaka University Institutional Repository*

## প্রথম অধ্যায়

# জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি

তুমি সভায় উঠে ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ সুরে

উচ্চে মা মা বলে ডাকো নি,

নির্জনে, নীরবে, নিভৃতে, নিতান্ত

গাঁওয়ারী জাপানী ধরনে,

আজন্ম অর্জ্জিত ধনরাশি তোমার

দিয়াছ জননী-চরণে (দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, ১৯৬৬ : ৬১১)।

এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত সময় ১৮৬৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ ৮৫ বছর। এই সময়ে জাপানের ইতিহাস, অর্থনীতি ও উন্নয়ন, সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যুদ্ধ, ধর্ম ও দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে প্রাপ্ত তথ্যের গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার নৌ-জরিপকারক ম্যাথিউ কলব্রেইথ পেরি (১৭৮৪-১৮৫৮) কর্তৃক আক্রমণের পূর্বে জাপান ছিল একটি স্ব-অবরুদ্ধ দেশ। পেরির আক্রমণের পূর্বে একটি স্থবির সভ্যতার দেশ হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিদেশিদের সংস্পর্শে আসার পর জাপানের প্রায় সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায়। জাপান সম্পর্কে বাঙালিদের রচনায় এই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। evsj fvlvq Rvcvb-PPv(1863-1947)—অভিসন্দর্ভের এই শিরোনাম থেকে অনুমেয় যে এখানে প্রধানত বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি আলোচিত হয়েছে। তবুও গবেষণার একান্ত প্রয়োজনে কিছু ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধও ব্যবহার করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

কিছু রচনায় জাপান সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। জাপানের বিভিন্ন স্থানের সঠিক নাম ও উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। এসব ভ্রান্তি অনেক ক্ষেত্রে অনবধানতাবশত হয়েছে। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৩১) জাপানকে 'অসভ্য জাপান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) 'গাঁওয়ারী জাপানী' (দ্বিজেন্দ্র, ১৯৬৬ : ৬১১), সরোজনলিনী দত্ত ও হরিপ্রভা তাকেদা জাপানি নারীকে 'কদর্য' ও 'কুৎসিত' এবং জাপানি খাদ্যকে 'অখাদ্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও অন্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবী 'জাপান' ও 'জাপানীদের' সঠিক পরিচয় উন্মোচন করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়ে জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাহাড় ও পর্বতবেষ্টিত জাপানে সমতল ভূমি অপ্রতুল। পাহাড় ও পর্বতে লক্ষ করা যায় মূল্যবান বিচিত্র বিটপী। জাপান মারাত্মক ভূমিকম্পপ্রবণ বলে জনগণ কাঠের বাড়ি নির্মাণ করে। সেখানের আন্তর্দেশীয় উপসাগরের দৃশ্য মনোরম ও আকর্ষণীয়।

জাপানের ঋতু যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। এই অধ্যায়ে জাপানের নারী শ্রমিক, বিভিন্ন শহর, আদিবাসী আইনু, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, কৃষি ও কৃষকের জীবন নিয়ে আলোচনা রয়েছে। চা জাপানিদের প্রধান সামাজিক পানীয়। চা জাপানিদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এছাড়া প্রাণী, পশু, কীট-পতঙ্গ, মাছ, সামুদ্রিক মুক্তা, স্বর্ণখনি, টিন, লোহা, চিনামাটি ইত্যাদি নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। জাপানের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও এই অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত। ভূমিকম্পে ভীত জাপানিরা অতীতে সাধারণত কাঠ ও মাটি দিয়ে একতলা গৃহ তৈরি করতো।

জাপান ফুলের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে জাপানিরা শহর বলতে বুঝে সেসব স্থানকে যেখানে অবশই একটি ফুলের, একটি বইয়ের ও একটি সুরার দোকান থাকবে। এই ধারণা জাপানিরা পাশ্চাত্য থেকে পেয়েছে। কমোডোর পেরির জাপান আক্রমণের ফলে জাপান পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার কাছে উন্মুক্ত হয়।

জাপানিরা অতি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করতে পারঙ্গম। ইয়োকাহামার ১৫ মাইল দূরে কামাকুরা নামক স্থানে ৫০ ফুটের একটি ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। অন্য একটি স্থানে ৬৩ ফুট উচু একটি পিতলের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত না হলেও পূর্বে জাপানিরা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ করার জন্য তাঁর প্রিয় ক্রীতদাসীদের মনোনীত করতো। পরে ক্রীতদাসীদের পরিবর্তে মাটির প্রতিমূর্তি দেওয়ার প্রথা গ্রহণ করে। সেই থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে মাটি দ্বারা সুন্দর দ্রব্য নির্মাণের প্রচলন হয়। জাপানে পূর্বে 'শিন্তো' ও পরে 'বৌদ্ধ' ধর্মের প্রচলন হয়। জাপানের কিংবদন্তি অনুযায়ী 'শিন্তো' সূর্য্য থেকে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। এই অভিসন্দর্ভে জাপানের উৎপত্তি ও জাপানিদের বসবাস সম্পর্কিত মতবাদ ও কিংবদন্তিসমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জাপানের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতি, সম্রাটদের উৎপত্তি ও অপ্রতিহত ক্ষমতা, জনগণের পেশা, আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ, জাতীয় প্রশাসন, সামরিক বিভাগ, ব্যাবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জাপান উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে চারটি প্রধান দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দেশ। এই দ্বীপগুলো হলো হোক্কাইডো,হন্‌শু, শিককু ও কিওসু। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে এই এলাকায়। জাপানিরা তাদের দেশকে 'নিপ্পন' বা 'নিহন' বলে আখ্যায়িত করে। নিপ্পন বা নিহন অর্থ 'সূর্যোদয়ের দেশ'। বাঙালিরা জাপান চর্চা করতে গিয়ে কখনো কখনো জাপান সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেছেন। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাপান 'দূর প্রাচ্য' হিসেবে পরিচিত। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা নিয়ে এই অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময় তথা ১৮৬৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় খুব কম আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথ বসু (সংকলিত) wek‡Kvl ও অন্য কয়েকটি গ্রন্থে কিছু আলোচনা রয়েছে। তৎকালীন পরিবেশ, মানচিত্রের অবস্থা ও সাংখ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল না বলে জাপানের আয়তন, জনমিতি ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাঙালির জ্ঞান ছিল সীমিত। এর ফলে তথ্যবিভ্রান্তি ঘটেছে। বিশ্বের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার চেয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহেরই প্রধান্য ছিল। ১৯০৪ সালে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্যে রচিত উমাকান্ত হাজারীর be¨ Rvcvb I iæk-Rvcvb h‡×i msw ÿß BwZnvm গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানিরা চীনের কাছ থেকে ফরমোজা দ্বীপ জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত করে (উমাকান্ত, ১৯০৫ : ২)।

সমকালে প্রাপ্ত ইংরেজি গ্রন্থ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত wek‡Kvl-এ জাপানের আয়তন, জনমিতি ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়। এই বিশ্বকোষ-এ ১৮৯৫-৯৬ সালে জাপানের আয়তন বলা হয়েছে ১,৬০,০০০ বর্গমাইল এবং ১৮৯০ সালে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ৪০,০৭২,৬৮৪ জন। এদের মধ্যে ৬,১৮৭ জন ছিলেন বিদেশি। জাপানের আয়তন ও জনসংখ্যার তথ্য সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সন্দিগ্ধ। নগেন্দ্রনাথ বসু জাপান সম্পর্কে লিখেছেন—

> জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত দ্বীপগুলির উপকূলভাগ অতিশয় পর্ব্বতসঙ্কুলেবং নিকটস্থ সাগরাংশ অধিক গভীর নয়। এই জন্যই জাপানীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহার করে। জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্ব্বতবহুল, সেরূপ অনেক স্থান অতি

Dhaka University Institutional Repository

> ভীষণ জলাবর্ত্তসঙ্কূল। নিফনের দক্ষিণাংশেও সাফা ও মিয়া উপসাগরের মধ্যে আমাকুসা দ্বীপের নিকটে দুইটি জলাবর্ত্ত আছে। জাপান উপকূলভাগে সমুদ্র তত প্রখর নহে (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩২)।

নগেন্দ্রনাথ বসুর তথ্য অনুযায়ী জাপানের চার ভাগের তিন ভাগই পাহাড় ও পর্বত; সমতল ভূমি নেই বললেই চলে। এ সকল পাহাড়ে প্রচুর দেবদারু, ঝাউ, পিপল ও শাল বৃক্ষ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে—

> জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-সন্নিকটস্থ ভূমি পর্বতসঙ্কুল। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্ব্বত নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত চাষ করা হয় এবং যে স্থানে চাস করা হয় না, তাহা অনুর্ব্বর বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। তোমিয়া উপসাগরের অনতিদূরে ক্ষুদসি জাম্মা নামে একটি উচ্চু পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্ব্বত-শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে; ইহার কতকগুলি হইতে অগ্ন্যুদগম হইয়া থাকে (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৩)।

যতীন্দ্রনাথ সোম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাপান গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এল. এম. এস. (Licentiate Medical and Surgeon) পদবিপ্রাপ্ত চিকিৎসক। বাংলা ভাষায় লিখিত কোনো চরিতাভিধানেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। যতীন্দ্রনাথ সোম যখন জাপান যান, তখন বিজ্ঞানের লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয়নি। ফলে অর্ণবপোতগুলো অত্যাধুনিক ছিল না এবং প্রায়ই ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়তে হতো। এজন্য সুচতুর নাবিক প্রথম থেকেই মহাসাগর ত্যাগ করে অন্তর্দেশীয় সাগরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতেন। যতীন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন, মহাসাগরের মধ্যে দেখার কিছুই নেই, কিন্তু এ পথের দৃশ্য মনোরম ও চিত্ত-বিমোহনকর।

জাপানের আন্তর্দেশীয় উপসাগরের প্রবেশ-পথের দুই কূলেই মোজি নগর। এর উত্তরে ‘হন্ডো’ দ্বীপের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণে ‘কিউসিউ’ দ্বীপ। যতীন্দ্রনাথ সোম এই স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> এই উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপদ্বয়ের মধ্য দিয়া অন্তর্দ্দেশীয় সাগরটী ‘কোবে’ অভিমুখে গিয়েছে। দুই দিকেরই স্থলভূমি পর্ব্বতময়। মধ্যস্থিত সাগরের মধ্যে ছোট ছোট গিরিশ্রেণী। সকল পর্ব্বতের উপর বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্ষেত্রগুলি ‘থাকে থাকে’ সাজান। দেখিলে মনে হয়, এখানকার কৃষকেরা শিল্প-চাতুর্যের অঞ্চল নহে। অনেকগুলি পর্ব্বতের উপর কামান স্থাপিত দেখিলাম। শত্রুর আক্রমণ হইতে এ পথটী ও

Dhaka University Institutional Repository

> পর্ব্বত গাত্রস্থিত নগরগুলিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাষপীয়পোত পথিমধ্যস্থিত এই পর্ব্বতগুলি ঘুরিয়া কোবে অভিমুখে যায় (যতীন্দ্রনাথ, ১৩২৩ : ৪৩৭-৩৮)।

এখানে সাগর অপ্রশস্ত, উভয় কূল একেবারে নিকটবর্তী। দু'টি জাহাজ যাত্রী ও দ্রব্যাদি নিয়ে সর্বদা পারাপার করে। এই স্থানটি অর্ণবপোতের কয়লা সংগ্রহ করার জায়গা। ফলে বড় জাহাজগুলো এখানে নোঙর করতে বাধ্য। এ পরিস্থিতি বর্ণনা করে যতীন্দ্রনাথ সোম মন্তব্য করেছেন—

> জাপানী রমণীরা চীনাদের মত কাল জামা গায়ে দিয়া ও কাল ইজের পরিয়া মাথায় খ্রীষ্টীয় 'সিস্টার'দের মত দুই দিকে কাণের উপর কাল কাপড় লম্বিত টুপী মাথায় দিয়া, পিঠে খুব বড় বড় কয়লার বস্তা লইয়া 'জেঠী' হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করিয়া থাকে। হাত ও পা দু'খানির বর্ণ কয়লার গুড়াতে পরিধেয়ের বর্ণের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। মাথার উপর টুপীর কাপড়টী ঘোমটার মত বাহির ইইয়া থাকায়, মুখকানিতে বেশী কয়লা লাগিতে পারে না। উহা ঘনতমসাবৃত নভিমণ্ডলে স্থিরা সৌদিমনীর মত শোভা পায়। কাহারও মুখে না নাসিকার কয়লা মাখান অঙ্গুলীর স্পর্শ দেখিলে মনে হয় যেন ভ্রমর প্রস্ফুটিত পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে (যতীন্দ্রনাথ, ১৩২৩ : ৪৩৮)।

এখানে জাপানি পুরুষেরাও কুলির কাজ করে থাকে। তবে তুলনামূলকভাবে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশ কম। মহিলা ও পুরুষ কুলি সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে পিঠে কয়লা বহন করে। সাধারণত, জাপানিরা কোনো দ্রব্য মাথায় বহন করে না। যতীন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন—

> প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত মোজী সহরে দেখিবার অন্য কিছুই নাই। মোজীর পর হইতেই অন্তর্দ্দেশীয় সাগর আরম্ভ। প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করিলে প্রায় সমস্ত দিবসই এই সাগরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্ত পথটী দুই দিকেই পর্ব্বতময়। 'কোবে' যাইতে মনে হয় যেন একটা সুন্দর গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে গিরিগাত্রে অনেক কল কারখানা দেখা যায়। কোথাও একটু সমতল নাই। এখানে সাগরের জল অচঞ্চল, একখানি স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় গিরিপাদমূল বেষ্টন করিয়া আছে। বাষপীয়পোতে কোনও স্পন্দন নাই। সম্মুখ নয়নে তৃপ্তিকর প্রকৃতির অদ্ভুত মনোহর ছবি। এছবি একবার দেখিলে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। সীমাহীন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের পর এ বিশ্রাম যে কি মধুর ও তৃপ্তিকর, তাহা যে লাভ করিয়াছে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে। এদৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে (যতীন্দ্রনাথ, ১৩২৩ : ৪৩৮)।

*Dhaka University Institutional Repository*

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে জাপানে কোনো বড় নদী নেই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাপানের কিছু নদীর স্রোত এত প্রবল যে এগুলোর ওপর কোনো সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়। কোনো কোনো নদীতে বড় নৌকার মাধ্যমে যাতায়াত সম্ভব। নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন—

> জেদোগোয়া নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই নদীটি নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল। এই নদীর সর্ব্বত্রই নৌকায় গমনাগমন করা যাইতে পারে। ওজিগাভা, উমি ও আফ্‌কাগাভা নামক নদীগুলিও ক্ষুদ্র নয় (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৩)।

জাপানে গ্রীষ্মকাল খুব দীর্ঘ নয় এবং গরমের উত্তাপ সহনশীল। জাপানের ঋতু যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। বৃষ্টি প্রায় বারো মাসই থাকে। কৌতুক করে বলা হয় যে, জাপানের 'ভুত' ও 'বৃষ্টি' সমগোত্রীয়; একবার ধরলে আর ছাড়ে না। ছাতা জাপানিদের প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী। বর্ষাকালে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তা অনেক সময় অবিরাম। জাপানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শীতকালে বরফ পরে। উত্তরে হোক্কাইদোতে অনেক বেশি বরফ পড়ে এবং দীর্ঘকাল তা থাকে। এখানেই বাস করে জাপানের আদিবাসী 'আইনু' জনগোষ্ঠী। বলা হয়ে থাকে যে খ্রিষ্টপূর্ব সাত শতকে বর্তমান জাপানিদের পূর্বপুরুষেরা 'আইনু'দের পরাজিত করে বসতি বিস্তার করতে থাকে। আইনু জাতি পরাজিত হয়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> অদ্যাবধি হোক্কাইদো দ্বীপের স্থানে স্থানে আইনুজাতির দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ও আইনু জাতির ভেদাভেদ লোপ পাইতে বসিয়াছে। পরস্পর বিবাহাদি হইতেছে; আইনুদের ভিতর নব্যভাব প্রবেশ করিয়া উহাদিগকেও সভ্য ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। আইনু পুরুষদের চেহারা অনেকটা প্রাচীন আর্য্য হিন্দু মুনিঋষিদের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। নাক, চোক, এবং কেশ অনেকটা ককেশিয়ান জাতির ন্যায়, দিব্য গোপ দাঁড়ি আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট অথচ খর্ব্বাকৃতি নহে (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪১)।

জাপানের একমাত্র আদিবাসী আইনু ক্রমান্বয়ে জাপানি জাতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আইনু মেয়েদের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ সকলই জাপানি মেয়েদের মতো। আইনু মেয়েরা পূর্বে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি ধারণ করতো। তবে এখন আইনু মেয়েরা আর উল্কি ধারণ করে না। উল্কি ধারণ তারা অসভ্যতা বলে মনে করে।

আইনুদের চুল বেশ কালো। তবে তাদের চোখের মণি অতীব ক্ষুদ্র। আনন্দে তাদের চোখ দুটি সম্পূর্ণভাবে বুজে যায়, কেবল চোখের লোম দেখা যায়। যদুনাথ সরকার বর্ণনা করেছেন—

*Dhaka University Institutional Repository*

> উহাদের নাক চেপটা বা খোন্দা, অনেকেরই যেন সমতল ক্ষেত্রে দুটি চক্ষু; কেবল নাসিকারন্ধ্রের জায়গাটুকু কথঞ্চিৎ উঁচু। দাঁতগুলি অনেকেরই অসমান এবং কিঞ্চিৎ সুবর্ণ সংযোগে আকার প্রাপ্ত। অধিকাংশেরই গোঁপ দাঁড়ি নাই; শরীরের রং বেশ পরিষ্কার; বিলাতী সাহেবদের রং লালাভ আর উহাদের শ্বেতাভ (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪২)।

জাপান পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভূমিকম্পের দেশ হিসেবে পরিচিত। জাপানে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান। কিছু আগ্নেয়গিরি সুপ্ত হলেও কিছু জীবন্ত। ভূমিকম্প হলে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় এ সম্পর্কিত জ্ঞান জাপানিরা বংশ পরম্পরায় পেয়েছে। বহুকাল পূর্বে ভূমিকম্প হলে তারা আত্মরক্ষার অভিনব উপায় অবলম্বন করতো। এ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

> প্রথম কম্পনেই তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারে, তবে নিতান্ত শিশু ব্যতীত বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপানই এক একখানি বালিদা[১] উঠাইয়া মস্তকোপরি স্থাপন করে এবং ক্রমে নিকটস্থ শূন্যস্থানে আসিয়া সেগুলি মাটিতে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে জাপানীদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর নিচে একটি বৃহৎ তিমি আছে, ঐ তিমিটি নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠে এবং যে যে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের বিশেষ অনুগ্রহ আছে (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৩)।

১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জাপানের ইয়োকোহামা ও টোকিও অঞ্চলে এক প্রবল ও জন-বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্প ঘটেছিল রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে, স্থিতিকাল ৪ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। জাপানের এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ২৩ কিলোমিটার নিচে। ভূমিকম্পের ফলে জাপানের আতামি, সিজোওকাও টোকাই ইত্যাদি সমুদ্র-নিকটবর্তী স্থানে ৩৯ ফুট উঁচু 'সুনামি' বা জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। ভূমিকম্পের পরবর্তী ধাক্কা ৭-৮ বার অনুভূত হয়েছিল।[২]

এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল মারাত্মক। ১৯২৪ সালে কলকাতায় 'দি ক্যালকাটা কর্পোরেশন আউটডোর এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন'-এর এক সভায় অবনীকুমার দে 'ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতি-বৃদ্ধি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯২৪ সাj gvbmx ও

১. বালিদা শব্দটি বাংলা নয় এবং কোনো বাংলা অভিধানে নেই, ফলে এর অর্থ জানা গেল না।

২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে,J. Charles Schencking, "The Great Kanto Earthquake and the Culture of Catastrophe and Reconstruction in 1920s Japan", *Journal of Japanese Studies,* Vol. 34 No.2, pp. 295–331;Gavan McCormack, *The Emptiness of Japanese Affluence*, ME Sharpe: Armonk, New York, 1996.

*Dhaka University Institutional Repository*

g¤¦eVYxসাময়িকপত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অবনীকুমার দে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের পত্রিকার খবর, বিভিন্ন প্রখ্যাত ব্যক্তির বক্তব্য ও জাপানে প্রাপ্ত বিবরণীর ওপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে তিনি ভূমিকম্পের ভয়াবহতার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। অবনীকুমার দে লিখেছেন—

> এই ভূমিকম্পের তুল্য এত বড় ভীষণ এবং ভয়াবহ ভুমিকম্প পৃথিবীতে কখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের বড় ভূমিকম্পের কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু জাপানের এই ভূমিকম্পের তুলনায় উহা কিছুই নহে (অবনীকুমার, ১৩৩ ১ : ৬১৩)।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প ১৯০৬ সালে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে ও ১৯০৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় হয়েছিল। আরও বড় ভূমিকম্প হয়েছিল ১৭৫৫ সালে পর্তুগালের লিসবনে। যখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু জাপানের এই ভূমিকম্পের তুলনায় এগুলো কিছুই নয়। তখন জাপানের জন্য দেশ ও বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং নিজ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করেন। ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড রেডিং (১৮৯০-১৯৩৫) সরকারি ও বেসরকারি ফান্ড খুলে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আমেরিকা জাপানের অসহায় শিশুদের জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করেছিল।

ওসাকার সরকারি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, কেবল টোকিও শহরেই ১,৫০,০০০ (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার) লোক নিহত; ১৫,৯৪৭ (পনেরো হাজার নয়শত সাতচল্লিশ) জন লোক আহত ও নিখোঁজ এবং ৩,১৫,৮২৪ (তিন লাখ পনেরো হাজার আটশত চব্বিশ)-টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভূমিসাৎ হয়। Rvcvb UvBgm এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ক্ষতির পরিমাণ ১২০ কোটি ডলার ধার্য করে। 'রেডক্রস'-এর তথ্য অনুযায়ী ইওকোহামা ও টোকিও শহরে ২-৩ লক্ষ লোকের প্রাণহানী হয়। এছাড়া শহরের বাইরে আরও ১০ লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হয় (অবনীকুমার, ১৩৩ ১ : ৬১৫)।

আমেরিকার পত্রিকায় wR. WweøD. wnbg¨vb এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলার। তবে তিনি আশা করেন মাত্র ১০/১২ বছরের মধ্যেই জাপান এই ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ হবে। ইংল্যান্ডে অবস্থানরত জাপানের রাষ্ট্রদূত ব্যারণ হ্যায়াসি বলেন যে, কেবল টোকিও ও ইওকোহামা এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমুহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, ইওকোহামার বন্দরে সবচেয়ে বেশি কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়। সেখানকার রেশমের গুদামে রাখা কাঁচামাল নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ক্ষেতে উৎপাদিত ফসলের কোনো ক্ষতি হয়নি (অবনীকুমার, ১৩৩১ : ৬১২-১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

এটা অনেকের জানা যে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন সাহিত্যে রয়েছে। মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা নামক একজন বাঙালি কবি ও লেখকের নাম পাওয়া যায়। এই লোক ছিলেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানি মহাফেজখানার কর্মচারী। তিনি ১৯২৮ সালে Rvcvb I e‡½ cjq fwgK¤ú শিরোনামে পদ্যছন্দে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়। ঠিক একই সময় বাংলায়ও এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। এই উভয় ঘটনার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বর্ণনার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হলো।

১লা সেপ্টেম্বরের এক ঘটিকা,

তখন উঠিল এক প্রবল ঝটিকা।

উক্ত গিরি চতুষপার্শে ত্রিংশ ক্রোশব্যাপী,

অকসমাৎ ভূমি বেগে উঠিলেক কাপি।

আরম্ভিল মহা এক ভীষণ কম্পন,

একাধারে ঝড় বৃষ্টি না যায় সহন।

পলাবার স্থান নাই শব্দ হাহাকার,

তদুপরি গিরি অগ্নি জ্বলি অনিবার।

অগণিত লোক মরে হয়ে স্তুপিকৃত,

'ইকুমা' নগর হল অগ্নিভসমীভূত।

দু'একজন পলাইয়া যদ্যপি জীবিত,

তাহারে জাহাজে আছে হয়ে নিরাশ্রিত।

বিনষ্ট হইল রেল ছিড়ে গেল তার,

নগর আগুনময় জীব নাই আর।

দেড় ঘণ্টা অবিরাম এমত প্রলয়,

Dhaka University Institutional Repository

লণ্ড ভণ্ড চুরমার করি লোকালয়।

সমুদ্রে অবজ্ঞা করি বহু রণ তরি,

ডুবীল অতল জলে উত্তেজিত বারি।

কোথাও চলিত গাড়ি আরোহীর সহ,

বিচূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে ত্যাজিয়াছে দেহ।

ব্যোম জানে এরোপ্লানে আরোহণ করি,

কেহবা উপরে উঠে ভগবান সমরি।

কিন্তু ভাই, সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান,

অনন্ত অসীম বটে বিধির বিধান।

অগ্নিতাপে অবিলম্বে নিয়তি আহ্বানে,

পরিল আরোহী-সহ গিরি হুতাশনে।

তিনশ মাইল স্থান হয়ে অগ্নিময়,

'ওসেকা', 'সেন্দাই' মধ্যে করিল প্রলয়।

'আসাকুল' মহাদূর্গ হইয়া পতন,

সপ্তশতাধিক করে মৃত্যু সংঘটন।

রেলের সুড়ঙ্গ এক হইয়া পতিত,

ছয় শত লোক হইল কাল কবলিত।

সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ হইল নিহত,

অগণ্য অসংখ্য লোক হইল আহত।

তমোগুণে বিধি সব করিয়া সংহার,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

রজোগুণে রক্ষা করে রাজ পরিবার।

মন্ত্রিবর 'ইউ আমা' বাঁচে পূণ্য ফলে,

বিপন্ন বিনষ্ট হল অমাত্য সকলে।

অতঃপর রাজধানী হবে স্থানান্তর,

কিউটা বা ওসেকাতে বার্ত্তা পরম্পর।

কলিকাতা আমেরিকা বৈজ্ঞানিক দল,

যন্ত্র চক্ষে জাপানের দুর্দ্দশা সকল (মৌলবী, ১৯২৩ : ১৬-১৭)।[৩]

যশোরের সামাটা গ্রামের সন্তান উমাকান্ত হাজারী (১৮৭৩-১৯৫৫) একজন শিক্ষাব্রতী। তিনি এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক ১৯৩৪ সালে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে ভূষিত হন। উমাকান্ত হাজারী বার্মা (মিয়ানমার), পেনাং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে gijv (নাটক), welv' Kwnwb (কবিতা) ব্যতীত e½ RvMiY, ¯‡'‡ki bvbv K_v, ˆewk M‡elYv, be¨ Rvcvb, be¨ Rvcvb I Avgv‡'i K_v ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য e½mwwnZ¨w favb শীর্ষক অভিধানে be¨ Rvcvb গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের নাম থেকে 'রুশ জাপান যুদ্ধের ইতিহাস' শব্দগুলো বাদ পড়ে। উল্লেখ্য, উমাকান্ত হাজারীর সঙ্গে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও পণ্ডিতপ্রবর বীরেশর পাঁড়ে, বিজ্ঞানাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্বদেশানুরাগী অশ্বিনীকুমার দত্তের পত্র যোগাযোগ ছিল। be¨ Rvcvb I iæk Rvcvb h‡×i BwZnvm গ্রন্থটি যে উমাকান্ত হাজারীরই রচিত তার প্রমাণ এটি তাঁর জন্মস্থান 'সামাটা গ্রাম' থেকে প্রকাশিত (হংসনারায়ণ, ১৯৮৭ : ১৬৫)।[১৮] ১৯০৪ সালে উমাকান্ত হাজারী নব্য জাপান ও রুশ জাপান যুদ্ধের ইতিহাস রচনার সময় জাপানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি জাপানের প্রধান ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানের বর্ণনাও দিয়েছেন।উমাকান্ত হাজারীর গ্রন্থে নিম্লোক্ত তথ্য পাওয়া যায়ঃ

---

৩. এই কবিতায় স্থান নামে অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায়। জাপান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকার জন্যই এই অস্পষ্টতা ঘটেছে। মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা, Rvcvb I e‡½ cjq fwgK¤ú, ময়মনসিংহ, ১৯২৩, পৃ. ১৬-১৭। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখা যেতে পারে, J. Charles Schencking, "The Great Kanto Earthquake and the Culture of Catastrophe and Reconstruction in 1920s Japan", *Journal of Japanese Studies* (2008) 34:2 pp. 295–331.)

*Dhaka University Institutional Repository*

টোকিয়ো : জাপানের রাজধানী এবং লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ। টোকিয়ো এশিয়া মহাদেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বাণিজ্যিক স্থান। বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও সুন্দর রাস্তা এবং সেতু এই স্থানের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। টোকিওতে জাপান সম্রাটের বিশাল বাসভবন রয়েছে। অতীব সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা এই বিশাল শহরে বাস করে। টোকিওতে জাপানের সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয় রয়েছে।

ওসাকা : জাপানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শহর। সমুদ্র তীরে অবস্থিত ওসাকা সুরক্ষিত বন্দর। ১৯০৪ সালে ওসাকার জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। এখানে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি হয়। অনেকে ওসাকাকে জাপানের 'অলউইচ্' বলে থাকেন। এই শহরের অধিবাসীরা ধনী ও বিলাসপরায়ন। জাপানিরা ওসাকা শহরকে প্রমোদ ভবন বলে থাকে।

মিয়াকো বা কিয়োটো : কিয়োটো শহর জ্ঞানচর্চা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে জাপানের প্রধান ধর্মযাজক অবস্থান করেন। স্থানীয়ভাবে সকলে তাঁকে 'দৈরি' বলে সম্বোধন করে। কিয়োটোতে প্রাচীন যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্বে কিয়োটো জাপানের রাজধানী ছিল।

ইয়াকোহামা : ইয়াকোহামা জাপানের সর্ব প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এখানে ইংরেজ, ফরাসি ইত্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যপোত নোঙর করে থাকে।

সিমনসেকি : সাগর তীরবর্তী সুরক্ষিত বন্দর। এই শহরে চীন ও জাপান যুদ্ধের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়।

মেগারু : এখানে জাপান সরকারের একটি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা রয়েছে। জলযুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এখানে নির্মাণ করা হয়।

নাগাসাকি : জাপানের অতি সুরক্ষিত বন্দর। এখানকার ডকগুলো খুবই উৎকৃষ্ট। নাগাসাকিতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। ইংরেজ ও আমেরিকার অধিবাসীরা এখানে বাণিজ্য করে। নাগাসাকির বাড়িগুলো খুবই সুন্দর এবং প্রত্যেক বাড়িতে বারান্দা আছে। এখানে অনেক বৌদ্ধ মঠ রয়েছে।

সেসাবো : জাপানের রণতরির প্রধান আশ্রয়স্থল। এখানে সরকারি ডক রয়েছে। এই বন্দরে বড় বড় জাহাজ, রণতরি, লাইনার, টর্পেডো বোট নির্মাণ করা হয়। এছাড়া সঙ্গ, কোকুয়া, কতসীমা, হামাদা ইত্যাদি উন্নতশীল নগর অবস্থিত।

*Dhaka University Institutional Repository*

হাকোডোট : সুগারু প্রণালির উত্তর তীরে অবস্থিত অতি সুসংরক্ষিত বন্দর। এখানে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী অনেক ডক আছে।

মাটসমে : জেসো দ্বীপের শাসনকর্তা এই দ্বীপে বসবাস করেন। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে খ্যাত বলে জাপানের সম্রাট মাঝে মধ্যে অবস্থান করেন। শহরটি কিছুটা নিচে অবস্থিত এবং চারদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। মাটসমে দেখতে মনোরম।

মারোয়ান : অতি সুরক্ষিত সামুদ্রিক বন্দর। এই বন্দরের সন্নিকটে ফুকুসীমা, অসিমা, অকেশী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিদ্যমান।

তৈবান : চীনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকুলে অবস্থিত ফরমোসা দ্বীপের প্রধান শহর। এখানে জাপান সম্রাটের একজন প্রতিনিধি রাজনৈতিক কারণে অবস্থান করেন। অতীতে চীনের মারাত্মক অপরাধীদের এখানে নির্বাসন দেওয়া হতো। ফরমোসার অন্য একটি সমৃদ্ধশালী শহর তাকাও এই শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। এসকল শহর ও নগর ছাড়া জাপান সাম্রাজ্যের কোবে, হিরোশিমা, কুরি ও নাগাতা নামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহর বিদ্যমান।

উমাকান্ত হাজারী জাপান ভ্রমণ করেননি। তিনি পূর্বে বা সমকালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। জাপানের স্থান সম্পর্কে উমাকান্ত হাজারী প্রদত্ত নাম বিভ্রান্তিকর। উল্লেখ্য, কোনো লেখকের রচনার সমালোচনা করা এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়। উমাকান্ত হাজারী প্রদত্ত জাপানের স্থান নাম যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর Wek‡Kvl-এ লিখেছেন যে জাপানে অনেক আগ্নেয়গিরি থাকাতে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি 'উন্‌সেন' আগ্নেয়গিরির তথ্য প্রদান করেছেন।[৪] 'উন্‌জেন' আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গন্ধক জলে মিশ্রিত হয়ে এক উষ্ণ প্রস্রবনের সৃষ্টি করে। জাপানিদের বিশ্বাস এই উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করলে বার্ধক্যজনিত অনেক রোগের উপসম হয়। জাপানে খ্রিষ্টধর্ম আসার পর স্বধর্মত্যাগীদের উপর অনেক অত্যাচার করা হতো। এ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

> পূর্বে যাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাটের আদেশে উষ্ণ প্রস্রবনে নিক্ষেপ করা হতো। ফিজেন ও উরিফুনো গ্রামে যে উষ্ণ

---

৪. আগ্নেয়গিরিটির প্রকৃত নাম 'উন্‌জেন'। বর্তমান গবেষকের ১৯৯৫ সালে 'উন্‌জেন' আগ্নেয়গিরি ভ্রমণের সুযোগ করেছিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রস্রবন আছে, তাহাতেই অধিকাংশ স্বধর্ম্মত্যাগীকে ফেলিয়া দিত (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৩)।

পৃথিবীতে জাপানিদের মতো কৃষিতে উন্নত জাতি আর নেই। জাপানে কৃষিকাজের যথেষ্ট সমাদর। কৃষিকাজের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য জাপান সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি পতিত জমি চাষ করবে দুবছর পর্যন্ত সে জমি চাষই নিস্কর ভোগ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি বছরের কোনো সময় পতিত জমি চাষ করবে না সেখানে তার কোনো অধিকার থাকবে না। তারা সমুদ্র উপকূলভাগ থেকে ছোট ছোট পাহাড়ের অতি উচু স্থানেও চাষাবাদে অভিজ্ঞ। ধান চাষেই তাদের মনোযোগ বেশি; যদিও যব, গম ইত্যাদি শষ্যও উৎপাদন করে। জাপানিরা মাখন অথবা চর্বি ব্যবহার করে না, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা বিভিন্ন প্রকার তৈলাক্ত উদ্ভিদ ব্যবহার করে। জাপানে আলু, কপি, মুলা, শসা, তরমুজ ও বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাট, পশম, তুলা, তুঁতগাছ, ওক ও দেবদারু ইত্যাদিও যথেষ্ট জন্মে। লেবু, কমলা, পেয়ারা, আঙ্গুর, ডালিম ও পিচ প্রভৃতি ফল অনেক উৎপন্ন হয়। চা জাপানিদের প্রধান সামাজিক পানীয় এবং এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতিও সম্পর্কিত। প্রায় দেখা যায় পতিত জমি ও ধানের জমির চারদিকে চায়ের বাগান। অনেকে চা বাগানের মনোরম দৃশ্য দেখে ও উপভোগ করে। জাপানিদের বাড়িতে কোনো বন্ধু এলে অথবা যাবার সময় যে চা পান করতে দেয় তাকে তারা ‘ওচা’ বলে। জাপানে চা-এর আবাদ থাকলেও চীনের মতো উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। জাপানের চা বিদেশে রপ্তানি করা হয় না।

জাপানে তুঁতগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই গাছ থেকে বহুবিধ পশমী দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এখানে এক প্রকার বার্নিশ গাছ আছে যা থেকে দুধের মতো সাদা রস নির্গত হয়। এই রস দিয়ে বিভিন্ন আসবাবের চাকচিক্য বাড়ানো হয়। জাপানের কোনো অধিবাসী বার্নিশের কাজ করতে লজ্জা পায় না। অতি দরিদ্র ভিক্ষুক থেকে অতি ধনী সম্রাট পর্যন্ত কেউই বার্নিশের কাজ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। রাজপ্রাসাদে সোনা অথবা রুপার পাত্রের চেয়ে জাপানি বার্নিশের মাধ্যমে চাকচিক্যময় পাত্রই জাপানে সমাদৃত।

জাপানের ঘোড়া মাঝারি আকারের, কিন্ত অত্যন্ত শক্তিশালী। ঘোড়ার সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত পাহাড় ও পর্বত এবং দুর্গম স্থানে ওঠার জন্য ঘোড়া ব্যবহার করা হয়। গাড়ি টানার জন্য এবং জলমগ্ন জমি চাষ করার জন্য জাপানিরা মোষ বা গবাদি পশু ব্যবহার করে। আগে জাপানিরা গরুর দুধ বা মাংশ খেত না। পাশ্চাত্যের প্রভাবে তারা গরুর দুধ বা মাংশ খাওয়া শুরু করে। জাপানে হাস, মুরগী, ডাহুক ও ভরত পাখি দেখা যায়। এছাড়া খরগোশ, হরিণ, ভল্লুক ও শুকর ইত্যাদি বন্যজন্তু পাওয়া যায়। পূর্বে জাপানে কুকুরের যথেষ্ট আদর ছিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৭৪ সালে জাপানে অসংখ্য কুকুর ছিল। কুকুরের উপদ্রবে জনজীবন অতিষ্ট ছিল। কুকুর মারা তো দূরের কথা, তাদের গায়ে কারও হাত তোলার সাহস ছিল না। evgv‡ewabx পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে অদ্ভুত এক কারণে কুকুরের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। জাপানিরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কুকুরের সমাদর করতে বাধ্য ছিল। এ বিষয়ে একটি জনকথা রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ১২টি রাশি ও ১২টি রাশিচিহ্ন আছে। যেমন— মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, তুলা, কন্যা, বিছা, ধনু, মকর, মীন ও কুম্ভ। জাপানিদেরও ১২টি রাশি ও ১২টি রাশিচিহ্ন আছে এবং এর মধ্যে একটি হলো 'কুকুর'। রোমের প্রথম সম্রাট এল্যান অক্টাভিয়ান আগস্টাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩-১৯ খ্রিষ্টপূর্ব) মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মেষের উপর তিনি ছিলেন দয়াশীল। অনুরূপভাবে কুকুর রাশিতে জন্ম গ্রহণকারী জাপান সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করে ঘোষণা করেন যে, কুকুরকে অত্যন্ত পবিত্র জীব মনে করে বিশেষ শ্রদ্ধা করতে হবে। ফলে রাস্তার কুকুর কোনো কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে কোনো ব্যক্তিকে তাড়া করলেও কিছু করার থাকে না। বিদেশি পথিক, বিশেষত খ্রিষ্টীয় আলখেল্লাধারী ব্যক্তিবর্গ কুকুরদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু এবং তাঁদের উপর কুকুরের কোপ অনেক বেশি। সারমেয়কুল যদি কোনোক্রমে দলবদ্ধ হয়ে গভীর রাতে তীব্র গর্জন করে এবং কোনো ব্যক্তিকে দন্তপাটি বের করে আক্রমণ করে বা কামড়ায়, তাতে কারও কোনো অভিযোগ সরকারিভাবে গ্রাহ্য হয় না। কুকুরকে আঘাত করার কোনো অধিকার কারও নেই। জাপান সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে, কুকুর যত ক্ষতিই করুক না কেন তাকে কোনোক্রমেই বধ করা মারাত্মক অপরাধ।

> প্রত্যেক নগরে কুকুর রক্ষক সকল আছে। যদি কোন কুকুর কোন দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে, এই সকল রক্ষককে সংবাদ দিতে হইবে, তাহারা তাহার প্রতিবিধান করিবে। প্রত্যেক রাস্তায় কতকগুলি করিয়া কুকুর রাখিতে হইবে, অন্ততঃ তাহাদিগের জন্য খাদ্য রাখিতে হইবে। নগরের প্রত্যেক অংশে কুকুরদিগের পান্থশালা ও চিকিৎসালয় আছে এবং কোন কুকুরের পীড়া হইলে তাহাকে সেখানে রাখিয়া আসিতে হয়। কুকুর মরিলে পৰ্ব্বত শিখর দেশে যেখানে মনুষ্যদিগের গোরস্থান, সেইখানে তাহাকে লইয়া সম্মান পূৰ্ব্বক কবর দিতে হয় (জাপানী কুকুর, ১২৮১ : ৩৩৮)।

এ বিষয়ে একটি কৌতুকজনক গল্প আছে। একজন লোক তার আশ্রিত একটি কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের উপর কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে জাপান সম্রাট্‌কে অভিশাপ দিতে লাগলো। এই সময় তাহার সঙ্গী ঐ ব্যক্তিকে বললো যে, চুপ করো, সম্রাটকে তিরস্কার করো না, বরং জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও এই জন্য যে আমাদের সম্রাট্ অশ্বচিহ্নিত সময়ে জন্মেননি, কারণ তাহা হলে আমাদের বোঝা আরও ভারী হতো (জাপানী কুকুর, ১২৮১ : ৩৩৮)।[২২]

পূর্বে জাপানিরা বছরকে বারোটি চিহ্নে চিহ্নিত করতো এবং বিশ্বাস করতো যে চিহ্নিত বছরে যে জাতক জন্ম লাভ করবে, সেই অনুসারে তার মন গড়ে উঠবে।

জাপানে উঁইপোকা খুব বেশি। উইয়ের দৌরাত্মে জাপান ব্যতিব্যস্ত। কোনো জিনিষের নিচে এবং তার চারদিকে লবন ছড়িয়ে দিলে উঁই-এর হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পায়। জাপানে উঁইকে 'দোতুস্' বলে। উঁই হালকা হলুদ ও নরম দেহবিশিষ্ট Isopetra বর্গের একদল সামাজিক পতঙ্গ। প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে এদের বাসস্থান হলেও প্রবল শৈত্য-প্রবাহের মধ্যেও উঁই পোকা বেঁচে থাকে। সবসময় এরা দলবদ্ধভাবে থাকে এবং একপ্রকার উপনিবেশ গড়ে তোলে যাকে 'উঁইপোকার ঢিবি' বলা হয়। প্রায় সব প্রজাতির উঁইপোকাই ক্ষতিকর। এদের কারণে বাঁশ, কাঠের খুঁটি, আসবাবপত্র, বাড়িঘরের কাঠ ও বাঁশের অংশ, পাটশোলার বেড়া, বই পুস্তক, কাপড়-চোপর, নানা প্রকার ফসল, গাছপালা ও আরও অনেক সামগ্রী নষ্ট হয়। দেয়ালের ফাঁকে বা গাছের ফোঁকরে তৈরি উঁইপোকার বাসা প্রায়ই বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত হয়। উঁইপোকার উপকারী ভূমিকার মধ্যে রয়েছে মরা গাছপালা ও কাঠের গুড়ি খেয়ে তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। উঁইপোকার এই কাজ জমির উর্বরতা বাড়ায় (Yamano, 2006 : 25-36)।[৫]

জাপানে সাপ খুব কম। বিভিন্ন স্থানে 'তিতাকাজ্য' বা 'ফিনকারি' নামে সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সাপ বিষের দিক থেকে অত্যন্ত মারাত্মক। এই সাপ কাউকে দংশন করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। সূর্যোদয়কালে কাউকে এই জাতীয় সাপ দংশন করলে সূর্য্যাস্তের পূর্বেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। পূর্বে জাপানি সেনাবাহিনী এই জাতীয় সাপ খেত। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই জাতীয় সাপ খেলে তাঁরা অত্যন্ত সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হবে। জাপানে আর একপ্রকার সাপ আছে, যাকে 'জামাকাটাগো' বা 'দোজা' বলে। পূর্বে অনেক জাপানি এই সাপ দেখিয়ে অর্থ আয় করতো।

আরশোলা বা তেলাপোকার অস্তিত্ব পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান। এই পোকা ফড়িং জাতীয় এবং মাঝে-মধ্যে উড়তেও পারে। জাপানে এদের বলা হয় 'গোকিবুড়ি'। আরশোলা বা তেলাপোকার বৈজ্ঞানিক নাম Periplaneta Orintalis.আরশোলার বাসস্থান ঘরে। দিনের বেলা ঘরের মধ্যে নিরবে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে বেড়িয়ে জিনিসপত্র নোংরা করে। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, Yamano Katsuji, Komine Yukio, "Bunkazai no Shiroari Higai to Bojo Taisaku no Genjo" [Harmful Insects and Damage to Cultural Properties], Bunkazai no Chu-kin Gai to Bojo no Kisochishiki [Encyclopedia of Insect and Mould Damage to Cultural Properties and their Control Measures], *Japan Institute of Insect Damage to Cultural Properties*, Vol. 52, 2006, pp. 25-36.

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানি জাতি আরশোলা বা তেলাপোকাকে খুবই অপছন্দ করে এবং এদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে (নগেন্দ্রনাথ, ১২৯৮ : ১৪৪-৪৫; *Yuichiro*, 1971: 76-77)।

জাপানে বিভিন্ন প্রকার মাছ পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে জাপানিরা মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করে। সেখানে 'ইয়াকিউ' নামক এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়—যা মারাত্মক বিষাক্ত। অতি সতর্ক হয়ে উত্তমরূপে না পরিষ্কার করে এই মাছ খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। জাপানিরা আত্মহত্যা করার জন্য অনেক সময় এই মাছ খেয়ে থাকে। মৃত্যুর ভয় সত্ত্বেও তারা এই মাছ না খেয়ে পারে না। তবে জাপানি সৈনিকেরা সম্রাটের আদেশ ব্যতীত এই মাছ খেতে পারে না। এই মাছের মূল্যও অনেক বেশি। জাপান সমুদ্রে আর এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়—যা দেখতে প্রায় দশ বছরের বালকের মতো। এই বিরাট মাছের মুখে ও বুকে কোনো কাঁটা নেই; কিন্তু পেটটি বিশাল, যেখানে অধিক পরিমাণ জল ধারণ করতে পারে। প্রায় দশ বছরের বালকের মতো এই বিরাট মাছের পা আছে, আছে পায়ের আঙ্গুলও। এই মাছ জেডো উপসাগরে পাওয়া যায়। 'তেই' নামে আর এক প্রকার মাছ আছে যার রং অতি উজ্জ্বল। আগে এই মাছকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হতো। 'বক' ও 'মুক্ষি' নামের কুমীরকে জাপানিরা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করে। জাপানের অধিকাংশ অধিবাসী আহারের জন্য মাছ ধরে। কেউ কেউ মাছ ধরে বাজারে বিক্রয় করে (যতীন্দ্রনাথ, ১৩২৩: ৪৩৯)।

জাপান সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। জাপানিরা মুক্তাকে 'কৈনাতাস্মা' নামে অভিহিত করে। বহু পূর্বে জাপানিরা মুক্তার ব্যবহার ও দাম জানতো না, এই বিষয়ে তারা চীনের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে পারে। তখন তারা মুক্তার ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মুক্তা ধরার জন্য জাপানিদের কোনো কর দিতে হয় না। প্রত্যেক জাপানি নাগরিকের মুক্তা ধরার অধিকার রয়েছে। জাপানি ভাষায় বড় বড় মুক্তাকে 'আফোজা' বলে। জাপানিরা মুক্তার একটি বিশেষ গুণ সম্পর্কে অবহিত। একটি জাপানি চিক্ বার্নিশপূর্ণ বাক্সে রেখে দিলে একটি মুক্তার পাশে দুটি মুক্তা জন্মে। 'তকারকৈ' নামে শামুক থেকে এই বার্নিশ প্রস্তুত হয়। জাপান সমুদ্রে পাথর ও সামুদ্রিক প্রবাল পাওয়া যায়। সেখানে এক প্রকার বড় আকারের শামুক পাওয়া যায়, যাতে হাতল লাগিয়ে এক প্রকার চামচ তৈরি করা সম্ভব ছিল।

জাপানে সোনা, রূপা, তামা, লোহা পাওয়া যায়। অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তামা অনেক বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু জাপান সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত সোনার খনি খনন করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অতি পূর্বে যে প্রদেশে সোনার খনি আবিষ্কৃত হত সে প্রদেশের শাসনকর্তা সম্রাটকে সোনার খনির একাংশ প্রদান করে বাকি অংশ সে প্রদেশের উন্নতিকল্পে ব্যয় করতে পারতো। ইতিহাসে দেখা যায়, জাপানিরা মারাত্মকভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। সঙ্গতকারণেই রাজ-রোষের চেয়ে দেবতার রোষকে

*Dhaka University Institutional Repository*

মারাত্মক ভয় পেত। অনেক বছর আগে একটি পর্বত আকসিমকভাবে পড়ে গিয়ে একটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সোনার ঐ খনি খনন করবার সময় প্রবল ঘুর্ণিঝড় শুরু হয়। এই ঘটনার ফলে জাপানিরা মনে করে যে সোনার খনি খনন দেবতার নিকট অনভিপ্রেত; তাই সমস্ত সোনার খনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছিল। বিম্বো প্রদেশের টিন রূপার চেয়েও চক্‌চকে ও উজ্জ্বল। জাপানে লোহা অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের বলে অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনাদি তামায় প্রস্তুত হয়। এক রকম সুন্দর মাটি এখানে পাওয়া যায়, যাকে চিনামাটি বলে। এই চিনামাটির দ্বারা উৎকৃষ্ট বাসন তৈরি করা হয় (যদুনাথ, ১৩১৮: ৪৪)।

বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের গ্রাম ও শহর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। তখন জাপানের ছোট শহরে ৫ শত এবং বড় শহরে ২ হাজার লোক বসবাস করতো। জাপানের বাড়িঘর সাধারণত দোতালা এবং প্রতিটি ঘরে অনেক লোক বাস করে। ফলে কিছু অযাচিত সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।

জাপান সাম্রাজ্যের কিউসিউ দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর। ফলে এখানকার অনেক জায়গায় চাষ সম্ভব হয়। নাগাসাকি, সঙ্গ ও কোকুয়া এই অঞ্চলের তিনটি প্রধান শহর। নাগাসাকি বন্দর শহর এবং বিদেশি নাগরিকেরা এখানে বাণিজ্য করতে পারে। নাগাসাকির বাড়িগুলো অতি সুচারুরূপে নির্মিত। এই শহরের মধ্যে ও বাইরে অনেক মন্দির রয়েছে। এই শহরের ঘরগুলো সাধারণত একতলা। ঘরের কাঠামো কাঠে তৈরি এবং নিচে মাটিলেপা ও সমস্ত ভাগ কাই ও মশলা দিয়ে এটে দেওয়া হয়। প্রতিটি ঘরেই একটি করে বারান্দা থাকে। সঙ্গ নগরে নানা প্রকার বাসন প্রস্তুত করা হয়।

সিফনের বেশির ভাগ জমিই উর্বর। ফলে এই স্থানের কারুকার্য মনোরম ও উৎকৃষ্ট। সিমনোসেকি, ওসাকা, মিয়াকো, কোয়ানো ও জেডো সিফনের প্রধান শহর। ওসাকা বাণিজ্যের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক নদী আছে এবং প্রত্যেক নদীর উপর অতি সুন্দর সেতু লক্ষ করা যায়। ওসাকা শহরের রাস্তাগুলো অপ্রশস্ত হলেও খুবই পরিষ্কার। এখানকার ঘরগুলোর কাঠামো কাঠের এবং সেখানে চুন ও কাদালেপা। ওসাকার অধিবাসীরা খুব ধনী। জাপানিরা ওসাকা শহরকে প্রমোদ-শহর বলে অভিহিত করে। ওসাকা শহরের একটি স্থানে চাল দিয়ে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত করা হয়—যাকে জাপানিরা 'সাকে' বলে সম্বোধন করে। মিয়াকো শহরে প্রধান ধর্মযাজক বাস করেন। তিনি 'দৈরি' নামে পরিচিত। ওসাকা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে একটি পাথরের দুর্গ আছে। এখানকার রাস্তাগুলো অপ্রশস্ত এবং অঞ্চলটি জনাকীর্ণ। দৈদসু থেকে জাপানিরা এক প্রকার মদ প্রস্তুত করে যাকে 'সর' বলে।

কমোডোর পেরির জাপান আক্রমণের পূর্বে জাপানে বিদেশিদের চলাচলের ক্ষেত্রে নানা রকম বিধি নিষেধ ছিল। বিদেশিদের সহজে জাপানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কোনোক্রমে জাপানে

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেও দেশের সর্বত্র তাদের যাতায়াত করতে দেয়ে হতো না। পূর্বে একমাত্র ওলন্দাজরা জাপানের নাগাসাকি বন্দরে বাণিজ্য করতে পারতো। জাপানিরা বিশ্বাস করতো যে ইউরোপীয়রা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদের প্রতি বছর জাপান সম্রাটের দরবারে তাঁর সম্মানার্থে একজন দূত পাঠাতে হতো। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমদিকে রাশিয়া ও আমেরিকার যে সন্ধি হয়, তার পরম্পরায় অনেক বিদেশি জাতি জাপানের কয়েকটি শহরে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ষোল শতক থেকে ইংরেজরা জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৬১৩ থেকে ১৬২৩ সাল পর্যন্ত জাপানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা বাণিজ্যকুঠি ছিল। ক্রমে জাপানিরা পৃথিবীর অনেক জাতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর অনিবার্য ফল ছিল জাপানিদের সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্ম বিষয়ে অতি দ্রুত আশ্চর্যজনক উন্নতিলাভ এবং জাপানিদের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার হয়ে লোকের বিস্ময় উৎপাদন। এই সময় থেকেই জাপানিরা ইউরোপ ও আমেরিকার কাছ থেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষায় বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে।

জাপানে বিদেশিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হলেও সরকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। জাপানের যে সকল শহরে বিদেশিদের প্রবেশাধিকার ও বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়, সেসব শহরে বিদেশিদের সঙ্গে জাপানিদের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য জাপান সরকার এক অতি অদ্ভুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাপানের যে সকল শহরে বিদেশিরা অবস্থান করে তার চারদিকে কাঠ দিয়ে এমন বেষ্টনী দেওয়া হয় যাতে বিদেশিরা তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ না করতে পারে। সেখানে মাত্র দুটি দরজা থাকে। একটি সমুদ্রের দিকে এবং অন্যটি শহরের দিকে। দিনের বেলা জাপানি প্রহরী অতি সতর্কতার সঙ্গে দরজা দু'টি রক্ষা করে এবং রাতের বেলা দরজা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখে।

জাপানের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও ফুল লক্ষ করা যায় এবং এসব উদ্ভিদ ও ফুল অত্যন্ত মনোহর। ওসাকা শহরে নানা প্রকার ফল ও ফুল আছে। শহরের উদ্যানে ও ধর্ম-মন্দিরের চারদিকে অতি যত্ন সহকারে ফুলের গাছ রোপন করা হয়। মিয়াকো শহর বাণিজ্য-প্রধান। জেডো তখন ছিল জাপানের রাজধানী। এখানে তখন জাপানের প্রধান বিচারপতি বাস করতেন। মিয়াকোর নদীগুলোর ওপর সুন্দর সেতু ছিল। প্রধান সেতুটির নাম 'নিফবস'। জেডোর সাধারণ বাড়িগুলো ওসাকা শহরের মতো। জাপান সাম্রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিদের জেডো শহরেই বসবাস করতে হয়। এজন্য এই শহরে অতি সুন্দর বহুসংখ্যক প্রাসাদ লক্ষ করা যায়। শহরের সন্নিকটে সমস্ত প্রণালির উভয় পাশে বহুসংখ্যক বৃক্ষ রোপিত। সম্রাটের প্রাসাদ শহরের মাঝখানে অবস্থিত। জাপান সম্রাট পূর্বে 'কিউবো' উপাধি ধারণ করতেন। তাঁর বসবাসের জন্য সুরম্য প্রাসাদ রয়েছে। প্রাসাদের পেছনে বড় বড় উদ্যান লক্ষ করা যায়। জেডো শহরে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। জেডো শহরের পূর্বদিকে বহু লোক বাসবাস

*Dhaka University Institutional Repository*

করে। এখানে ধান, যব, পাট, তামাক এবং বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদিত হয়। রাশিয়া কাউরাই দ্বীপের কিছু অংশ দখল করলে জাপান জেডো দ্বীপ অধিকার করে। এখানে জাপানিদের নিজ ধর্ম ও আইন প্রচলিত। জাপান সম্রাটের সম্মতিক্রমে এখানে রাজপুরুষরা নিযুক্ত হন।

জাপানিরা প্রধানত মঙ্গোলীয় জাতি। বলা হয়ে থাকে যে, জাপান প্রধানত চীনের কাছে থেকে সভ্যতা শিখেছিল। জাপানিরা ধাতু, পশম, তুলা, কাঁচ ও কাঠ দিয়ে অতি আশ্চর্য পদার্থ তৈরি করতে জানে। বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তারা অতি সুন্দর ঘড়ি, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি সুকুমার বিদ্যা এবং বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প শিক্ষার জন্য জাপানের অনেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাপানিরা অতি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করতে পারঙ্গম। ইয়োকাহামার ১৫ মাইল দুরে কামাকুরা নামক স্থানে ৫০ ফুট দীর্ঘ একটি ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে। অন্য একটি স্থানে ৬৩ ফুট উচু একটি পিতলের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুন্দর মৃন্ময় পাত্র নির্মাণে জাপানিরা সুদক্ষ। মৃন্ময় পাত্র নির্মাণে উৎকর্ষ ও পারঙ্গমতার ক্ষেত্রে জাপানিদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে, ইতিহাসের বহু যুগ আগে নামুচিমিকোটের সময় এই বিদ্যার উৎপত্তি হয়। পূর্বে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে তাঁকে একাকী সমাধিস্থ না করে তাঁর জীবিতকালের সহচরদের সঙ্গে তাঁকে সমাধিস্থ করা হতো। এই নিয়ম জাপানে সমরণাতীতকাল থেকে প্রচলিত ছিল। পরে যিশুখৃষ্টের জন্মের ২৯ বছর আগে এক সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য তাঁর প্রিয় ক্রীতদাসীদেরকে মনোনীত করা হয়। এই সময় ইদ্‌পৌনী প্রদেশ থেকে নমিমোসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি বেশকিছু মৃন্ময় প্রতিমূর্তি নিয়ে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন। তিনি সম্রাজ্ঞীর প্রিয় অনুচারীদের কিছু মৃন্ময় প্রতিমূর্তি নিয়ে বলেন যে, সম্রাজ্ঞীর প্রিয় অনুচারীদের পরিবর্তে মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সমাধিস্থ করা যায়। সম্রাট এই প্রস্তাব যথোচিত বিবেচনা করে মেনে নেন। সেই থেকে পুরোনো নৃশংস ও গর্হিত নিয়মের অবসান হয়। জাপান সম্রাট খুশি হয়ে নমিমোসাউকাউলিকে ‘হাজি’ উপাধি দান করেন। ‘হাজি’ শব্দের অর্থ মৃত্তিকার সুচারু কারিকর। সেই থেকে জাপানে মাটি দ্বারা সুন্দর দ্রব্য নির্মাণের প্রচলন হয়। কথিত আছে যে ১৫শ’ খ্রিষ্টাব্দে আমির নামে এক কোরিয়াবাসী সিসার মত চাকচিক্যশালী একরূপ মাটির পাত্র তৈরি করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তান সন্ততিরা জাপানে এসে এই কাজে প্রবৃত্ত হয় (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৬)।

অনেক আগে জাপানিরা খর্বাকৃতি এবং অতিশয় হিংস্র ছিল। কালক্রমে তারা শান্ত, শিষ্ট ও দয়ালু হয়। জাপানের স্ত্রীলোকদের হাত ও পা ছোট ছিল। তাদের দন্ত ও গ্রীবার গঠন খুব সুন্দর।

*Dhaka University Institutional Repository*

ইউরোপীয়রা জাপানিদের যেসব মারাত্মক সমালোচনা করে সেগুলোর অনেকটাই মিথ্যা। বলা হয়ে থাকে যে, পশুকে জাপানিরা অতি মাত্রায় দয়া করলেও তাদের চরিত্র প্রায় পশুর মতো। এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, জাপানিরা কপট ও স্বার্থপর। গরমের দিনে জাপানি স্বামী ও স্ত্রী নগ্ন হয়ে ভ্রমণ করে। জাপানি স্ত্রীরা স্বাধীন, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট-চরিত্র। কিন্তু এসব ইউরোপীয়দের মিথ্যা-ভাষণ।

জাপানে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোনো উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে প্রথমে দণ্ডিত ব্যক্তি আপনা আপনি অস্ত্রাঘাতে আহত হন। পরে তার কোনো মনোনীত বন্ধু তাঁর শিরোশ্ছেদ করেন। ১৪ শতক থেকে এই নিয়ম বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল।

অনেক আগে জাপানে 'শিন্তো' প্রবর্তিত ধর্ম প্রচলিত ছিল। জাপানের কিংবদন্তি অনুযায়ী 'শিন্তো' সূর্য্য থেকে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া চৈনিক দার্শনিক (৫৫১? - ৪৭৯? খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) প্রবর্তিত মতাবলম্বী লোকও জাপানে রয়েছে। স্পেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ফ্রান্সিস জেভিয়ার (১৫০৬-১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দ) মালাক্কায় কাগোসিমার জাপানি নাগরিক আনজিরোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পর্তুগীজদের সহায়তায় ১৫৪৮ সালের দিকে জাপানে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারে ব্রত হন। কিন্তু জাপান সম্রাটের বিরোধিতার ফলে ১৫৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট কাগোসিমা পরিত্যাগ করেন। জাপানে প্রথমদিকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মারাত্মক রাজরোষের সম্মুখীন হয়। জাপানে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জাপানের অধিবাসীদের ধর্ম নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব সভ্যতায় যে কোনো দেশ ও জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এক বা একাধিক মত, কিংবদন্তি বা ধারণা রয়েছে। জাপানের উৎপত্তি ও জাপানিদের বসবাস সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত লক্ষ করা যায়। পূর্বে জাপানিদের মধ্যে জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও সেখানে জাপানিদের বসতি সম্পর্কে এক অতি আশ্চর্য উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু জাপানের উৎপত্তি ও জাপানিদের বসবাস সম্পর্কিত মতবাদ ও কিংবদন্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পূর্বে জাপানের উৎপত্তি ও জাপানিদের বসবাস সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ হলো যে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে স্বর্গে সাতজন দূত ছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত উপাদান মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। স্বর্গে সাতজন দূতের মধ্যে প্রধান দূত একটি দণ্ড দ্বারা মিশ্রিত পদার্থকে মাটিতে পরিণত করেন এবং এই মাটির সাহায্যে জাপানের দ্বীপসমূহের সৃষ্টি হয়। এসময় জাপানিরা পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এমন কি তারা এও জানতো না যে পৃথিবীতে আরো অনেক দেশ ও বহু জাতি বিদ্যমান এবং তাদের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এই সময় জনগণের অবস্থা সম্পর্কে দু'টি প্রবাদ রয়েছে। একটি প্রবাদ অনুযায়ী স্বৈরাচারী চীনা সম্রাটকে উৎখাত করার জন্য একদল চীনা ষড়যন্ত্র করে। চীন সম্রাট এই

*Dhaka University Institutional Repository*

ষড়যন্ত্রকারীদের সমূলে বিনাশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এত গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছিল যে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিষয় স্বৈরচারী চীনা সম্রাট অবগত হয়ে গ্রেপ্তারকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের জাপানে নির্বাসিত করেন। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বংশেই বর্তমান জাপানিদের উৎপত্তি। অন্য একটি প্রবাদ অনুযায়ী একজন চীনা সম্রাট সিংহাসনে আসীন হয়ে তাঁর বিশাল ধনরাশি ও ঐশ্বর্য্যের বিনাশ যাতে না ঘটে সেজন্য অমরত্ব লাভের আশা ব্যক্ত করেন। চীনা সম্রাট তাঁর অমরত্ব লাভের আশায় যথাযোগ্য অসুধ সংগ্রহের জন্য বহুসংখ্যক চিকিৎসককে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করেন। একজন অতি অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক সম্রাটকে জানান যে, তিনি জ্ঞাত আছেন যথাযোগ্য ওষুধের উপকরণ জাপান দ্বীপে আছে। কিন্তু এই ওষুধের উপকরণের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে। কোনো ভ্রষ্ট চরিত্রের লোক এই ওষুধের উপকরণ স্পর্শ করলে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি চীনা সম্রাটের আদেশে তিনশো বলিষ্ট যুবক ও যুবতী সমভিব্যাহারে জাপানে চলে আসেন। তিনি স্বৈরচারী চীনা সম্রাটকে ঘৃণা করতেন এবং তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে এই কৌশল গ্রহণ করে চীন থেকে জাপানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

কোনো কোনো ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ মনে করেন যে চীন থেকে জাপানিদের উৎপত্তি হয়নি। অতীতে চীন ও জাপানিদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ছিল না। উভয় জাতির মন ও চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধারণা করা হয়, ব্যাবিলন থেকে ভাষা বিভ্রাটকালে যারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদেরই একটা শাখা জাপানে এসে আশ্রয় নেয়। মাঝে মধ্যে চীন ও কোরিয়া থেকে অনেকে এসে জাপানে আশ্রয় নেয়। এই সকল জাতির সংমিশ্রণে জাপানি জাতির উৎপত্তি হয়েছে। উপর্যুক্ত অনুমানের ভিত্তি হলো জাপানিদের শারিরীক আকৃতি একরূপ নয়। জাপানের সাধারণ লোকের আকৃতি খাটো, নাক চেপ্টা আর গয়ের রং তামাটে। কিন্তু জাপানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দের আকৃতি ইউরোপীয়দের মতো। জাপানের পূর্বপ্রান্তের লোকের মাথা বড় এবং নাক চেপ্টা। জাপানিরা অত্যন্ত বলিষ্ট।

জাপানিদের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মত আছে। এই মত অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে দেবতাদের জন্ম হয়। জাপানিদের সৃষ্টি হলে তারা সেখানে রাজত্ব স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

> বহুবৎসর পরে সেই দেববংশে অন্ধদেব ও অর্দ্ধমানবধর্ম্মবিশিষ্ট এক জাতীয় মানবের উৎপত্তি হয়। তাহারা বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপগণের সৃষ্টি। জাপানে জ্যেষ্ঠের মান্য অধিক ছিল; প্রথম-জাত পুত্রের উপাধিও ভিন্ন ছিল। পূর্ব্বকালে জাপানের সম্রাটের শরীর অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত; কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না।

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্রাট মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেন না। কোনো স্থানে যাইবার কালে মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িয়া যাইতেন। সম্রাটের শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাঁহার নখ, দাড়ি, চুল পর্য্যন্ত কেহ কর্ত্তন করিতে পারিত না; তবে তাহার নিদ্রিতাবস্থায় কর্ত্তন করিলে কোনোরূপ দোষ বিবেচিত হইত না—কারণ তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ কার্য্য করাকে চৌর্য্যবৃত্তি মধ্যে গণ্য করা হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাহার দেবত্ব নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে মুকুটটি পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজা মুকুট পড়িয়া যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে; এই জন্য শেষে মুকুট সিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের ভক্ষ্য প্রত্যহ নূতন পাত্রে রন্ধন করা হইত এবং রন্ধনান্তে সে পাত্র ভঙ্গ করা হইত; কারণ তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট-ব্যবহৃত পাত্র অন্য কেহ ব্যবহার করিলে সম্রাটের শারিরীক অসুখ উৎপন্ন হইবে। আবার জাপদিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরির পবিত্র পরিচ্ছদ অন্য কেহ পরিধান করিলে তাহার অসুখ হইবে। সম্রাট মিকাডো নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটী বিবাহ করিতেন, কিন্তু একজনের পুত্র সম্রাটের উত্তাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, দৈরো, কামি প্রভৃতি ভিন্ন মান্যসূচক উপাধি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত। যাজকমণ্ডলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক হইতে বিভিন্ন; ধর্ম্মশাস্ত্র ও সঙ্গীতালোচনা দ্বারা ইহাদিগের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। জাপানের রমণীরা সংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহাদিগের বৎসর গণনা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত। ইহাদিগকে নিনো নামক যুগ খ্রিষ্ট ৬৬০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নেনগো নামক একপ্রকার অব্দও প্রচলিত আছে। বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা অব্দ দ্বারা নির্ণীত হয় (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৭-৩৮)।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত তথ্য বিভ্রান্তিকর। নগেন্দ্রনাথ বসুর তথ্য থেকে ধারণা হয়, জাপানি সম্রাট মহাভারতে বর্ণিত ‘ইন্দুমতী’, যিনি স্বর্গ থেকে পতিত ফুলের ঘায়ে মুর্চ্ছা গিয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত তথ্যে জাপান সম্রাটকে কেউই স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারতো না। জাপানের সম্রাট মাটিতে পা ফেলতেন না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কীভাবে সম্রাট মানুষের কাঁধে চেপে স্থানান্তরে যেতেন?

শিন্তো ধর্মাবলম্বীদের ‘সিন্‌জু’ বলা হয়। মিয়ালিয়া নামে এঁদের অনেক মন্দির আছে। ‘নেমি’ ও ‘কানিফি’ নামক বিবাহিত নর ও নারী এই মন্দিরের সেবক ও সেবিকা। ‘সিন্‌জু’দের বিশ্বাস যে অধার্মিক মারা গেলে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১, ১৫ ও ২৮ দিনে এরা কোনো কাজ করে না; বরং উপাসনা ও আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করে। এদের বছরের দ্বিতীয় পর্বে আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হয়।

শিন্তোদের আপ্রিকক শাখার উৎপত্তি সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন। বছরের দ্বিতীয় পর্বে আপ্রিকক শাখা ব্যবহৃত হয়। রিনফাগাভার কাছে এক ধনী ব্যক্তি বসবাস করতেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিল না। এজন্য কামির কাছে প্রার্থণা করায় শীঘ্রই তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। কিন্তু হঠাৎ এই

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী ৫০০ ডিম প্রসব করলেন। লোক লজ্জার ভয়ে স্বামী এই ডিমগুলো একটা বাক্সে রেখে তা নদীতে নিক্ষেপ করলেন। তবে নদীতে নিক্ষেপ করার আগে বাক্সটির উপর তিনি KmRiæ কথাটি লিখে দিলেন। একজন জেলে এই বাক্সটি পেয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। যথাসময়ে ৫০০ ডিম থেকে ৫০০ শিশুর জন্ম হলো এবং জেলে তাদের লালন-পালন করতে লাগলেন। জেলে খুব গরিব এবং সঙ্গতকারণেই ৫০০ বালকের ভরণপোষণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে জেলে একজন ধনী মহিলার নিকট এই ৫০০ বালকের আহার দেবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি মহিলার কাছে বাক্সের বিষয়ে সবকিছু এমনকি উপরে যে KmRiæ কথাটি লেখা ছিল তা-ও জানান। তখন ধনী মহিলা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, সকল বালকই তাঁর সন্তান। তিনি নানা প্রকার খাদ্যে তাঁর সন্তানদের তৃপ্ত করলেন। সে সময় আপ্রিকক শাখা হয় ব্যবহৃত এবং পরবর্তীকালে এই ঘটনা একটি পর্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৮)।

শিন্তো ধর্মাবলম্বীগণ তীর্থ ভ্রমণপ্রিয়। তাদের টুপি ইউরোপীয়দের মতো এবং প্রত্যেকের টুপির গায়ে স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকে। কারণ পথিমধ্যে কোনো শিন্তোর মৃত্যু হলে যাতে তার পরিচয় সহজেই জানা যায়। জাপানিরা অনেক পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে।[৬] চীনা ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত বই অনূদিত হয়েছিল, তা আবার জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা হয়—সেগুলোর অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে সংস্কৃত চর্চা ছিল অতি বিরল। জাপান থেকে যে দু'জন যুবক ইংল্যান্ডে গমন করেন, তাদের মধ্যে বন্‌নিউ নন্‌জিও ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত ১৬৬২ শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে আছে। প্রকৃত পক্ষে চীনাদের কাছ থেকে জাপানিরা বিদ্যা, শিল্প, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের নিম্নের সারণিতে উল্লেখিত কয়েকটি অনুশাসন জাপানে প্রবলভাবে পালিত হতে দেখা যায়:

সারণি: ১

বৌদ্ধ ধর্মীয় কতিপয় অনুশাসন

| অনুশাসনের নাম | অর্থ |
|---|---|
| সেলিত | হিংসা না করা |

৬. নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে চীন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে প্রবেশ করেছে। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত এই তথ্য অসম্পূর্ণ; কেননা চীন ও কোরিয়া উভয় দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে প্রবেশ করেছে (নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৮)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

| | |
|---|---|
| ফুলতা | চুরি না করা |
| সিজেন | চরিত্র নষ্ট না করা |
| মেগো | মিথ্যা কথা না বলা |
| অন্‌ফিন্‌ | মদ না খাওয়া |

সূত্রঃ নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত (১৩০২-১৩০৩), wek‡Kvl, খণ্ড-৭, কলিকাতা, পৃ. ৪০।

কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, অনেক জাপানি প্রায়ই এসব অনুশাসন পালন করে না। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে ৩৪ লক্ষ বৌদ্ধ ছিলেন যাদের ১০ লক্ষ ছিলেন শিন্তো সম্প্রদায়ের। তাঁদের মতে, ৩৮১ সালে চীনা পণ্ডিত হুইউয়েন একটি মঠ স্থাপন করেন এবং সেই মঠ থেকে যে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় শিন্তোরা সেই মতানুসারে কাজ করে। এই মত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। ১১৭৪ সালে জাপানে শিন্তো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে 'মহাযান' সম্প্রদায়ের হাতে লেখা একটি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়। এই পুথিতে বৌদ্ধ ধর্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে(নগেন্দ্রনাথ, ১৩০২-১৩০৩ : ৩৭)।

জাপানে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য 'কোহাটজুকৈ' নামে একটি সমিতি আছে। এই সমিতির সদস্য ২০০ জন। পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত সদস্যরা বছরে একবার জাপানের রাজধানীততে মিলিত হন। কিন্তু অন্য সময়ে যে যার বাসস্থানে অবস্থান করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণির গণ্য-মান্য ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও পুরোহিতেরা এই পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতির সদস্য হন। প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের মাধ্যমে জাপানের এই পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতি বেশি উপকার পায়। জাপানের ধর্ম-মন্দিরে এবং অভিজাতদের গৃহে যে সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক উপাদান আছে সেগুলো সম্পর্কে পুরোহিতরা অবগত। জাপানে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতি তার সংরক্ষিত পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করেছে এবং তালিকাটি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মুদ্রিত তালিকা পাঠ করলে জাপানের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে ও সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই সমিতির প্রস্তুত করা ইতিহাসে জাপানের সম্রাটদের নামও রয়েছে।

পূর্বে জাপানের সম্রাটদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। সম্রাট তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কাজ করতে পারতেন। কেউই কোনো প্রকার বাধা দিতে পারতেন না। সাধারণভাবে বিশ্বাস ছিল যে, জাপানের সম্রাটদের উৎপত্তি দেবতাদের মাধ্যমে। তাই জাপান সাম্রাজ্যের কোনো ধনবান ও

শক্তিশালী ব্যক্তি সম্রাটের বিরোধিতা করতে সাহস পেতেন না। সম্রাট সহজে, সুখে ও শান্তিতে তাঁর সাম্রাজ্য শাসন করতে পারতেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনো গোলযোগ যাতে না হয় সেজন্য জাপান সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা প্রদেশে বিভক্ত করে শাসনের জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করতেন। রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করা হলে কোনোরূপ বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে না; এবং সম্রাট বংশানুক্রমে শাসন করতে পারতেন। যাঁরা বড় প্রদেশ শাসন করতেন, তাঁদের 'vB¨g I ও উচ্চ উপাধিবিশিষ্ট বলা হতো। অন্যদিকে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ছোট প্রদেশ শাসন করতেন তাঁদের wm I wg I বলা হতো। সিওমিও-রা ৬ মাস তাঁদের রাজধানীতে বসবাস করতে এবং ৬ মাস সম্রাটের দরবারে উপস্থিত থাকতেন। সিওমিওদের পরিবার রাজধানীতে বসবাস করতেন। শাসন বিষয়ে যেমন সম্রাটদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তেমনি ধর্ম বিষয়েও সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। জাপানে ধর্ম বিষয়ে দৈরির একাধিপত্য ছিল। কোনো এক সময় দৈরি মারাত্মক ক্ষমতাশালী হয়ে শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালনা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। ফলে তাঁকে সম্রাটের অধীনেই থাকতে হয়েছিল। জাপানের সকল ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার পদ পান। কিছুকাল জাপান সম্রাটের উপাধি ছিল wKD‡ev †mvgv। কিউবো সোমা উপাধিধারী সম্রাটরা শাসন ব্যাপারে নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন করতে পারতেন বটে, কিন্তু তাঁরা অনেকদিন থেকে প্রচলিত নিয়মাবলির পরিবর্তন করার জন্য সাহসী হতেন না (উমাকান্ত, ১৯০৫: ৪)।

পেশা অনুযায়ী জাপানিদের আট (৮) ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন শাসনকর্তা, উচ্চ বংশীয় অভিজাত শ্রেণি, যাজক, সামরিক কর্মচারী, বিচার বিভাগীয় কর্মচারী, ব্যবসায়ী বা বণিক, শিল্প ব্যবসায়ী এবং মজুর। জাপান দ্রুত উন্নতিশীল সাম্রাজ্য। অতি অল্প দিনের মধ্যে তারা লক্ষ্যণীয় উন্নতি সাধন করেছে। জাপানকে বলা হয় এশিয়ার 'ব্রিটেন'। জাপানিরা আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে অনুকরণ করে।

১৮৮৪ সালে মাৎসুহিতো জাপানের সম্রাট হন। ৬৬০ বছর আগে জিম্মুতেন্নো যে বংশ স্থাপন করেন, মাৎসুহিতো সেই বংশজাত। এই বংশ বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জাপানে রাজত্ব করে। মাৎসুহিতো জিম্মুতেন্নো থেকে ১২৩ পুরুষ অধস্তন। এই সম্রাটের উপাধি 'মিকাডো'। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপান সম্রাট তাঁর প্রধান সভার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকার্য পরিচালনা করেন। রাজবংশ স্থাপনের সময়ই এই প্রধান সভার উৎপত্তি হয়। ইউরোপীয় মন্ত্রিসভার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন হয়, জাপানের প্রধান সভার উল্লেযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সেসব কাজ সম্পন্ন করেন। ১৮৭৫ সালে জাপানে 'জেনরোইন' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় তর্ক-বিতর্কের পর যে সমস্ত আইন পেশ করা হয়, তা মন্ত্রিসভা কর্তৃক সমর্থিত হলে এবং সম্রাট অনুমোদন করলে তা চূড়ান্তভাবে আইন বলে গণ্য হয়। জেনরোইন সভার সদস্য ৩৭ জন। ১৮৮১ সালে জাপানে mvbwRBb নামে একটি

রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার সভ্যরা আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং কার্যনির্বাহক রাজপুরুষেরা বিশেষ বিশেষ কার্য বিচার করেন। এসব সভ্য বিচার সম্বন্ধীয় অভিযোগেরও মীমাংসা করেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের জাতীয় প্রশাসনের জন্য ৫৭টি বিভাগ ছিল এবং প্রতিটি বিভাগে একজন প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। প্রত্যেক বিভাগের অধীনে কতগুলো শহর ও গ্রাম আছে। স্থানীয়ভাবে কার্যনির্বাহের জন্য একজন কর্মকর্তা রয়েছেন। তাঁর উপাধি †Pv। এশিয়ায় জাপান পাশ্চাত্য ধরনের দেশ। এর সেনাবিভাগ জার্মান আদর্শে গঠিত। প্রত্যেক জাপানির জন্য সামরিক শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ১৮৮৩ সালে জাপানের সামরিক বিভাগে ৪৪টি বিভাগে পদাতিক সৈন্য ছিল ৩২,৯৬৪ জন সেনা, অশ্বারোহী এক দলে ৪৮২ জন এবং সাত (৭) দলে বিভক্ত করে গোলন্দাজ বাহিনীর সংখ্যা ছিল ২,৬৮৭ জন।

ভবিষ্যতের জন্য পদাতিক সৈন্য ৪২,৬০৬ জন এবং অশ্বারোহী সৈন্য ১৬,০৮০ জন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। তাদের সাহায্যার্থে ৬,০৩৩ অশ্বারোহী সৈন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৮৮৩ সালে জাপানের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০,৫,১১০ জন। জাপানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার স্কুল ছিল। যাকে সাংগ্রামিক বিদ্যালয় বলা হতো। এই সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে ১২০০ ছাত্র ছিল। ১৮৮৩ সালে জাপানে বড় ২৮টি রণতরি ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান ছিল। এছাড়া অনেক ক্ষুদ্র রণতরি ছিল। ১৯০৩-১৯০৪ সালে চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সৈন্য ও যুদ্ধ-সজ্জা বৃদ্ধি করা হয়েছিল (উমাকান্ত, ১৯০৫: ৭)।

তিন শতক থেকে জাপানের ইতিহাস লেখা আরম্ভ হয়েছিল। জাপানিরা খুব বাণিজ্যপ্রিয়। ইউরোপের মতো বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা ধনী হয়েছে। তাদের প্রাদেশিক বাণিজ্য বেশি এবং দেশের মধ্যে অনেক বাণিজ্য বন্দর গড়ে তুলেছে। জাপানের শহরগুলোতে রাস্তাগুলো প্রশস্ত এবং সেগুলো প্রায় সব সময় গাড়ি, ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ। রাস্তাগুলোর উভয় পাশে গাছের সারি লক্ষ করা যায়।

বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপান থেকে তামা, কর্পূর, বার্নিশদ্রব্য, পশমি কাপড়, চাল, mv‡K ও mi নামক মদ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চিনি, হাতীর দাঁত, টিন, সীসা, লোহা, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি দ্রব্য জাপানে আমদানি করা হয়। আগে জাপানে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির ভাগ বেশি ছিল। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে গড়ে জাপানে আমদানি হয় ১৬ কোটি টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানি হয় ১৫ কোটির টাকার দ্রব্য। জাপানে রাজস্ব আয় বেশি নয়। প্রত্যেক জাপানির গড়পড়তা আয় ৬২ টাকা আর তাকে রাজস্ব দিতে হয় মাত্র ৫ টাকা। জাপানে বাণিজ্য করার জন্য যে সকল বিদেশি আসেন, তাঁদের সর্বত্র যেতে দেওয়া হয় না। এমনকি চীনের লোকদেরও জাপানের সর্বত্র

*Dhaka University Institutional Repository*

যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। বিদেশিরা জাপান ভ্রমণের জন্য উপস্থিত হলে সম্রাটের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারেন না। ১৯০৩-১৯০৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানিদের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটে। যে চীন এক সময় প্রবল শক্তিশালী ফরাসিদের পরাজিত করেছিল, সেই চীন এখন ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানের কাছে বারংবার পরাজিত, লাঞ্চিত ও বিশেষভাবে অবমানিত হয়ে সন্ধি ভিক্ষা করে। প্রত্যেক যুদ্ধে চীন জাপানের নিকট পরাজিত হয় (উমাকান্ত, ১৯০৫: ৭)।

জাপান সাধারণত 'সূর্যোদয়ের স্থান' নামে পরিচিত। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানিরা যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়েছে। এশিয়ায় জাপান একটি ছোটো দেশ হলেও শৌর্য্য, বীর্য্য ও উন্নতিতে একটা প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। জাপানে সম্রাটের বিনা অনুমতিতে কেউ কোনো দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারে না। জাপানে চাল প্রধান খাদ্য। জাপান সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে কেউ বিদেশে চাল পাঠাতে পারবে না। এ কারণেই জাপানে দুর্ভিক্ষ নেই এবং এ কারণেই জাপান ক্রমান্বয়ে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। জাপানিরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের শাসন প্রণালি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের সম্রাট অতি শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন। ১৮৯০ সালে জাপানে প্রথম পার্লামেন্টের বৈঠক আহুত হয়। জাপানের শাসন প্রণালি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলেও 'মিকাডো' অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা অনেকটাই অক্ষুণ্ন রয়েছে। ১৮৯০ সালে জাপানের রাস্তায় ১২১৩ মাইল বাষ্পীয় শকট চলে। জেডো অর্থাৎ টোকিও, কানাগাওয়া অথবা ইয়াকোহামা, হিয়োগো, ওসাকা, হাকাদেৎ, নিগাতা ও নাগাসাকি ইত্যাদি স্থানে বিদেশিদের বাণিজ্য করতে দেওয়া হয়। জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়েছে (উমাকান্ত, ১৯০৫: ৬)।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ঝরনা রয়েছে। ঝরনা প্রকৃতির দান, যা পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। জাপানেও বেশ কয়েকটি ঝরনা আছে। ঝরনা নিয়ে কাহিনি ও লোকসাহিত্য রচনা করা হয়েছে। Rvcwb dvbm গ্রন্থের লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) আদিনিবাস বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘদিন fviZx সাময়িকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি জাপান ভ্রমণ করেননি। কিন্তু বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্যে 'জাপানের ঝরনা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। জাপানে সর্বাপেক্ষা বড় ঝরনাগুলো 'কী' অঞ্চলের 'নাচীর' মধ্যে অবস্থিত। এখানে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। জাপানের 'কানন' সম্প্রদায়ের যে ৩৩টি পবিত্র তীর্থমন্দির আছে, এগুলোর মধ্যে এই মন্দিরটি প্রথম ও প্রধান। জাপানের ঝরনাগুলোর কোনো নাম নেই। সংখ্যা ও প্রকৃতি

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুসারে ঝরনাগুলোর নাম যেমন—‘ঈচি’ বা এক, ‘নী’ বা দুই ও ‘সান্‌-নো-তাকি’ অর্থাৎ তৃতীয় ঝরনা। জাপানের সবচেয়ে বড় ঝরনাটি ২৭৫ ফুট উঁচু। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> জাপানের প্রকৃতি-শ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে জাপানের ঝরনাগুলি। সেখানকার পাহাড়ের কোলে যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার তুবড়ির মতো শুভ্র ঝরনাগুলি ঝরিয়া পরিতেছে। সে স্থানগুলি এমনি চমৎকার ও মনোরম যে মনে হয়, লোকে যে বলে ইহা দেবতার লীলাভূমি তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। জাপানের সৃষ্টির দিন হইতে—অর্থাৎ যে দিন দেবী ইজানামি ও দেব ইজানাগি তাঁহাদের মণিমাণিক্যমণ্ডিত শূলের দ্বারা সমুদ্রের জল আলোড়ন করিতে করিতে শূলের উজ্জ্বল অগ্রভাগ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া এই জাপান দেশটি সমুদ্রের বুকের উপরে একটি পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেইদিন হইতে জাপানের ঝরনা এক অসীম ক্ষমতাশালী দেবতার বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। এই দেবতারই অনুগ্রহে জাপানের আকাশে আলো ফোটে, বাতাস ছোটে ও মেঘ জলদান করে; ইঁহারই ক্রোধে, ঝড় উঠিয়া দেশ লণ্ডভণ্ড হয়, প্লাবনে সব ভাসিয়া যায়, আগুনে ভস্মসাৎ হয় (মণিলাল, ১৩২০ : ৪১৭)।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পাহাড় ও পর্বতের দেশ বিধায় জাপানে অসংখ্য ঝরনার অস্তিত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এই ঝরনাসমূহের সঙ্গে জাপানের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনেকটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাপানে ঝরনাসমূহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক কাহিনি। কিন্তু কিছু কাহিনি বাস্তবতা বর্জিত। এই বাস্তবতা বর্জিত কাহিনি বহুকাল জাপানিরা মনে রেখেছে এবং ঝরনাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে শ্রদ্ধা করে।

ঝরনাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে শ্রদ্ধা করার বিষয়টি সর্ম্পকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> জাপানীরা চিরদিনই প্রকৃতির উপাসক; শ্রদ্ধা, ভক্তিভয়ে তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ আভরণে এই ঝরনাগুলি সম্পর্কে প্রবাদের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, ঝরনার এই পবিত্র জল লইয়া কত অভিষেক হইয়াছে, কত পাপীর পাপক্ষালন হইয়াছে, কত তপস্বী ইহার কোলে বসিয়া তপস্যা করিয়াছে, কত অনুতপ্ত পাপী তাহাদের পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়াছে, কত ব্যর্থ জীবন ইহাতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—সেই সমস্ত সমৃদ্ধি বহন করিয়া এই শুভ্রোজ্জ্বল ঝরনাগুলি মানবের ভয়বিস্ময়মুগ্ধ চোখের সম্মুখে এখনও জীবন্ত হইয়া আছে (মণিলাল, ১৩২০ : ৪১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের ঝরনাকে জাপানিরা কেবল পূত-পবিত্র নয়, আধ্যাত্মিক বিষয়ও মনে করে। ঝরনার জলের কাছে বসে বহুদিন তপস্যার পর জাপানের সম্রাট মাকুজু কোয়াসান (১৮৪২-১৯১৬) মোক্ষ লাভ করেন। কেসা-গোজেন নামে এক বিবাহিতা রমণীর হত্যাকারী মেগাঙ্কুর পাপস্খলন ঝরনার জলের কাছে হয়েছিল। ঝরনার পাশে বসে আত্মসমালোচনা ও অশেষ অনুতাপের পর এখানেই মেগাঙ্কুর ঋষিত্ব লাভ করেন। ঝরনাকে কেন্দ্র করে জাপানে বেশকিছু কাহিনি ও লোক-কাহিনির অবতারণা করা হয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে এসবের কিছু উল্লেখ করেছেন। এখানে সে রকম কিছু কাহিনি ও লোককাহিনির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হলো। প্রথমেই কেসা-গোজেন হত্যা-কাহিনি—

> মেগাঙ্কু নামে এক ব্যক্তি কেসা-গোজেন নামে এক বিবাহিতা রমনীকে ভালোবাসতো। কিন্তু কেসা-গোজেন তাঁর স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ ছিল। কিন্তু পরকীয়া প্রেম এতই মারাত্মক যে মেগাঙ্কুর এতো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে জেন-তেন-প্রকারে তাঁর কেসা-গোজেনকে পেতেই হবে। মেগাঙ্কুর কেসা-গোজেনকে পাওয়ার জন্য কেসা-গোজেনের মায়ের উপর অত্যাচার চালায়। মেগাঙ্কুর কেসা-গোজেনের মাকে জানায় যে, যেভাবে হোক না কেন কেসা-গোজেনকে তার নিকট দিতে হবে, অন্যথায় সে কেসা-গোজেনের মাকে হত্যা করবে। মায়েরসমূহ বিপদ দেখে কেসা-গোজেন এই শর্তে রাজি হয় যে, যদি গোপনে মেগাঙ্কুর কেসা-গোজেনের স্বামীকে হত্যা করতে পারে, তাহলে মেগাঙ্কুর পত্নী হতে তার কোনো আপত্তি থাকবে না। মেগাঙ্কু কেসা-গোজেনের এই প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে সম্মত হলো। গোপনে কেসা-গোজেন মেগাঙ্কুকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল যে কখন তাঁর স্বামী ঘুমায়(মণিলাল, ১৩২০ : ৪১৯)।

যথাসময়ে মেগাঙ্কু রাতে তার প্রণয়িনীর ঘরে উপস্থিত হয়ে আপাদমস্তকাবৃত কেসা-গোজেনের স্বামীর দেহের উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি বসিয়ে দেয়। কিন্তু মেগাঙ্কু অত্যন্ত অবাক হলো যখন সে শুনলো মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ নারী কণ্ঠের। মেগাঙ্কু অত্যন্ত দ্রুত আবরণ উন্মোচন করে দেখলো তারই কাঙ্ক্ষিত প্রণয়নী কেসা-গোজেনের দেহের উপর তরবারি বিদ্ধ রয়েছে। অনুতাপে বিদ্ধ হয়ে মেগাঙ্কু তখনই বিবাগী হয়ে গেল।

কোনো স্থানে পাশাপাশি দু'টি ঝরনার উপস্থিতিকে জাপানিরা স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করে। কোবে শহরের কাছে 'নুনোবিকির ঝরনা'—সেখানে 'মি-দাকি' স্ত্রী ও 'ওদাকি' স্বামী। কোবের পর্যটকদের কাছে 'নুনোবিকির ঝরনা' বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এখানে চা-এর আড্ডা সর্বদাই জনকলরবে গুলজার থাকে। শোজি হ্রদের সন্নিকটে বিখ্যাত ফুজি পর্বতের পাদদেশে একটি ঝরনা-পরিবার, নাম 'শিরোইতে'। সত্যিই যেন একটি সম্পূর্ণ পরিবার। সেখানে দু'টি বড় ঝরনা—যেন

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রী। আর কতোগুলো ছোট ছোট ঝরনা—যেন ভাই, বোন, নাতি ও নাতনীরা তাদের ঘিরে আছে। এর কাছেই একটি বিপুল উচ্ছ্বাসময় ঝরনা—যা 'ওতো-দেমে' নামে সকলের কাছে পরিচিত। 'ওতো-দেমে' জাপানি শব্দের অর্থ হলো 'চুপ'। এই ঝরনার নামের পেছনে একটি লোককাহিনি রয়েছে।

এক সময় দুই ভাই তাদের পিতৃহন্তাকে খুঁজতে খুঁজতে দুই দিক থেকে এই ঝরনার কাছে আসে। তারা একজন নিচে ও একজন ওপরে। একে অন্যকে দেখতেও পায়। কিন্তু ঝরনার জলের গর্জনে একে অন্যের কথা শুনতে পায় না। অনেক সময় পর দুই ভাইয়ের দেখা হলো। কথা বলার জন্য তাদের মন ব্যাকুল, কিন্তু ঝরনার জলের গর্জনের কারণে একে অন্যের কথা শুনতে পেল না। তাদের মনের মধ্যে এই ব্যাকুলতা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এক সময় ঝরনার জলের গর্জন স্তব্ধ হয়ে যায়। দুই ভাইয়ের কথা বলা শেষ হবার পর আবার ঝরনার জলের গর্জন শুরু হয়। এজন্য এই ঝরনাটির নাম হয়েছে 'চুপ'।

ঝরনা নিয়ে আরো একটি লোককাহিনি রয়েছে। মিনো প্রদেশে ওঙাকির সন্নিকটে একটি ঝরনা আছে। এটি থেকে নাকি অনেকদিন সুরার ফোয়ারা প্রবাহিত হতো। এই ঝরনার কাছে এক বৃদ্ধ চাষী তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে বসবাস করতেন। বৃদ্ধ চাষির বয়স অনেক এবং তাদের মতো গরিব ঐ এলাকায় আর ছিল না। শেষ জীবনে বৃদ্ধের একমাত্র অন্তিম ইচ্ছা যে তিনি একবার সুরা পান করবেন। বৃদ্ধের পুত্রের চিন্তা হলো যে পিতার সাধ মেটাতে না পারলে চিরদিন তার অনুতাপ থেকে যাবে। এজন্য বৃদ্ধের পুত্র ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। অনেক ভেবে একটা পন্থা পুত্র আবিষ্কার করলো। সে এক মুঠো ভাত কম খেতে লাগলো। এক সময় আরও কমিয়ে সে আধ মুঠো করে ভাত খেতে লাগলো। পুত্রের একমাত্র চেষ্টা বৃদ্ধের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করা। বৃদ্ধের পুত্র শেষে অনাহারে একেবারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লো। এরূপ পিতৃভক্তি দেখে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে এই ঝরনার মুখে সুরার উৎস খুলে দিলেন। বৃদ্ধ যতদিন জীবিত ছিলেন, এই ঝরনা থেকে বৃদ্ধের পুত্র পিতার জন্য সুরা নিয়ে যেতো (মণিলাল, ১৩২০ : ৪২০)।

জাপানে ঝরনাসমূহের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় হলো নিক্কোর সন্নিকটবর্তী 'কেগোন ঝরনা'। এটির জল ২৫০ ফুট উচ্চ থেকে ঋজুভাবে মাটিতে এসে আছড়ে পড়ছে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিছেন—

> ... চতুর্দিকে কী চমৎকার শীকর-নির্মিত-মায়াজাল রচিত হইয়া উঠিতেছে। শোভায় ও সৌন্দর্য্যে এই ঝরনাটি শ্রেষ্ঠ;- জাপানীরা এটিকে বড়ই ভালোবাসে, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে এহার উপরে একটি শোকের কালিমা আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক

*Dhaka University Institutional Repository*

> বিফলমনোরথ ছাত্র ইহারই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহারই দেখাদেখি আরো কয়েকটি সমাবস্থার ছাত্র পরে পরে তাহার গতি অনুসরণ করে। এই স্থানে আসিয়া আত্মহত্যা করাটা ছেলেদের মধ্যে যেন চলিত হইয়া পড়িতেছিল। সেই জন্য এই স্থান এখন প্রহরী-বেষ্টিত। নিক্কোর নিকরবর্তী আরো একটি ঝরনার নাম কিরিফুরি অর্থাৎ কুহেলি-প্রপাত (মণিলাল, ১৩২০ : ৪২১)।

সেৎসু প্রদেশের মিনোয়া পর্বতের উপরে মিনোয়ানামে একটা খুব বড় ঝরনা রয়েছে। ১৯৬২ সাল থেকেই এটি তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেসময় জাপান সরকার বিপুল সাড়ম্বরে এই ঝরনার অধিষ্ঠাতা দেবতার পূজা করেছিল। জনশ্রুতি আছে যে ঝরনার এই পূজার পর জনগণের সুদীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয় অর্থাৎ বহুদিনের অজন্মা ও অনাবৃষ্টি বিদূরিত হয়ে সেখানে সুখ শান্তি ফিরে আসে। এমনি করে জাপানের ঝরনার কল্পিত দেবদেবী বহুদিন থেকে পূজিত হন। কত কবি জাপানের ঝরনার প্রশস্তি লিখেছেন, এর সৌন্দর্যের গান লিখেছেন, কত চিত্রকর ঝরনার প্রাণের কথা এঁকেছেন, কত পুণ্য স্মৃতি, কত বিখ্যাত চিত্র, কত গীত-গাঁথার সঙ্গে জড়িত হয়ে জাপানের ঝরনা জীবন্ত হয়ে রয়েছে তার শেষ নেই (Bing, 2015:147)।[৭]

এই অধ্যায়ে বাঙালির রচনার মাধ্যমে জাপান ও জাপানিদের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হয়েছে। জাপান সম্পর্কে বাঙালিদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি, প্রকৌশলগত ও আর্থিক উন্নতিতে জাপানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বাঙালি কীভাবে জাপানকে জেনেছে ও এই জানার অভিপ্সা কীভাবে তাঁদের মন ও মানসিকতাকে প্রলুব্ধ করেছে—তা বিশ্লেষণের চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ভারতের মতোই জাপানের রয়েছে বিভিন্ন সম্পদ এবং জাপান উনিশ শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার নৌ-জরিপকারক ম্যাথিউ কলব্রেইথ পেরির আক্রমণের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। অনুকরণপ্রিয় জাপানিরা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত জ্ঞান আয়ত্ব করে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী স্বদেশের অগ্রগতি সাধন করে। এই অধ্যায় তার পটভূমিকা মাত্র।

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে,Bing Wang, Aya Nakamura, Makoto Suzuki, *The Historical Development of Modern Fountains in Japanese Gardens*, Tokyo, 2015.

*Dhaka University Institutional Repository*

তথ্যনির্দেশ

অবনীকুমার দে (১৩৩১), ‘ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতি-বৃদ্ধি’,gvbmx I g¤§evYx, শ্রাবণ

উমাকান্ত হাজারী (১৯০৫), be¨ Rvcvb I iæl-Rvcvb h‡×i msw ÿ ß BwZnvm, কলিকাতা

‘জাপানী কুকুর’ (১২৮১), evgv‡ewabx cwÎKv, মাঘ ও ফাল্‌গুন

নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত (১৩০২-১৩০৩), wek‡Kvl, খণ্ড-৭, কলিকাতা

যতীন্দ্রনাথ সোম (১৩২৩), ‘জাপানের অন্তর্দ্দেশীয় সাগর’, A”Pbv, পৌষ

যদুনাথ সরকার (১৩১৮), ‘জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি’, fviZx, বৈশাখ

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৩২০), ‘জাপানের ঝরনা’, fviZx, শ্রাবণ

*Dhaka University Institutional Repository*

মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা (১৯২৩), Rvcvb I e‡½ cjq fwgK¤ú, ময়মনসিংহ

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (১৯৮৭), e½mwnZ¨w favb, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা

রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (১৯৯৬), wØ‡R›' iPbvewj, দ্বিতীয় খণ্ড,কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ,তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি

Bing Wang, Aya Nakamura, Makoto Suzuki (2015), *The Historical Development of Modern Fountains in Japanese Gardens*, Tokyo.

Yuichiro Atsushi (1971), Japanese Cockroach, Tokyo

Yamano Katsuji, Komine Yukio (2006), "Bunkazai no Shiroari Higai to Bojo Taisaku no Genjo" [Harmful Insects and Damage to Cultural Properties], Bunkazai no Chu-kin Gai to Bojo no Kisochishiki [Encyclopedia of Insect and Mould Damage to Cultural Properties and their Control Measures], *Japan Institute of Insect Damage to Cultural Properties*, Vol. 52.

J. Charles Schencking (1920), "The Great Kanto Earthquake and the Culture of Catastrophe and Reconstruction in Japan", *Journal of Japanese Studies,* Vol. 34 No.2.

Gavan McCormack (1996), *The Emptiness of Japanese Affluence*, ME Sharpe: Armonk, New York.

*Dhaka University Institutional Repository*

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস

আলোচ্য সময়ে বাঙালিদের বাংলা ভাষায় জাপান চর্চার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন প্রকার। কোনো লেখক জাপান ভ্রমণপূর্বক নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার কোনো লেখক জাপান সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার কোনো কোনো লেখক জাপান সম্পর্কে লেখার জন্য সরাসরি অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন জাপানের প্রাণ। যাহোক, এরূপ বিবিধ মাত্রা ও ঘটনা নিয়ে জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এই অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনে জাপানের ইতিহাস রচনার জন্য কিছু ইংরেজি গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশ্ব সভ্যতার মধ্যে একটি সুন্দর ও লক্ষ্যণীয় সমীকরণ হলো প্রতিটি সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সেই সভ্যতার নিজস্ব ইতিহাস বা কিংবদন্তি রয়েছে এবং তা সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক না কেন। বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক বিশ্বের অনেক সভ্যতার সৃষ্টি-রহস্যে সূর্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই হিসেবে জাপান, ভারত, ল্যাটিন আমেরিকা, মিশর, ব্যাবিলন, রোম, গ্রিস, পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপীয় সভ্যতাসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়।[৮] প্রশান্ত মহাসাগরের যে অঞ্চলটি দূরপ্রাচ্য নামে পরিচিত, সেখানে চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত চারটি প্রধান এবং কয়েক হাজার ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত। এই চারটি প্রধান বা বড় দ্বীপের নাম হোক্কাইদো, হন্‌শু, শিকোকু ওকিউসু। জাপানের অধিকাংশ অঞ্চল পার্বত্য এলাকা। জাপানিরা তাঁদের দেশকে ‘নিহন’ বা ‘নিপ্পন’ বলে অভিহিত করে। এর অর্থ ‘সূর্যের উৎপত্তি’। ইংরেজেরা জাপানের নাম দিয়েছে ‘সূর্যোদয়ের দেশ’।

৮. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারেJoseph Azize (2005), The Phoenician Solar Theory, NJ : Gorgias Press; William Tyler Olcott (1914/2003), Sun Lore of All Ages : A Collection of Mythes and Legends Concerning the Sun and Its worship, Adamant Media corporation; Jacquetta Hawkes (1962), Man and the Sun gaithersburg, MD, USA, Solpub Co.

Dhaka University Institutional Repository

†KwRwK শিরোনামে একটি জাপানি গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থের অধ্যায় ১৮০টি। জাপানি 'কোজিকি' শব্দের অর্থ হলো 'প্রাচীন বিষয়ের দলিল'। †KwRwK-†ত জাপান-সভ্যতার সৃষ্টি-রহস্য আঠারো শতকে অনূদিত হয় (Isao,1999: 69)।†KwRwK গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে পৃথিবীর সভ্যতাসমূহের সৃষ্টি-রহস্য আলোচিত হয়েছে। জাপানের অধ্যায়ে জাপানি সম্রাটদের সম্পর্কে বিশদ রয়েছে আলোচনা।

জাপান সূর্য দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য। সূর্যের আশীর্বাদে জাপানের সম্রাট বংশের উৎপত্তি। সূর্যকে জাপানের দেবী হিসেবে মনে করা হয়। সূর্যদেবীর আশীর্বাদ ধন্য ইজানাগি (Izanagi no Mikoto) এক দেবতা এবং ইজানাগি নামে এক দেবীর বংশধরেরা জাপান দ্বীপপুঞ্জের শাসনের দায়িত্ব লাভ করেন প্রাচীনকালে। †KwRwK গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে সূর্যদেবী তাঁর একজন পৌত্রকে জাপানের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পৌত্র কিউশু দ্বীপের অন্তর্গত তাকাচিকো নামক এক পর্বতে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে বসতি স্থাপনের সময় জাপানের সম্রাটের হাতে ছিল একখানা দর্পণ, একটি তলোয়ার ও এক ছড়া মাণিক্যের মালা। এ সকল দ্রব্য জাপান সম্রাটের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত । †KwRwK গ্রন্থে উল্লিখিত সূর্যদেবীর এক পৌত্রের প্রপৌত্রের নাম জিম্মু তেন্নো। জাপানের প্রাচীন কিংবদন্তি অনুযায়ী এই জিম্মু তেন্নোই ছিলেন জাপানের সর্বপ্রথম সম্রাট। ৬৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জিম্মু তেন্নো জাপানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কিয়োটোর দক্ষিণে অবস্থিত ইয়োখটো প্রদেশে(J. Hall 1978: 26-30)।

জিম্মু তেন্নো কর্তৃক জাপানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কথা প্রাচীন গ্রন্থ †KwRwK ও wbnb †kwK-তে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থ দু'টিকে এত ছোট একটি দেশের প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, দেশের মানুষ ও অন্যান্য দেশের কাছে জাপানের রাজ পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এ কাজ করা হয়েছে। অথবা জনসমক্ষে কিঞ্চিৎ ভীতি সঞ্চারের অভীপ্সায় এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে জাপানের রাজবংশের অলৌকিক উৎপত্তির উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, চীন ও রাশিয়াকে পরাজিত করে ক্ষুদ্র জাপান যে চরম শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, তাতে অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে জাপান সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল বলেই এ ধরনের প্রচার পরিচালনা করা হয়েছিল(J. Hall 1978: 26-30)।

জাপানিদের পূর্বপুরুষ

জাপানিদের পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক বিদ্যমান। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন 'ইয়ামতো' হচ্ছে জাপানিদের পূর্বপুরুষ। অন্য আরেক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে

Dhaka University Institutional Repository

'আইনু' হচ্ছে জাপানিদের পূর্বপুরুষ। জাপানি প্রাচীন কিংবদন্তি অনুযায়ী জাপানি সম্রাট জিম্মু তেন্নোর প্রপিতামহ স্বর্গ থেকে যখন তাকাচিহো পর্বতে অবতরণ করেন তখন জাপানে 'ইয়ামতো' জাতির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন জাপানে 'ইয়ামতো' জাতির অস্তিত্বই নেই। জাপানিদের পূর্বপুরুষ হিসেবে যাদের খুব সামান্য উপস্থিতি আছে তারা হলো 'আইনু'। এদের সামান্য সংখ্যককে হোক্কাইদোতে দেখা যায়। জাপানে 'কোরো-পক-গুরু' নামে আরেক দল আদিবাসী উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে 'কোরো-পক-গুরু' নামের এই আদিবাসীর নিশ্চিহ্ন (মন্মথনাথ, ১৩২২ : ৫)।

রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানের রাজনৈতিক জীবনধারা অগ্রসর হতে থাকে। জাপানি কিংবদন্তি অনুযায়ী জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু তেন্নো, জাপানের সর্বপ্রাচীন ধর্ম শিন্তো এবং শিন্তো ধর্ম মতে সম্রাট জিম্মু ছিলেন সূর্যদেবী আমাতেরাসু ওমিকামি-র বংশধর। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় জাপানের কৃষির উন্নয়নের কাল হিসেবে বিবেচিত। এসময় ধান থেকে চাল উৎপাদন ব্যাপক গতি লাভ করে। এই সময় ইয়াইয়োই যুগ নামে ঐতিহাসিকদের কাছে পরিচিত। ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসের অধ্যায়টি 'কফুন' যুগ বা 'প্রাচীন সমাধির' যুগ হিসেবে আখ্যায়িত। 'কফুন' যুগে জাপানের নারা এলাকায় ইয়ামাতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ইয়ামাতো ও কাওয়াচি একত্রিত হয়ে বর্ধিত আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় ইয়ামাতো রাষ্ট্র।

উপর্যুক্ত সময়ের মধ্যে ১৩ জন কাল্পনিক সম্রাট ইয়ামাতো সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, আবদুল্লাহ্ আল-মামুন ও এম. এম. আসাদুজ্জামান নুর প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে জাপানের এই ১৩ জন কাল্পনিক সম্রাটের নাম ও শাসনের সময় উল্লেখ করেছেন (নাজমুল, ২০১৩ : ১৪)।

এই সময়ের পর মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে কয়েকটি পর্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—

(১) ৫৩৮-৭১০ আসুকা পর্ব

(২) ৭১০-৭৯৪ নারা পর্ব

(৩) ৭৯৪-১১৮৫ হেইয়ান পর্ব।

*Dhaka University Institutional Repository*

এই সময়ের মধ্যে জাপানের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। আসুকা পর্বে ইয়ামাতো রাজ্যের প্রশাসনিক ও ও সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়। নারা পর্বে জাপান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় কোরিয়া ও চীনের সঙ্গে জাপান সরকারের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হয়। জাপানের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হেইয়ান পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জাপানের রাষ্ট্রীয় আদালত। ক্ষমতার দ্বন্দ্বও এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সময় জাপানের শাসনের ক্ষমতা বলয়ে চারটি শক্তিশালী গোত্র ছিল। এসব গোত্রের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার অলিন্দ থেকে ক্রমে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসা(মন্মথনাথ, ১৩২২ : ৪১)। হেইয়ান পর্বের চারটি শক্তিশালী গোত্র হলো— (১) ফুজিওয়ারা গোত্র (২) মিনামোতো গোত্র (৩) তাইরা গোত্র ও (৪) তাচিবানা গোত্র। গোত্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অসন্তোষের কারণে বিভিন্ন সময় কয়েকটি বিদ্রোহ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই চারটি শক্তিশালী গোত্রের মধ্যে ১১৫৬ থেকে ১১৫৮ সালের মধ্যে হোগেন বিদ্রোহ, ১১৬০ সালে হেইজি বিদ্রোহ এবং ১১৮০ থেকে ১১৮৫ সালের মধ্যে গেমপেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধের পরিণতিতে জাপান সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং ফলে ‘সামুরাই’ নামক এক যোদ্ধা শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে জাপানের সরকার ও রাজনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় (Michele, 1993: 127)।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানের রাজনৈতিক জীবনধারা অগ্রসর হয়। প্রথম সম্রাট জিম্মু তেন্নোর উত্তরাধিকারীদের রাজধানী কিয়োতার রাজপ্রাসাদে বন্দিপ্রায় অবস্থায় থাকাকালে রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই একনায়কতন্ত্রের নায়ক ছিলেন মিনামোতো জোরিটোমা, যিনি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে শোগুন উপাধিতে ভূষিত হন। তখন সম্রাট ছিলেন গো-তোবা। এভাবে প্রবর্তিত শোগুন-শাসনের স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৯২ থেকে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৬০৩ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা শোগুন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন তাঁরা তোকুগাওয়া বংশীয়। তোকুগাওয়া শোগুনদের শাসনকাল ছিল নানাদিক থেকে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই কালে বিশেষত ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, জাপান বর্হিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন-প্রায় অবস্থায় থাকে; দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সর্বোপরি, ১৮৫৩-৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কমোডোর পেরি এসে জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই পেরি মিশনের প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন জাপানের বিচ্ছিন্ন জীবনের অবসান ঘটায়, অন্যদিকে তেমনি শোগুন-শাসনের নাটকীয় পরিসমাপ্তি হয়। জাপানের সর্বশেষ শোগুন ছিলেন যোশিনোবু অথবা কেইকি। তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরের বছর জাপানি সম্রাট মুৎসুহিতো’র রাজধানী কিয়োতো থেকে এদো তে (বর্তমান টোকিও) স্থানান্তরিত হয়।

জাপানের ইতিহাসে শুরু হয় এক নবযুগ, প্রসিদ্ধ মেইজি যুগ। এই যুগের শুরু ১৮৬৮ সাল থেকে। সম্রাট মুৎসুহিতোর মৃত্যু হয় ১৮৬৮ সালে। তবে মেইজি যুগের অবসান হয় ১৯১২ সালে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪)

উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ায় কতিপয় বৃহৎ শক্তি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। রাশিয়া ও জাপানও এগুলোর মধ্যে ছিল। জাপান ও রাশিয়ার বিরোধের কারণ ছিল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার। সূচনালগ্নে আপোষ ও সমঝোতার প্রয়াস গ্রহণ করা হলেও ক্রমশ দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। রুশ-জাপান যুদ্ধ বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার বিষয়টি লক্ষ করা যায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত XvKv cKvk পত্রিকায় এ বিষয়ক ধারাবাহিক সংবাদ ও রচনা সমূহে (রুষ-জাপান, ১৯০৩: ১৭ এপ্রিল; ১২ জুন; ১০ জুলাই; ৭ আগষ্ট; ৪ সেপ্টেম্বর; ৯ অক্টোবর; ৭ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর; ১১ ডিসেম্বর; ১৮ ডিসেম্বর; ১৯০৫: ১ জানুয়ারি; ২৯ জানুয়ারি; ৫ মার্চ; ১৬ এপ্রিল; ১৪ মে; ৯ জুলাই; ২৭ জুলাই)।

রুশ-জপান যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন:

ভূমির জন্য করে নি কি

অনেক যুদ্ধ অনেক জাতি?

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর,

জাপান রুষের মাতামাতি;

অনেক শাঠ্য, অনেক দ্বন্দ্ব;

মোকদ্দমা ভারি ভারি;...

(দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯৯৬: ৬০২)

বিশ শতকের সূচনালগ্নে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও জাপানের পরস্পর বিরোধী আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দু'টি এলাকাতেই রাশিয়া জাপানকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে। এর ফলে লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার জাপানের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে

*Dhaka University Institutional Repository*

কনসেশনের দ্বন্দ্বে যুক্ত হয়ে রাশিয়া উক্ত উপদ্বীপ ও বন্দরের উপর ২৫ বছরের ইজারা লাভ করে। মাঞ্চুরিয়ার মধ্যদিয়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথটি ভলাডিভস্টক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিরাপত্তাজনিত কারণে রুশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। উত্তর চীনের উপর সামরিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বক্সার বিদ্রোহের সুযোগে রাশিয়া চীনের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৯০০ সালে সংঘটিত বক্সার বিদ্রোহের সময় জাপান ও পশ্চিমা শক্তিবর্গ তাদের সম্মিলিত সামরিক বাহিনী উত্তর চীনে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা X\/K\/ cK\/‡k চীন-জাপান যুদ্ধের ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (চীন-জাপান, ১৮৯৪, ৫ আগষ্ট)। চীনের কাছ থেকে আস্থা অর্জনের জন্য রাশিয়া বক্সার বিদ্রোহ দমনের পর বিদেশি সামরিক বাহিনীকে চীন ত্যাগের দাবি জানায়। যদিও তখনও মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার দখলে এবং রাশিয়া মনে করতো এটা চীনের অংশ নয়। সে কারণে মাঞ্চুরিয়াকে গণ্য করা হতো একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া বক্সার বিদ্রোহ অবসানের পর মাঞ্চুরিয়ার ওপর সামরিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা করে। একটি খসড়া চুক্তিপত্রও তৈরি হয়। রাশিয়া-চীন চুক্তির বিষয়ে অবগত হয়ে জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকা এটি বাতিলের জন্য চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে মারাত্মকভাবে অবনতি হয় রুশ-জাপান সর্ম্পকের।

১৯০২ সালে দূরপ্রাচ্যে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত হয় ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি। এই চুক্তি জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অধিক ক্ষমতাধর করে তোলে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় আঠারো মাসের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া থেকে সকল সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার শর্তে রাশিয়া ১৯০২ সালে মাঞ্চুরিয়া কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। কিন্তু পরে রাশিয়া এই কনভেনশনের শর্ত অমান্য করায় জাপান ক্ষুব্ধ হয়।

অন্যদিকে, চীন ও কোরিয়া নীতিকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি প্রস্তাব বিনিময় হলেও উভয়ের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এরূপ প্রেক্ষাপটে ১৯০৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি জাপান রাশিয়ার সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ৮ই ফেব্রুয়ারি পোর্ট আর্থারে রুশ সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে (তিনকড়ি, ১৩৪৯: ১৩৭)।

কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর জাপানের কাছে রাশিয়া পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় পোর্টসমাউথের সন্ধির মাধ্যমে

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী রাশিয়া জাপানকে আর্থার বন্দর ও দক্ষিণ সাখালিন হস্তান্তর করে এবং সমগ্র কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে জাপানের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। চুক্তির নিম্নোক্ত ধারাসমূহে এই যুদ্ধে জাপানের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষণ সুস্পষ্ট—

ARTICLE II.

The Imperial Russian Government, acknowledging that Japan possesses in Korea paramount political, military and economical interests engages neither to obstruct nor interfere with measures for guidance, protection and control which the Imperial Government of Japan may find necessary to take in Korea. It is understood that Russian subjects in Korea shall be treated in exactly the same manner as the subjects and citizens of other foreign Powers; that is to say, they shall be placed on the same footing as the subjects and citizens of the most favored nation. It is also agreed that, in order to avoid causes of misunderstanding, the two high contracting parties will abstain on the Russian-Korean frontier from taking any military measure which may menace the security of Russian or Korean territory.

ARTICLE III.

Japan and Russia mutually engage:

First.—To evacuate completely and simultaneously Manchuria, except the territory affected by the lease of the Liaotung Peninsula, in conformity with the provisions of the additional article I annexed to this treaty, and,

Second.—To restore entirely and completely to the exclusive administration of China all portions of Manchuria now in occupation, or under the control of the Japanese or Russian troops, with the exception of the territory above mentioned.

The Imperial Government of Russia declares that it has not in Manchuria any territorial advantages or preferential or exclusive concessions in the impairment of Chinese sovereignty, or inconsistent with the principle of equal opportunity.

*Dhaka University Institutional Repository*

ARTICLE IV.

Japan and Russia reciprocally engage not to obstruct any general measures common to all countries which China may take for the development of the commerce or industry of Manchuria (Calcutta Air, 1942).

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত জাপান ছিল কার্যত এক প্রকার অবরুদ্ধ দেশ। পর্তুগিজ ও জার্মানির কিছু লোক ব্যতীত আর কোনো বিদেশির উপস্থিতি জাপানে লক্ষ করা যেতো না। ১৮৫২ সালে আমেরিকার কমডোর পেরির আক্রমণের ফলে জাপান শেষ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয় (Matthew, 1856: 139)। কমডোর পেরির গ্রন্থ অবলম্বন করে ১৮৬৩ সালে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষায় রচনা করেন †Rcvb শীর্ষক গ্রন্থ। এটির মাধ্যমে বাঙালি সর্বপ্রথম জাপান সম্পর্কে অবগত হয়। ১৯০৩-১৯০৪ সালের রাশিয়া-জাপান যুদ্ধে জাপানের অমিতবিক্রমে বিশ্ববাসী চমৎকৃত হয় এবং বিভিন্ন কারণে জাপান পৃথিবীতে একটি সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী জাতি হিসেবে পরিচিত হয়। জাপানের এই জাগরণ ও উন্নয়ন নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশকিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জাপানের সঙ্গে গড়ে ওঠে বাংলা তথা ভারতের সখ্যতা। কিন্তু ১৯৩৯-১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বাংলার ওপর আক্রমণ করে। ফলে একদিকে বাংলার ক্ষতি সাধিত হয় ও অন্যদিকে বাংলায় জাপানের কিছু লোকক্ষয়ের ঘটনা ঘটে। এই সময় জাপানকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। এসব বোঝার জন্য সঙ্গত কারণেই তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতি, যুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রবাহিনী ও অক্ষ শক্তির পরিচয় এবং সমকালীন ভারতে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন (নরেন্দ্রনাথ: ১৯৪৪: ৮৭)।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এই বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তি ছিল জার্মানি, জাপান, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড। অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর মধ্যে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ডস, গ্রিস, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আলবামা, ডেনমার্ক, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ। ভারত ছিল ঔপনিবেশিক ইংল্যান্ডের শাসনাধীন একটি দেশ এবং এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড ভারতকে যোগদানে বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির ৬৫ লক্ষ ৮২ হাজার সামরিক ও ১৫ লক্ষ ৮৫ হাজার বেসামরিক অর্থাৎ মোট ৮২ লক্ষ ৬৮ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত সামরিক ও ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শত বেসামরিক অর্থাৎ ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭ শত মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সর্বমোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত প্রাণহানি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। ভারত এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগদান না করলেও তাদের ২৪ হাজার সামরিক ও ১৩ হাজার বেসামরিক নাগরিককে প্রাণ দিতে হয় (*The Oxford*, 2002)।

যুদ্ধ সম্পর্কিত নথিপত্র ‘অতি গোপন’ বিবেচনা করে সাধারণত সরকারি মহাফেজখানায় তা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হলেও ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতের সেনাবাহিনীর ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার ঐতিহাসিকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। এই কমিটির নাম ছিল ‘Inter-Services Historical Division of the Indian Defence Ministry’.এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মহাফেজখানায় বিশেষভাবে সংরক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত সকল দলিল দিল্লির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব দলিল পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মহাফেজখানায় ফেরৎ দেওয়া হয়নি (রতন লাল, ২০০৯ : ৪৫৮-৬২)।

তখন দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাদির ব্যাপক প্রচার জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে সাপ্তাহিক XvKv cKvk ও wm‡jU µwb‡Kj প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকার অবস্থা করুণ এবং বর্তমানে ব্যবহারযোগ্যও নয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের এসকল পত্রিকার সকল সংখ্যা পাওয়াও যায় না। তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো সেগুলো ব্যবহার করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। দৈনিক Avb›‘evRvi cwÎKvর একটি নিজস্ব সংগ্রহশালা ছিল। ১৯৯৯ সালে সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডে দৈনিক Avb›‘evRvi পত্রিকার সকল সংখ্যা ভস্মীভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সকল সংখ্যা ‘আলীপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরি’র তত্ত্বধানে এসপ্লানেডে ছিল। কিন্তু ঐ সকল পত্রিকা জীর্ণ বলে ‘আলীপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরি’তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই সকল পত্রিকা এখন ‘ডিজিটাল’ (স্ক্যান) করা হচ্ছে এবং এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না। ফলে ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত বিদেশ থেকে প্রচারিত পত্রিকা, সমকালীন বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্র ও সমকালীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্কাইভ্সের ও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির দলিলপত্র এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সূচিত হয়। এর আগে ১৯৩১ সালে জাপান চীন আক্রমণ করে চীনের অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দখল করে। ত্রিশের দশকে জাপানের আমদানি পণ্য দ্রব্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপান সমুদ্র ও পূর্ব চীন সমুদ্র পথে জাপানে আনা হতো। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরপর জাপান দক্ষিণ-পূর্ব

*Dhaka University Institutional Repository*

এশিয়ায় সামরিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৯৪০ সালে জাপান আনুষ্ঠানিভাবে 'অক্ষচুক্তি'তে স্বাক্ষর করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোচীনে সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। এসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিমারো কোনোই (১৮৯১-১৯৪৫) পদত্যাগ করলে তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল হিদেকি তোজো (১৮৮৪-১৯৪৮) নিজে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরবর্তীকালে জাপান আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত আমেরিকার নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান ফরাসি ইন্দোচীন থেকে থাইল্যান্ডে প্রবেশপূর্বক জাপান ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয় (Walter, 1950 : 383)।

সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষদিকে ভারতের রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ সংকট ছিল। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণির অসংখ্য মানুষের যোগদানের ফলে বামপন্থি ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক বিভাজন তীব্রতর হয়। এই বিষয় প্রকাশ্যে আসে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭- ?) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ও কংগ্রেস অন্য নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচনের জন্য অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থি ও আপোষকামী মনোভাবের বিরোধিতা করেই সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সভাপতি-পদে নির্বাচনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে ড. পট্টভী সিতারামিয়াকে দাঁড় করান। গান্ধী নিজে ড. পট্টভী সিতারামিয়াকে সমর্থন করেন। এই নির্বাচনে বামপন্থিদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ড. পট্টভী সিতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধী নিজের পরাজয় হিসেবে অভিহিত করেন এবং একই সঙ্গে কংগ্রেসকে 'ভূয়া সভ্যদের' এক 'দুষিত সংগঠন' হিসেবে আখ্যা দেন। গান্ধী এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, কংগ্রসের বিজয়ী নেতৃত্বের নীতি ও কর্মপন্থা কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বের সমর্থনযোগ্য না হলে তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করতে পারেন। এর ফলে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্য পদতাগ করেন। এমনকি জওহরলাল নেহেরুও একটি পৃথক বিবৃতি দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সংকট চরম সীমায় পৌঁছে (Sumit, 1959 : 371-73)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরাতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহুত হয়। এই সময় কংগ্রেসের ঐক্য ও জাতীয় আন্দোলন জোরদার করার জন্য শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোষহীন সংগ্রামের দাবি অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই অধিবেশনে গৃহীত একটি সাংগঠনিক প্রস্তাবের কারণে কংগ্রেসে ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রস্তাবটি ছিল—

> The Committee declares its firm adherence to the fundamental policies of the Congress which have governed its programme in the past years under the guidance of Mahatma Gandhi and is definitely of opinion that there should be no break in these policies and that they should continue to govern the Congress programme in future. The Committee express its confidence in the work of the Working Committee which functioned during the last year and deplores that any aspersions should have been cast against any of its members (B. Pattabhi, 1947: 110).

এই প্রস্তাব বহু ভোটাধিক্যে পাশ হয়। ফলে কংগ্রেস পরিচালনার সকল ক্ষমতা স্থায়ীভাবে গান্ধীর হস্তে ন্যস্ত হয়। ত্রিপুরা-কংগ্রেসের অধিবেশনের পর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রাজেন্দ্র প্রসাদকে (১৮৮৪-১৯৫৭) মনোনয়ন দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালেই সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ নামে নতুন একটি সংস্কারপন্থি দল গঠন করলেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য শক্তিশালী ও প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন ব্যতীত এরূপ কোনো কর্ম নিষিদ্ধ। সুভাসচন্দ্র বসু এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে গান্ধীর চাপে পরে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি সুভাষচন্দ্রকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তি দেয়। তাঁকে কংগ্রেসের সকল দায়িত্ব থেকে, বিশেষ করে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁর জন্য তিন বছর সকল প্রকার কার্যভার গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় সুভাসচন্দ্র বসু নিরবে নিজের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে মুম্বাইতে সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ‘বাম দৃঢ়ীকরণ কমিটি’ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আগস্ট থেকে d‡ivqvW© eøK নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র বসু এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখতেন নিয়মিতভাবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব ফরোয়ার্ড ব্লককে ভারতের জন্য অশুভ মনে করতেন। ফরোয়ার্ড ব্লক বাংলা-সহ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় দলে পরিণত হয় (Nandalal, 1962: 153-57; Vishwanath, 1960: 46-62)।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা পরে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনো প্রকার আলাপ আলোচনা ব্যতীত ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিনলিথগো ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জড়িত করা হয়। অত্যন্ত দ্রুত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'সংশোধিত ভারত-শাসন আইন' নামে একটি জরুরি আইন পাশ করে ভারতের সকল শাসনতান্ত্রিক অধিকার বাতিলপূর্বক সকল ক্ষমতা ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিনলিথগোর (১৮৮৭-১৯৫২) হাতে অর্পণ করা হয়। একটি নতুন 'ভারত রক্ষা অধ্যাদেশ' পাশ করে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা, যুদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য যে কোনো অধ্যাদেশ পাশ করার ক্ষমতা ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেলকে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু এরপর বহুবার কংগ্রেস নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী হিসেবে অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতবাসী তখন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে (Wedgwood, 19 39: 652-59)। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের এই যুদ্ধে কংগ্রেস ইংল্যান্ডের পক্ষে সহযোগিতা করতে অপারগ এবং ভারতের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতীয় দাবি। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের এই দাবি পূরণে কোনো প্রকার অঙ্গীকার করা থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রদত্ত 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন'-এর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি 'পরামর্শ সভা' গঠনের প্রস্তাব করে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন পরিবর্তনের সূচনা করে। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতের রাজনৈতিক দল ও জনমতের সমর্থন ব্যতীত একতরফাভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের যুদ্ধে ভারতকে যুক্ত করেন। ফলে একদিকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, অন্যদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশলও পরিবর্তিত হয়। কংগ্রেস ভাইসরয়ের কাছে এই যুদ্ধে ভারতকে সামিল করার উদ্দেশ্য জানতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই অক্টোবর লর্ড লিনলিথগো এক ঘোষণার মাধ্যমে জানান যে, যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি পরিষ্কারভাবে লর্ড লিনলিথগোকে জানায় যে যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের স্বাধীনতা দান এবং অনতিবিলম্বে কেন্দ্রে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করলেই ভারত যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করবে। লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে কংগ্রেস ২৯-৩০শে অক্টোবরের মধ্যে সকল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেয়। মুসলিম লীগ ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) এই দিনটিকে 'মুক্তি দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দলিত নেতা ড. ভিমরাও রামজি আম্বেদকার (১৮৯১-১৯৫৬) বিষয়টি সমর্থন করেন। কিন্তু বাংলায় তখন ছিল এ. কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। বাংলার প্রাদেশিক এই মন্ত্রিসভায় 'হিন্দু মহাসভার' নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭-১৯৫৩) ১৯৪১ সালে অর্থমন্ত্রী রূপে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, সমকালীন ভারতের রাজনীতি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের পক্ষে ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রত্যাশায় ১৯৪০ সালে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো নতুন কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। এসকল প্রস্তাবের মধ্যে পুরানো প্রস্তাবও যুক্ত ছিল। প্রস্তাবসমূহ ছিল—

ক. ভবিষ্যতে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দান

খ. যুদ্ধের বিষয়ে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন

গ. যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের সাংবিধানিক পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি গঠন

ঘ. ভাইসরয়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক ভারতীয়কে সেখানে অন্তর্ভুক্তকরণ।

লর্ড লিনলিথগোর এই সকল প্রস্তাবে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। পক্ষান্তরে ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা যুদ্ধকে প্রভাবিত করে। এসব ঘটনা হলো ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ মুসলিম লীগ কর্তৃক 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণ, ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের অভিযোগে ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেফতার ও কারাবাস এবং কারাগারের অভ্যন্তরে এই ঘটনার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বসুর অনশন ধর্মঘট; ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর অন্তরীণে মুক্তি এবং ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি গোপনে সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগ, ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান এবং ১৯৪২ সালে ভারতে আগত ক্রিপস মিশন, এই বছরের ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও পরে 'আইন অমান্য আন্দোলন' এবং সর্বোপরি ১৯৪২ সালের আন্দোলনে কংগ্রেসের বহুসংখ্যক নেতার গ্রেফতার বরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে পরপর সংঘটিত এই ঘটনাসমূহের গভীর প্রভাব ছিল। এ সকল ঘটনার তাৎপর্য আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ নামে যে বিষবৃক্ষের বীজ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রোপন করেছিল, তা-ই ক্রমশ শাখা ও পল্লবে বিকশিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল হিসেবে 'লাহোর প্রস্তাব' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম পর্যায়ের 'রাষ্ট্রগুলো' (states)রাতারাতি 'রাষ্ট্র' (state) হয়ে যায়। একটু হঠাৎ হলেও তা ব্রিটিশ সরকারের 'বিভেদ ও শাসন' পদ্ধতিকে সাহায্য করে। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেফতার অজুহাত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বসু অক্ষশক্তিকে সমর্থন করেন। এটা জেনেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। কারাগারে অনশন ধর্মঘট এক প্রকার অশনি সংকেত মনে করে তাঁকে নিজ গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। কিন্তু সবার অগোচরে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি গোপনে দেশত্যাগ করলেন (শ্যামাপ্রসাদ, ১৩৫৩ঃ ১১২)। সামগ্রিক কার্যকলাপ পরে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে বেশ সফলতা অর্জন করে এবং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হংকং, বোর্নিও, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা, রেঙ্গুন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের করতলগত হয়। এই সময় ভারতের বিশাখাপত্তম ও কোকোনদে জাপানের বোমা বর্ষিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের পক্ষে ভারতের সমর্থন অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তখনো ভারতীয় কংগ্রেস তাদের পূর্বের দাবিতে অবিচল। পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য ১৯৪২ সালে ২৩শে মার্চ ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি মিশন ভারতে আসে। ক্রিপস্ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত দু'টি। প্রথমত, ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আহুত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবসান ঘটানো। মনে করা হয় যে মহাত্মা গান্ধী আহুত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, বিশ্বযুদ্ধে জাপানিদের হাতে সিঙ্গাপুর (১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২), রেঙ্গুন (৮ই মার্চ, ১৯৪২), ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পতন (২৩শে মার্চ, ১৯৪২) ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভিত্তিকে প্রশ্নের সামনে ফেলে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, যুদ্ধে ভারতীয়দের সমর্থন পেতে হলে তাঁদের স্বার্থে কিছু গঠনমূলক কাজ করতে হবে। ক্রিপস্ আনীত প্রস্তাবে যত দ্রুত সম্ভব ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারত চাইলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে বেড়িয়ে যেতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্পাদিত চুক্তি পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়। কিন্তু ব্যাপক দ্ব্যর্থবোধকতা ও ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়। মহাত্মা গান্ধীও এই মিশন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। বরং তিনি ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট

Dhaka University Institutional Repository

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আহ্বান জানান। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

ভারত ছাড়ো আন্দোলন কেবল জনগণের আবেগজাত এবং কংগ্রেসের পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিশের দশক থেকে ভারতের রাজনীতিতে যে উগ্র আন্দোলন সংঘটনের ঘটনা ঘটে—তার পরিণতিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এক গণ-অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং ক্রমশ শহর থেকে গ্রামে সম্প্রসারিত হয়। প্রথমে ছিল ধর্মঘট, বয়কট ও পিকেটিং; পরে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রামী কার্যকলাপ ও সবশেষে বিভিন্ন স্থানে 'জাতীয় সরকার' গঠিত হয়। এই আন্দোলন দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাথিঁতে এই আন্দোলন ছিল অনেক শক্তিশালী। বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে কয়েকটি সহযোগী সংগঠনও গড়ে ওঠে। এর মধ্যে 'গেরিলা বাহিনী', 'স্বরাজ পঞ্চায়েত', স্বেচ্ছাসেবীদের 'বিদ্যুৎ বাহিনী', মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের 'ভগিনী সেনা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ‌‌‌॥ecøe৷ নামে একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রথমে বহুসংখ্যক ভারতীয় নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে, পরে চলে বাধ্যতামূলক গণ-জরিমানা, পুলিশের অকথ্য অত্যাচার ও নারী ধর্ষণ এবং পুলিশের গুলি পর্যন্ত চলে। মেদিনীপুরের 'গান্ধীবুড়ী' হিসেবে পরিচিত মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ইংরেজ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

এই আন্দোলন প্রায় সর্বভারতীয় রপ পরিগ্রহ করলেও কোনো কোনো দল ও দলের নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের বিরোধিতাও করেন। রাজা গোপালাচারী (১৮৭৯-১৯৫৯?), দলিত নেতা ড. ভিমরাও রামজি আমবেদকর, বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬), হিন্দু মহাসভার বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে (১৮৭২-১৯৪৮) প্রকারান্তরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এদিকে সমাজবাদী, কেরালার কমিউনিস্ট পার্টি, মহারাষ্ট্রের শক্তিশালী দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও মুসলিম লীগ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেনি। অন্যদিকে ভারতে ব্রিটিশ সরকার একটি কংগ্রেস-বিরোধী দলের সমর্থন পেতে বিশেষভাবে উন্মুখ ছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৪ সাল থেকে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নয়। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ব্রিটিশ সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

নীতিকে সমর্থন জানায়। গান্ধী-সহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থি নেতৃত্ব এই উগ্র গণ-আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করে।

এ-অবস্থায় বাংলার তৎকালীন রাজনীতি আলোচনার দাবি রাখে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার অর্থমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের দুরাবস্থা এবং ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিদ্যমান তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটানোর জন্য ১৯৪২ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বাট, ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো, বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের কাছে প্রেরিত তাঁর চিঠি, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৩ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কিত বিবৃতি, ক্রিপস্ মিশন প্রস্তাবের অন্তসারশূন্যতা, জাতীয় দেশরক্ষা, আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের অবস্থা, সেখানে পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও পাইকারি জরিমানা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে *A Phase of the Indian Struggle*শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ivó-msMv‡gi GK Aa¨vq শিরোনামে এটির অনুবাদ প্রকাশ করেন (রতন লাল, ১৯৯৭; উত্তমচাঁদ, ১৩৫৩)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় ভারতীয় জনগণের উপর, বিশেষ করে মেদিনীপুরে নারী ধর্ষণ, পুলিশের গুলিতে গান্ধীবুড়ী মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু ও পুলিশের পৈচাশিক আক্রমণের প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে ১৯৪২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন।

## সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান

অতি সতর্ক প্রহরার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি এলগিন রোডে অবস্থিত নিজ বাসগৃহ থেকে সংগোপনে ও সুকৌশলে অন্তর্ধানে যেতে সমর্থ হন (নগেন্দ্রনাথ, ১৩৪৯ : ২১৮)।সুভাষচন্দ্র বসু সর্বপ্রথম কাবুল পৌঁছান এবং সেখান থেকে ইতালীয় পাসপোর্ট নিয়ে রশিয়ার মধ্যদিয়ে জার্মানির বার্লিনে যান। বার্লিনে তিনি যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট সদস্য পল যোশেফ গোয়েবলস্ (১৮৯৭-১৯৪৫) ও জার্মানির সামরিক নায়ক এডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫)-এর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জার্মানির কাছ থেকে সদর্থক ও প্রত্যাশিত কোনো সাহায্য পাননি। তাঁকে কেবল 'আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র' চালু করার অনুমতি এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানি কর্তৃক ধৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যে। জার্মানিতে অবস্থানরত ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত করে। এই সময় পর্যন্ত তিনি অক্ষশক্তির কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো আশ্বাস পাননি। কিন্তু ১৯৪৩ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারি জার্মান সেনাবাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

স্ট্যালিনগ্রাডে রাশিয়ার কাছে পরাজিত হলে জার্মানি থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। অন্যদিকে জাপান ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক নীতি গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে জাপানিদের বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধির ক্ষেত্র বিষয়ক একটি পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনায় ভারতের কোনো স্থান ছিল না। তবে এই পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের প্রতি জাপানের আশ্বাস ছিল। ১৯৪০ সালে জাপান ভারতকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে মেজর ফুজিওয়ারাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রেরণ করে, যেখানে প্রীতম সিংহের মতো কিছু সংগ্রামী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে মালয়ে জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাদলের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক তরুণ সদস্য ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানি মেজর ফুজিওয়ারার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হন। এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে একটি ভারতীয় সৈন্যদল গঠন করে জাপানিদের সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করে ভারতকে
মুক্ত করা।

জাপানি সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রসঙ্গ

ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিষ্পিষ্ট। ফলে তাঁদের নিজবলে স্বাধীনতা অর্জন প্রায় অসম্ভব। এই সময় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাপানিদের সাহায্য কিঞ্চিত আশার সৃষ্টি করলেও তাদের মনে সন্দেহ ছিল। প্রথমেই জাপানের 'কোরিয়া নীতি' ভারতীয়দের মনে বড় প্রশ্নের উদ্রেক করে।

> কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্য একদিন জাপানের বড় মাথা ব্যথা হয়েছিল। আজ যেমন ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানের মাথা ব্যথা হয়েছে। জাপান অবিরতই প্রচার করছে যে, তারা স্বাধীনতা আমাদের দেবে। ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসী ছাড়া অন্য কেউই এনে দেবে এমন কল্পনা করাও পাপ, কারণ স্বাধীনতা দেবার জিনিস নয় - অর্জন করবার জিনিস। ভারতবাসীরা জানে তারা নিজেরাই স্বাধীনতা অর্জন করবে, এজন্য কারুর কোন অভিভাবকত্বের প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করে না (তিনকড়ি, ১৩৪৯ : ৬০৭)।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাপানি সাহায্যের ইঙ্গিত পেলেও ভারতবাসী তাদের সাহায্যের এই ইঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। তাঁদের মনে হয়েছিল যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে জাপানি শাসন শুরু হতে পারে। এই পরিপ্রক্ষিতে ভারতবাসীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নমনীয় মনোভাব প্রকাশ ছিল একান্ত অপরিহার্য। ভারতে জাপানি আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহত করার জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন কার্যাবলির প্রতি ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। এ প্রসঙ্গে f\iZel সাময়িকপত্রে মন্তব্য করা হয়—

> জাপানের কাছে ভারতের গুরুত্ব বর্তমানে অধিক। ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষই এখন মিত্রশক্তির প্রধান ঘাঁটি। ব্রহ্মে অভিযান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতেই করিতে হইবে। চীনের যুদ্ধের সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে ভারতবর্ষের উপর। মিত্রশক্তির সাহায্য ভারত দিয়া চুংকিং-এ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, ভারতের পূর্ব সীমান্ত হইতে বিমান পথে সম্ভব মতো রণসম্ভার সরবরাহ করা হইতেছে। আর্থিক দিক দিয়া বিচার করিলেও জাপানের কাছে ভারতের মূল্য যথেষ্ট। জার্মানির সহিত সংযোগ রাখিতে হইলে একদিকে যেমন ভারত মহাসাগর দিয়া জলপথে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব, অপর পক্ষে তেমনই স্থলপথে ভারত দিয়া সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা চলিতে পারে। ভারতের বর্তমান রাজনীতিক আন্দোলনও জাপানের অনুকূলে দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস তথা সর্বভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া ভারত সরকার যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর অনভিপ্রেত। ভারতের জনসাধারণ চায় ভারতে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং অক্ষশক্তির সম্ভাব্য অভিযানে বাধা প্রদান। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই বিক্ষোভ দমন করিবার যে পদ্ধতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের অবস্থা আরও খারাপই দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চম বাহিনী এই আন্দোলনকে আপন স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ সাহায্যে ও সরবরাহে বাধা প্রদান করিয়া অক্ষশক্তির আসন্ন আক্রমণের সম্মুখে সংগঠনহীন আন্দোলনকারীরা ভারতকে আরও অপ্রস্তুত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আন্দোলনকারীদিগকে এই প্রশ্ন—আড়াই মাস যাবৎ আন্দোলন চালাইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথে তাহারা ভারতবর্ষকে কতখানি আগাইয়া দিয়াছে? ভারত সরকারকে আমরা শুধাই, এই আন্দোলন দমনের যে মুষ্টিযোগ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে অক্ষশক্তির আসন্ন আক্রমণে সাফল্যজনক বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কতখানি? জাতীয় সরকার গঠনের জন্য এবং অক্ষশক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব ভারতীয় প্রতিরোধ প্রদানের জন্য প্রয়োজন—জাতীয় ঐক্য। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও চীনের বিভিন্ন রাজনীতিকরা ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতের সহিত একটি সন্তোষজনক বোঝাপড়া করিতে উপদেশ দিতেছেন। ভারতের জনসাধারণ আজ জাপ আক্রমণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত জাপ অভিযানকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধে ইচ্ছুক (সুশীলকুমার, ১৯৪২ : ৪)।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অক্ষশক্তি হিসেবে জাপানকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয় এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজোর 'কুকুর' হিসেবেও অভিহিত করে। এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার বসু লিখেছেন—

> এইভাবে যখন সংশয় ও সন্দেহে সমগ্র দেশ সমাচ্ছন্ন, তখন কম্যুনিস্টরাই প্রথম ফ্যাসিবিরোধী নীতির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিলেন। দেশের রাজনীতিক মহলে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। লোকের মুখে মুখে প্রশ্ন শেষ পর্য্যন্ত কি ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে দেশের ছোট বড় অন্যান্য রাজনীতিক দলগুলি কোন না কোন আকারে এই ফ্যাশিবিরোধী নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। যদিও একমাত্র কম্যুনিস্টরাই নিরলসভাবে দেশময় জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সভা ও সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এই নূতন ভাবধারা ছড়াইতেছেন (সাপ্তাহিক †'k, ১৯৪২)।

১৯৪২ সালে সাপ্তাহিক †'k পত্রিকায় জাপানের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রচার চলে। এক পৃষ্ঠা জুড়ে একটি বিজ্ঞাপনে লেখা হয়—

> আপনি কি জাপানী কথা ছড়ান? অনেকেই তা' করে। তা'রা মিথ্যা গুজবগুলো রটিয়ে বেড়ায় এবং তা' থেকে সৃষ্টি হয় অশান্তি আর ঘোর দুর্দশা, স্টক মার্কেটে আতঙ্ক আর বিষম ক্ষতি। এই সব গুজবের উৎপত্তি জাপানে। এ'সবে কান দেবেন না। এ'সব রটিয়ে বেড়াবেন না। গুজব বিশ্বাস করবেন না—জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন। ১৯৪২ সালে সাপ্তাহিক †'k পত্রিকায় অন্য একটি বিজ্ঞাপনে লেখা হয়—

> তোমরা কি সংক্রমণ ছড়াচ্ছ? দেশে একটি অতি ভয়ানক ব্যাধি আছে, যা নাকি মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে এবং তাহার সাহস হরণ করে। এই ব্যাধি হচ্ছে 'গুজব'। ইহা সর্ব্বসাধারণের শত্রু জাপানীদের থেকে ছড়াতে আরম্ভ করে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের ইহাদ্বারা সংক্রামিত হ'তে দিও না। গুজব বিশ্বাস করো না—জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের সমর শক্তি গ'ড়ে তোল (রতন লাল, ১৯৯৬ : ২৫-৪২)।

বার্মায় জাপানি আক্রমণ ও ভারতীয়দের বার্মা ত্যাগ

১৭৮৫ সালে প্রথমে আরাকানের সঙ্গে ও পরে বার্মার সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের যে সম্পর্কের সূচনা হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৮৫ সালে তৃতীয় এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের মাধ্যমে। ফলে বার্মা ব্রিটিশের একটি

*Dhaka University Institutional Repository*

উপনিবেশে পরিণত হয়। ভৌগোলিকভাবে নৈকট্যের কারণে বার্মায় বাঙালি ও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটে উনিশ শতকের আটের দশক থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত (Nalini, 1971: 61)। নোয়াখালির দক্ষ কৃষকের পরিশ্রম ও মাদ্রাজের ‘চেটিয়ার’দের (মহাজন) অর্থে বার্মায় চাল উৎপাদনে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। বার্মায় বাঙালি ও ভারতীয়দের বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকতে দেখা যায় (নরেন্দ্রনাথ, ১৩৪৭: ৩৭)। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এক যুগেরও বেশি সময় রেঙ্গুনে এ্যাকাউটেন্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করেছিলেন এবং স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার ১৯১৬ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। বার্মায় তিনি প্রচুর বাঙালি ও ভারতীয়ের সমাবেশ লক্ষ করেন (Moshe, 1972: 25)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে বার্মায় বাঙালি ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্মীদের বিদ্বেষ লক্ষ করা যায়। ‘আমরা বর্মি’ তথা ‘দোবামা আসিওনে’ নামে একটি বর্মি জাতীয়তাবাদী চরমপন্থি দল বাঙালি ও ভারতীয়দের বার্মা থেকে বিতাড়নের জন্য বার্মায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূচনা করে। বৌদ্ধ ধর্ম এবং এই ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধের উপর রচিত অবমাননামূলক গ্রন্থের অভিযোগ প্রথম ওঠে বার্মায় অবস্থানরত মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ফলে বার্মায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং অচিরেই তা বর্মি ও ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বার্মা থেকে বাঙালি ও ভারতীয়দের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হয় (নরেন্দ্রনাথ, ১৯৪৪ : ১০২)। বার্মায় জাপানের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে বাঙালি ও ভারতীয়দের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের হার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।

জাপানিদের বার্মা আক্রমণের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যসমূহ হলো—(ক) বর্মা-চীন সড়ক বন্ধ করে চীনে রসদ ও সকল প্রকার সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ করা; (খ) বার্মা জাপানিদের দখলে এনে সেখান থেকে ভারত আক্রমণ ও (গ) বার্মায় জাপানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে জাপানিদের নৌঘাঁটি স্থাপন (নরেন্দ্রনাথ, ১৯৪৪ : ১০৩-১০৭)। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বেশ কয়কবার বার্মায় জাপানি যুদ্ধবিমান থেকে বোমা ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করা হয়। এসময় বার্মায় কর্মরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আলেকজান্ডার সেখানে ‘পোড়ামাটি নীতি’ অনুসরণ করে বার্মার ডক, গুদাম, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইনে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করেন। এমন কি সিরিয়ামের বিরাট তেল শোধনাগারটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তবে সময়ের অভাবে বার্মার সকল বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত চীনের সেনাবাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে বার্মায় জাপানিদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি, ফলে তারা বার্মা ত্যাগ করে (নরেন্দ্রনাথ, ১৯৪৪ : ১০৩-১০৭)।

*Dhaka University Institutional Repository*

বার্মায় জাপানিদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা ছিল মারাত্মক ও ফল ছিল ভয়াবহ। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী Zvi tevgvi f‡q evµ¨ Z¨vM শীর্ষক গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। ফরিদপুরের সন্তান মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী রাজশাহী কলেজ থেকে বিএ পাশ করে বার্মায় ডাক বিভাগের কাজে যোগদান করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জাপানি বোমার তীব্র আঘাতে বার্মার রেঙ্গুন-সহ বেশ কয়েকটি শহর মারাত্মকভাবে ধ্বংস ও আংশিক বিধ্বস্ত হয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। বার্মায় তখন বর্মি জনগণ ব্যতীত বহুসংখ্যক বাঙালি ও ভারতীয় চাকুরিজীবী, চৈনিক বণিক ও ইউরোপীয় সেনাবাহিনী বসবাস করতো। চীনা ও ইউরোপীয় সেনাবাহিনী ইতিপূর্বেই বার্মা ত্যাগ করায় দুর্ভোগের বেশি শিকার হয় বার্মায় অবস্থানরত ভারতবাসী। তারা ট্রেনে, স্টিমারে, মোটরে, নৌকায়, পদব্রজে, দুর্গম পথে, পার্বত্য পথে, ঢালু পথে, গরুর গাড়িতে, ডুলিতে, বাসে, লঞ্চে, গয়নার নৌকায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। জাপানি বোমার আঘাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এতসংখ্যক ভারতবাসীর দ্রুত বার্মা থেকে ভারতে অভিবাসনের প্রচেষ্টায় এক নিদারুণ করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ট্রেন যাত্রীদের দুরাবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তাঁর গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—

> লোকগুলি ট্রেনের উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বহুলোক হ্যান্ডেল ধরিয়া বাদুরের মত ঝুলিতেছে, কেহ কেহ ছাদের উপরে যাইয়াও উঠিয়া বসিয়াছে। টিকেট দেয়ই বা কে, আর কেনেই বা কে? হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া নোংরা কুলী-শ্রেণির লোক ফার্ষ্ট ক্লাশে দাঁড়াইয়া-বসিয়া ঠাসাঠাসি, আর প্যান্টপরা বাবু-সাহেবরা থার্ড ক্লাশের পায়খানার জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া মুখ বাড়াইয়া আছেন। কয়লা-বোঝাই খোলা মালগাড়ির উপরও বহু লোক লুটোপুটি খাইতেছে—কয়লার রঙে তাহাদের দেখাইতেছে সার্কাসের ক্লাউনের মত। একটা কাঁটা-তারের বাণ্ডিল-বোঝাই ওয়াগন্—উহাতেও যাইয়া লোক ঢুকিয়াছে। একটু নড়াচড়ি করিলেই কাঁটা-তারের খোঁচা খাইতে হয়। লোকগুলির মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এইরূপ খোঁচা তাহার বুঝি অনবরতই খাইতেছে—কিন্তু তবু যাইতেই হইবে! আতঙ্কের কালো ছায়া সকলের মুখে। কতক্ষণ হইতে এই অসহ্য রৌদ্রের মধ্যে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, কে জানে? লোক আর কোথায় যে উঠিবে, বুঝিতে পারিলাম না। 'জল,' 'জল' বলিয়া চিৎকার শুনা যাইতেছে; কিন্তু স্থান-ত্যাগের উপায় নাই; যাহারা পারিতেছে, জানালা দিয়া হাত বাড়াইতেছে। জল দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু সে কেবল মরুভূমিতে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টির মত (মনোরঞ্জন, ১৯৪২ : ১০)।

মানসী মুখোপাধ্যায় ১৯৪১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বার্মা থেকে রওয়ানা দিয়ে ২৮ দিন পর ভারতে পৌঁছেন। তিনি গাড়ি, ট্রেন, লঞ্চ, গরুর গাড়ি, ডুলি ও দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়ে পদব্রজে পরিবার-

Dhaka University Institutional Repository

সহ মণিপুর, ইম্ফল, আসাম, কোহিমা হয়ে বাংলায় পৌঁছুতে সক্ষম হন (মানসী, ১৩৫৭: ৯৩)। কোনো জীবনীগ্রন্থে মানসী মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ নেই। মানসী মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। মানসী মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সাহিত্যিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিলাল রায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এ সময় তাঁকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে মালয়েশিয়া যেতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের মধ্যে জাপান মালয়েশিয়া দখল করে নিলে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে পশ্চাদপসরণ করে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ১৯৪৩ সালের শেষেরদিকে শান্তিলাল রায় আবার আরাকান যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন চিকিৎসক ও জনপ্রিয় রহস্যকাহিনিকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬)। তিনিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সেনাছাউনিতে কর্তব্যরত একজন চিকিৎসক হিসেবে শান্তিলাল রায় একদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন আরাকানের লোয়াংদু ও মোয়াংদ্য এলাকায় অসীম সাহসী জাপানি সৈন্যদের দুর্দান্ত ও বিধ্বংসী আক্রমণ এবং অন্যদিকে প্রাণভয়ে ভীত ও পলায়নপর বাঙালি ও ভারতীয়দের অবস্থা। শান্তিলাল রায় তাঁর এই বিরল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করেছেন ১৯৪৫ সালে AviKvbd‡›Uশীর্ষক গ্রন্থে—যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন তাঁরই সহযোগী চিকিৎসক ও জনপ্রিয় রহস্যকাহিনিকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত (শান্তিলাল, ১৩৫২: ১৮৩)।

বার্মায় জাপানি আক্রমণের তীব্রতা ও ভয়াবহতা এতই মারাত্মক ছিল যে এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ বার্মা থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় (মেজর, ১৯৪৭: ৮১)। কিন্তু পশ্চাদপসরণের পূর্বে সেখানে অবস্থানরত ১০ হাজার মুসলমান নিয়ে সশস্ত্র ‘বার্মা বিজয়ী বাহিনী’ (Burma Victory Force)গঠন করে এদেরকে জাপানি সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের কাজে নিয়োগ করে। বার্মায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ বার্মা বিজয়ী বাহিনী এই সুযোগে বৌদ্ধ বর্মী পুরোহিত ও ধৃত জাপানিদের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়।

> But the antipathy between the Buddhist and Muslims took its ugliest twist when the communities lined up on opposing sides during the British retreat from Burma. In 1941, realising they had abandoned the Arakan mountains too hastily, the British recruited 10,000 Muslims, called the Burma Victory Force, to hold the Mye River Valley - the strategic corridor linking the Arakan and the Bengal detla - and thus delay the Japanese advance. The majority of the Arakanese Buddhists lined up with the Japanese, and the result was one of the bloodiest communal riots in South Asian annals. (*Far Eastern,* 1978: 31).

*Dhaka University Institutional Repository*

কলকাতায় জাপানি আক্রমণের ভীতি ও সমকালীন পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা কলকাতার বিভিন্ন স্তরের জনগণের মনে মারাত্মক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। বার্মায় জাপানিদের বোমারু বিমানের আক্রমণ এবং সেখানে অবস্থানরত বাঙালি কলকাতায় পালিয়ে আসার দুর্দশার বিবরণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা কলকাতার সাধারণ বাঙালির মনে প্রচণ্ড ভয়ের উদ্রেক করে।

> বর্তমান যুদ্ধ সঙ্কটে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার ফলে একটি গুরুতর সমস্যার আসল রূপটী আমাদের সামনে অনেকটা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। সে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে গত শীতের আরম্ভে এবং প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে। ফলে নিতান্ত দায়ে পড়ে বহু সহরবাসী গ্রামে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিসমৃতপ্রায় পল্লীগ্রামের হতশ্রী পল্লীভবনের কথা স্মরণ করে অনেকে আবার গ্রামে না গিয়ে কলকাতার সুখ ও সুবিধা পাওয়া যায় এমন সব ছোটখাট মফঃস্বলের সহরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। আর একদল কলকাতার কাছাকাছি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে খ্যাত যে সব জায়গা, সেইখানে গিয়ে আস্তানা নিলেন। সহরের ভাড়াবাড়িগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল; পথের দুধারে বাড়িগুলির দরজা জানলা প্রায় বন্ধ। আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে সাহস পেয়ে চাঁদের আলো সহরের পথের উপর ছিট্‌কে এসে পড়ল। সহর দেখতে দেখতে রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীতে পরিণত হয়ে উঠল। তারপর! আলোক নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধের কোনো পরিবর্ত্তন হল না; পারিপার্শ্বিক অবস্থারও উন্নতি হ'ল না; কিন্তু তবুও যাঁরা সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বা স্ত্রী পুত্রকে সহরের বাইরে রেখে এসেছিলেন তাঁরা আবার ধীরে ধীরে সহরে ফিরে আসছেন ও স্ত্রীপুত্রকে সহরে ফিরিয়ে আনছেন। যে বিপদ আগে ছিল অনিশ্চয়তার দূরত্বের ব্যবধানে, সে বিপদ এখন অদূরত্বের নিশ্চয়তায় এগিয়ে এসেছে জেনেও? (ভূপতি, ১৩৪৯ : ৬০৯)।

যুদ্ধের কারণে অন্নের সঙ্গে বস্ত্র সমস্যাও ভীষণভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধের জন্য বিলাত থেকে কাপড় আমদানি প্রায় বন্ধ, অন্যদিকে জাপান এতদিন এদেশে যে প্রচুর কাপড় পাঠাত তা-ও আর তখন সম্ভব ছিল না। জাপানি বোমা থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেক লোক কলকাতা শহর পরিত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলেও বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

> বোমার ভয়ে কলিকাতার লোক যখন দলে দলে বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে ফিরিয়া যায়, তখন পল্লীগ্রামের বাড়িওয়ালা অত্যধিক ভাড়ায় বাড়ি ভাড়া দিতে আরম্ভ করেন। মফঃস্বলে যে বাড়ির ভাড়া ৫ টাকাও হয় না, সে বাড়ি লোক মাসিক ৫০ টাকায় ভাড়া লইতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্নমেন্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এক আইনও কিন্তু অদ্ভুত। বাড়ি ভাড়া লইয়া ভাড়া সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইলে, তবে এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। এখনও এরূপ মামলার কথা শুনা যায় নাই (বস্ত্র সমস্যা, ১৩৪৯ : ৯৫)।

বেতার ও পত্র-পত্রিকায় খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় নগরবাসী এই যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য মজুত করার ফলে মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কলকাতা শহরকে 'নিষপ্রদীপ এলাকা' ঘোষণা করে শহরবাসীকে এ বিষয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাড়িতে কাঁচের জানালাসমূহ কালো কাগজে আবৃত করা এবং রাতে গৃহের জানালা বন্ধ করা আবশ্যিক হয়ে যায়। শহরবাসীর মধ্যে মুদ্রিত 'প্রচারপত্র' বিতরণ করে নিজ নিজ বাসার কাছে পরিখা খনন এবং সম্ভাব্য বোমা আক্রমণের সংকেত ধ্বনি বা 'সাইরেন' বাজানোর শব্দ পেলেই পরিখার মধ্যে অথবা সিঁড়ির নিচে আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বঞ্চনানীতি শুরু হল। জাপানিদের আতঙ্কে তাড়াহুড়া করে গভর্নর নিজের দায়িত্বে নৌকা গাড়ি সাইকেল ইত্যাদি সরিয়ে ফেললেন। কয়েকটি জেলা থেকে চাল সরাবারও হুকুম হল। জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত। সরকারের পেয়ারের ব্যাপারিরা খুশি মতো চাল কিনবার ভার পেয়ে দু-হাতে রোজগার করতে লাগল। চোরাবাজার ফেঁপে উঠল দেখতে দেখতে' (পল্লীগ্রামে, ১৩৪৯ : ৯৮)।

১৯৪৩ সালে সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) 'কলিকাতার চিঠি' (১৯৪৩) শীর্ষক কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার নগর জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। এই কবিতার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতার পরিস্থিতি, শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা ও দুরাবস্থার করুণ চিত্র ধরা পড়ে। সামরিক প্রয়োজনে যান-বাহনের অনেকটা সরকার অধিগ্রহণ করে, ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নগরবাসী দুর্দশার মধ্যে পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিলে সরকার 'রেশন ব্যবস্থা' চালু করে। রেশন গ্রহণে প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায়। শহরতলীর 'ঘাঁটালের' মালিকেরা জাপানি বোমা থেকে বাঁচতে গরু-মোষ গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যায়। ফলে কলকাতা শহরে দুধের অভাব দেখা দেয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য 'সান্ধ্য আইন' জারি করার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়াবহ অসুবিধা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রথম কাজ হলো

Dhaka University Institutional Repository

শবদেহ দাহ বা সৎকার করা। কিন্তু কোনো কারণে বিকেল, সন্ধ্যা বা রাতের বেলা শহরে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে ‘সান্ধ্য আইন’ অনুযায়ী রাতের বেলা শবদেহ দাহ বা সৎকার করা যাবে না। অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘বাসীমড়া’ কাম্য বা সুখকর নয়। এই কবিতায় বলা হয়েছে—

শশ্মানে এখন চুলি জ্বালা শুনি নিষেধ হয়েছে রাতে,

‘বাসিমড়া’ হয়ে পড়ে থাকা ভায়া, সয় কি হিঁদুর ধাতে?

বেলা চারটেয় মরি যদি তবে ভোর চারটের আগে

কেউ মুখে হায় দেবেনা আগুন—এ এক ভাবনা জাগে।

ঘাটের খরচও কর্পোরেশন বাড়িয়েছে সম্প্রতি

দেড়া মাশুলের কমে নাকি আর হবে না মরণে গতি (শ্যামাপ্রসাদ, ১৩৫৩: ৯৮)।

কলকাতায় জাপানি আক্রমণ

রেঙ্গুনে জাপানি আক্রমণের পর সরকার ও জনগণের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে কলকাতায়ও জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল। ১৯১১ সাল পর্যন্ত ভারতের রাজধানী থাকায় কলকাতার আশেপাশে অনেক শিল্প গড়ে ওঠে। জাপানিদের কলম্বো ও মাদ্রাজ আক্রমণের সময় কলকাতা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। কিন্তু রেঙ্গুন আক্রমণের পর ভারত সরকার ও মিত্রবাহিনী কলকাতা সম্পর্কে সতর্ক হয়। বিমান আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। তখন কলকাতার ২০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বহু বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এসব প্রতিষ্ঠান জাপানের বিমান আক্রমণের লক্ষবস্তু হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিরক্ষাকল্পে রাশিয়ার অনুকরণে অনুকল্প গড়ে তোলা হয়, যেখানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আদলে তৈরি কৃত্রিম ভবনগুলো হবে জাপানিদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা (নরেন্দ্র, ১৩৪৯ : ২১১-১২)।

সেই সময়ে রচিত একটি গ্রন্থে কলকাতায় জাপানি আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত নরেন্দ্র নাথ সিংহ কর্তৃক লিখিত AvaibK Rvcvb I eËgvb h× শিরোনামের এই গ্রন্থে কলকাতায় জাপানি আক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়। নরেন্দ্র নাথ সিংহ লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখ রবিবার রাত্রি ১০টা ১৭ মিনিটের সময় কলিকাতা সহরে গ্রাসধ্বনি (বিমান আক্রমণ সঙ্কেত ধ্বনি) হ'ল। কলিকাতাবাসীরা গ্রাসধ্বনি শুনবামাত্রই ঘরের আলো নিবিয়ে দিল, পাছে শত্রুবিমানের লক্ষ্য স্থির করতে সুবিধা হয়। রাজপথে ট্রাম, বাস, গাড়ি ও লোক জন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে কলকোলাহলময় কলিকাতা সহর নিঃশব্দ ও নিষপ্রদীপ হ'য়ে গেল। বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনির কিছুকাল পরেই কলিকাতা পরিমণ্ডলে জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল। সেদিনকার বোমার ঘায়ে ক্ষতি যা' হ'ল সে অতি অল্পই। সামান্য কয়েকজন বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হ'ল। সামরিক ক্ষতি কিছুই হ'ল না (নরেন্দ্র, ১৩৪৪ : ১৪২)।

এই ঘটনার পর দু'দিন কলকাতায় জাপানি বোমার আক্রমণ হয়নি। তবে জনমনে জাপানি আক্রমণের ভয় ও আতঙ্ক এতটাই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে প্রাণ রক্ষার জন্য কলকাতা শহর ত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কলকাতাবাসীর অনুমান একেবারে মিথ্যা ছিল না। ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর কলকাতায় আবার জাপানি বোমার আক্রমণ হলো। ২২শে ডিসেম্বর আক্রমণ হয় মধ্যরাতে। জাপানি বিমান আকাশের অনেক উপর দিয়ে কলকাতায় উপর বিমান আক্রমণ চালায়।

> However, this may be, the Japanese evidently had sufficient respect for them to come at night and flying high. This has disadvantages as well as advantages. They are likely to hit what they are aiming for, but may hit what are very certainly not military objectives (Calcutta, 1942: 4).

তবে এই দু'দিনের জাপানি আক্রমণে কলকাতায় হতাহতের সংখ্যা ছিল কম। সরকারিভাবে জানানো হয় যে, দু'দিনের জাপানি আক্রমণে ২৫ জন বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়েছিল। ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় জাপানি বিমানের আক্রমণ না হলেও আক্রমণ চালিয়েছিল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ফেনীতে। তবে মাত্র একদিন পরে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতের প্রথম প্রহরে জাপানি বিমান আবার কলকাতায় হানা দেয়।

> সে রাত্রে জাপ বিমানগুলি দু' ঝাঁকে বিভক্ত হ'য়ে কলিকাতা সহরের উপর এসেছিল। দ্বিতীয় ঝাঁকে আসে প্রথম ঝাঁকের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। যে অঞ্চলে সে রাত্রে বোমা পড়ে, সেই অঞ্চলে অট্টালিকা প্রভৃতির কিছু ক্ষতি হয় এবং লোকজনও কিছু হতাহত হয়। কলিকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

> পরিমণ্ডলে প্রথম দু'দিন বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই কলিকাতা বাসীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'য়েছিল। তখন থেকেই অনেক লোক সহর থেকে পালাতে সুরু করে। কিন্তু ২৪ ডিসেম্বরের বোমা নিক্ষেপের পর থেকে পলায়নের পালা খুব বেশী বেড়ে যায় এবং এর পর ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর আর কোনো বোমা পড়ল না (The Statesman, 1942: 480)।

আবার ২৭শে ডিসেম্বর জাপানি বোমারু বিমান কলকাতায় আক্রমণ চালায়। ডিসেম্বরের বাকি দিনগুলোয় কলকাতায় কোনো জাপানি আক্রমণ হয়নি। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে আবার জাপানি বোমারু বিমান কলকাতায় মাঝে-মধ্যে আক্রমণ চালায়। এরপর প্রায় ১১ মাস কলকাতার আকাশে জাপানি বোমারু বিমান দেখা যায়নি।

> এরপর প্রায় ১১ মাস পরে ১৯৪৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতার খিদিরপুর ডক অঞ্চলে দিনের বেলা সকাল ১১টার পর জাপানীরা বোমা ফেলে। জাপানীদের এ আক্রমণ অতর্কিতেই হ'য়েছিল। রবিবার বিশ্রাম ও আনন্দ করবার দিন। জাপানীরা সুযোগ বুঝেই আক্রমণ চালিয়েছিল। ফলে এই দিনের ক্ষতির পরিমাণ আগেকার আক্রমণসমূহের ক্ষতির তুলনায় খুবই বেশি হ'য়েছিল। লোকজনের হতাহতের সংখ্যা সরকারি ইস্তাহার অনুযায়ী—প্রায় পাঁচ শ'। প্রায় ১১ মাস জাপ বিমানের কোনরূপ আগমন না দেখে সরকারি ও বেসরকারি অনেকের মনেই ধারণা জন্মেছিল যে, জাপানীরা বোধ হয় আর বিমান আক্রমণের ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সীমাহীন অনন্ত আকাশে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ সকল সময়েই যে সম্ভব সে কথাত না বললেও চলে—বিশেষ ক'রে শত্রুর বিমান ঘাঁটি যেখানে এত নিকটে। জাপানীদের সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী স্থল বিমান ঘাঁটি আকিয়াবে। আকাশপথে সোজাসুজি কলিকাতা থেকে আকিয়াব মোটে ৩৪০ মাইল। সুতরাং বঙ্গোপসাগরে বিমানবাহী জাহাজ নিয়ে না আসতে পারলেও জাপানীরা যখন ইচ্ছা তখনই যে কলিকাতা বিমান আক্রমণ চালাতে পারে, ৫ই ডিসেম্বরের বিমান আক্রমণে সে কথা প্রমাণিত হয়ে গেল (নরেন্দ্র, ১৯৪৪ : ১২৫)।

এরপর আর কলকাতায় জাপানি বিমানের আক্রমণ ঘটেনি। তখন বিশ্বের অন্যত্র যুদ্ধ পরিচালনায় জাপানিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে জাপানি বিমানের আক্রমণ

চট্টগ্রাম শহরাঞ্চলে জাপানি বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় সেখানে সপরিবার বসবাস সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বিপজ্জনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের সদর দপ্তর কুমিল্লায় ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দপ্তর ঢাকায় স্থানান্তরিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হয়। সকল মূল্যবান সরকারি দলিলপত্র ময়মনসিংহ শহরে সরিয়ে নেয়া হয়। এই সময় ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত মিত্রবাহিনীর সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ ঘটে চট্টগ্রাম শহরে। বারংবার জাপানি যুদ্ধবিমানের আক্রমণ, রাতে নিষ্প্রদীপ মহড়া, বার্মা থেকে যুদ্ধভয়ে আগত উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি চট্টগ্রামের নাগরিক জীবনধারায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসে। অবশ্য যুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের কিছু লোক সামরিক ঠিকাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে। ১৯৪২ সালের ১৩ই মে সকালে বার্মার আকিয়াব বিমান বন্দর থেকে চট্টগ্রামে জাপানি বিমান কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী জাপানি বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তবে জাপানি বিমান অতর্কিতে হামলা করে বার্মা-চীন সড়ক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে (নরেন্দ্র, ১৯৪৪ : ১২৬)।

১৯৪২ সালের ১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জাপানি সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো চট্টগ্রামে হামলা চালায়। ইতিপূর্বে তারা ৭ই ডিসেম্বর শনিবার চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। জাপানি সেনাবাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মিত্রবাহিনীর শক্তি নিরুপণ করা। ১২ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী বিমান-বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে কম পক্ষে তিনটি জাপানি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, জাপানি যুদ্ধ বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার ৯০% ধান ক্ষেতে পড়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। তবে যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ছিল জাপানি সেনাবাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে কলিকাতা (Troops, 1942 : 4)।

১৯৪২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর দুটি জাপানি বোমারু বিমান চট্টগ্রাম অঞ্চলে আক্রমণ চালালেও তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তবে টোকিওর রেডিওর সুত্র থেকে নিউইয়র্ক জানায় যে, জাপানি বোমার আঘাতে চট্টগ্রাম বন্দরে মিত্রবাহিনীর সাতটি জাহাজ ডুবে যায় এবং পাঁচটিতে আগুন লেগে যায় (Japanese Raid, 1942: 6)। এই দিন রাতে আবার জাপানি বোমারু বিমান চট্টগ্রাম অঞ্চলে বোমা আক্রমণ চালায়। তবে কোনো বোমা শহরের মধ্যে পড়েনি (New Raids, 1942: 1)। যুদ্ধের সংবাদদাতা এইচ. এ. স্টান্ডিস জানান যে ১৯৪২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বার্মায় জাপানিদের যে অবস্থান তা অনেকটা সুরক্ষিত। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর জাপানি বোমারু বিমান চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ফেনীতে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছু ক্ষতি করেছিল। ২০শে ডিসেম্বর ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্রিটিশ সেনবাহিনী লেফট্যানেন্ট-জেনারেল আরউইনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কক্সবাজারের উপকূল থেকে রওয়ানা করে বার্মার মোয়াংদ্য ও বুথিডিয়াং অঞ্চল নিজদের দখলে নিয়ে আকিয়াবে ইতিপূর্বে দখলকৃত জাপানি বিমান ঘাঁটির ৬০ মাইল দূরে অবস্থান নেয়। এখানে মিত্রবাহিনী জাপানিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ২১শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ সেনবাহিনী কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের মধ্যে এমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল যাতে জাপানিদের অবস্থান চট্টগ্রামের মধ্যেই

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোনোভাবেই বঙ্গোপসাগরে জাপানি অধিকার প্রতিষ্ঠা না হয়(Japanese Bomb, 1942: 1)। এরপর প্রায় চার মাস বার্মায় মিত্রবাহিনীর এবং চট্টগ্রামে জাপানিদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২০ ও ২২শে মে জাপানি বিমান চট্টগ্রামে আবার হামলা চালায়। এসময় ব্রিটিশ যুদ্ধ বিমান জাপানি বোমারু বিমানকে তাড়া করলে উভয় পক্ষের লক্ষ্যণীয় ক্ষতি হয় (British Force, 1942: 5)। এসময় জাপানি বোমারু বিমানের আঘাতে কোনো সামরিক ক্ষতি না হলেও কয়েকজন চট্টগ্রামবাসী প্রাণ হারান। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটা অংশ ট্রাক ও লরিতে চেপে ভারতের মূল ভূখণ্ড অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ২২শে মে আবার ২০টি জাপানি বোমারু বিমান ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপর প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে। মিত্রবাহিনীর তৎপরতায় ৩টি জাপানি বোমারু বিমান ক্ষতিগ্রস্থ হলেও জাপানি সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দর 'পতেঙ্গা' দখলে আনতে সমর্থ হয়। এর ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের মধ্যে এমন প্রতিবন্ধকতার কাজ ত্যাগ করে পুনরায় ভারতের মূল ভূখণ্ড অভিমুখে যাত্রা শুরু করে (Chittagong Evacuated, 1943: 5)।১৯৪৩ সালের ২৯ ও ৩০শে মে জাপানি বোমারু বিমান আবার চট্টগ্রামে হামলা চালায়। এসময় মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় একটি জাপানি বিমানে আগুন ধরে যায়। তবে বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে (Axis Says, 1943: 1)। কৌতুক ও নাট্য-অভিনেতা চিন্ময় রায়ের পৈতৃক বাড়ি ছিল বাংলাদেশের কুমিল্লায়। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাঁদের কুমিল্লার বাড়ি সামরিক প্রয়োজনে দখলে নেয়। ফলে তারা কলকাতায় চলে আসেন। তখন মাঝে-মধ্যে 'সাইরেন' বাজতো এবং 'সাইরেন' বাজলে সকলেই আশ্রয় নিতেন বাড়ির সিঁড়ির নিচে (চন্দন, ২০১৫: ৬)।

## বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে জাপানি যুদ্ধ বিমানের জরুরি অবতরণ

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বরিশাল জেলার (বর্তমানে পটুয়াখালী জেলা) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কাছের লতাচাপলী ইউনিয়নের চর ধুলেশ্বরের ধানক্ষেতে ১৯৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর একটি জাপানি যুদ্ধ বিমান রাত ৯টায় জরুরি অবতরণ করে। লতাচাপলী ইউনিয়নের দফাদার সেরাজুল হক জানান যে, বিমানটি অবতরণ করে মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়। বিমানের ৭ জন বৈমানিকের দেহাবয়ব বেঁটে, নাক চ্যাপ্টা। তাঁরা বাংলা বা ইংরেজি কথা বলেনি বলে মনে হয় এরা ভারতীয় ও ইউরোপীয় নয় বরং জাপানি। বাংলাদেশে তখন জাপানি যুদ্ধ বিমানের দৌরাত্ম্য ছিল। তাঁরা নৌকা যোগে পালিয়ে যেতে চায়। এই ঘটনার ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। জাপানি বৈমানিকেরা ইঙ্গিতে 'খাদ্য' ও 'পানীয়' প্রার্থনা করলে দয়ার্দ্র গ্রামবাসী তাদের 'ভাত' ও

Dhaka University Institutional Repository

'পানীয়' সরবরাহ করে। লতাচাপলীর গ্রামবাসী গ্রামের 'দফাদার' ও 'চৌকিদার'-এর সাহায্যে তাদের গোপালবাবুর কাচারিতে নিয়ে যেতে চাইলে তারা ধান ক্ষেতের কাছে থাকা নৌকাযোগে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই সময় লতাচাপলী এলাকায় জমির অধিকার নিয়ে শান্তিভঙ্গের উপক্রম হওয়ায় সেখানে ৪ জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। ঘটনা অবহিত হয়ে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। এরা জাপানি বৈমানিকদের আটক করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করে ৫ জন নৌকাযোগে ধলেশ্বর নদীর অপর প্রান্তে রওয়ানা করে, অবশিষ্ঠ ২ জন ধলেশ্বর নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং সাঁতার কেটে ধলেশ্বর নদীর অপর প্রান্তে চলে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ তাঁদের লক্ষ করে গুলি চালায়। অন্যদিকে জাপানি বৈমানিকদ্বয় পুলিশের প্রতি 'মেশিনগান' বা 'অটোমেটিক রাইফেল' দিয়ে গুলির উত্তর দেয়। এই ঘটনায় কেহই আহত হয়নি। লতাচাপলীর তহশিল অফিসের প্রধান করণিক আর. বি. বনিক পটুয়াখালী মহকুমা অফিসারকে জানান যে ৭ জন জাপানি বৈমানিক ধলেশ্বরের চরে অবস্থান করছে (Letter, 1942)। এই ঘটনা বরিশালের জেলা প্রশাসক অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জি. পি. ম্যানোয়াককে ও রাজকীয় বিমান বাহিনীকে দু'টি তারবার্তার মাধ্যমে জানান। বরিশালের জেলা প্রশাসক পরদিন পুলিশ বাহিনী ও পটুয়াখালীর মহকুমা প্রশাসককে নিয়ে লতাচাপলীতে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে জাপানি বৈমানিকদের গ্রেফতার করা। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে তিনটি জাপানি যুদ্ধ বিমান লতাচাপলীর আকাশে চক্কর দিচ্ছিলো এবং একটি বিমান গুলিবিদ্ধ হয়ে লতাচাপলীতে জরুরি অবতরণ করে। গ্রামবাসী রাতে অবতরণকারী জাপানি বৈমানিকদের 'ডাকাত' মনে করে। তারা প্রথমে ধানক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। জাপানি বৈমানিকেরা বেলা ৩.৩০ মিনিটে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে জানায় যে তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং খাদ্য ও পানীয় চায়। দয়ার্দ্র গ্রামবাসী তাদের 'ভাত' ও 'পানীয়' সরবরাহ করে। এরপর উপস্থিত পুলিশ বাহিনী তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে তাঁরা ধানক্ষেতের পাশে থাকা পালতোলা নৌকাযোগে আরাকানের দিকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গ্রামবাসীর মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করলেও জাপানিদের পক্ষে বা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো মনোভাব লক্ষ করা যায়নি (Secret Letter, 1942)।

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সম্পর্ক আছে। বলা হয়ে থাকে যে পঞ্চাশ সনের বা ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ 'মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ' (Man-made Famine)। এই দুর্ভিক্ষের কারণে ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ১৯৪৩ সালে সংঘটিত বাংলার দুর্ভিক্ষের যে কারণ দেখিয়েছে, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন সে ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছেন। অমর্ত্য সেন তাঁর 'বিনিময় অধিকারদান' (exchange entitlement) সম্পর্কিত মতবাদে দেখিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সালে বাংলায় তেমন বড় কোনো খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল না। এই দুর্ভিক্ষের কারণ জনগণের একটি বড় অংশকে বিনিময় অধিকারদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ছিল(Amartya, 1982: 75-78)। এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

১৯৪১ সালে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলে সরকার প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে দু'মাসের খাদ্য মজুত রাখতে নির্দেশ প্রদান করে। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে জাপানিদের কাছে বার্মার পতনের পর সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ভারতের যে সকল প্রদেশ বার্মার চাল আমদানির ওপর নির্ভর করত, সেখানে বাংলা থেকে চাল রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২০, ২২ ও ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতায় জাপানি বিমানের আক্রমণের ফলে একদিকে বেশকিছু খাদ্যশষ্যের দোকান বন্ধ করে দিতে হয়, অন্যদিকে বাংলার সরকার ব্যাপক পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান চালু করতে বাধ্য হয়। এরই সমষ্টিগত কারণে খাদ্যশস্য মজুত থাকলেও বাংলার জনগণের বড় একটা অংশ খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর AvRv'wn‡›'i A¼i গ্রন্থে ১৯৪৩ সালে সংঘটিত বাংলার দুর্ভিক্ষের তথ্য মানুষের কাছে শুনে লিখেছেন—

> কলিকাতা সহরের পথে পথে লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিত, সময়ে সৎকার হইত না, পথচারিকে শব ডিঙ্গাইয়া পথ চলিতে হইত, প্রত্যেকটি খবর আমরা পাইতাম। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে চাষী উৎসন্ন যাইতেছে, তাঁতী তাঁত ফেলিয়া, জেলে জাল ফেলিয়া, নাইয়া নৌকা ফেলিয়া পেটের জ্বালায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ভিক্ষান্নের আশায় কাতারে কাতারে সহরের পথে অস্থি কঙ্কালের শোভাযাত্রা করিয়া চলিতেছে, আমাদের নিকট কোন খবরই অজ্ঞাত থাকিত না (বিজয়চন্দ্র, ১৩৫২: ৭৯)।

## সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

১৯৪২ সালের জুন মাসে এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণপন্থিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'ভারতীয় ইনডিপেনডেন্ট লীগ' গঠিত হয়। এটি বেসামরিক রাজনৈতিক সংগঠন হলেও সেনাবাহিনীর উপর এর নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই সংগঠন পরিচালনার জন্য জাপানে বসবাসকারী বিপ্লবী বাঙালি রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫)-কে অভিজ্ঞ বিবেচনা করা নিয়ে আসা হয়। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বা আজাদ হিন্দ ফৌজ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে জাপানি কর্তৃপক্ষের কোনো সদর্থক মনোভাব তখনো ছিল না। শেষপর্যন্ত জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো 'ডায়েটে' (জাপানের পার্লামেন্ট) এক ঘোষণার মাধ্যমে ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রয়াসকে সমর্থন করেন। তবে জাপানি নেতৃত্ব কোনোভাবেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে তাদের সহযোগী বাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননি। তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের একটি উপবাহিনী হিসেবে গণ্য করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সক্রিয় সমর্থক মোহন সিং এই বাহিনীকে জাপানের সহযোগী বাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য জাপানিদের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে জাপানি নেতৃত্ব মোহন সিংকে আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে সরিয়ে দিয়ে কারারুদ্ধ করেন। এই পরিস্থিতিতে রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু যৌবনে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিপ্লবী হলেও ৫৭ বছর বয়স্ক রাসবিহারী বসুর পক্ষে এই বাহিনীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে শক্তিশালীভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সুযোগ্য নেতৃত্বের।

এই পরিস্থিতিতে জাপানি নেতৃবৃন্দ আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন। তাঁরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সেখান থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে এশিয়ায় নিয়ে আসার প্রয়াস গ্রহণ করেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৩ সালের মে মাসে 'সাবমেরিন' তথা 'ডুবো জাহাজে' সুদীর্ঘ ও বিঘ্নশঙ্কুল জলপথ অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র বসু এশিয়ায় আসতে সমর্থ হন। জাপানের সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ সক্রিয়ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রবাসে ভারতবর্ষের 'অস্থায়ী সরকার' গঠন করেন। জাপান, জার্মানি ও ইতালি-সহ আটটি দেশ ভারতবর্ষের এই 'অস্থায়ী সরকার'কে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য নিয়ে গঠিত হয় 'আজাদ ব্রিগেড', 'নেহেরু ব্রিগেড', 'গান্ধী ব্রিগেড', 'সুভাষ ব্রিগেড' ও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রবাদপ্রতিম ঝাঁসীর রানির নামে নারীবাহিনী 'ঝাঁন্সী ব্রিগেড' (শান্তিলাল, ১৩৫২ : ৩০)।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানি বাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত বার্মার মধ্যদিয়ে প্রথমে মণিপুরের ইম্ফলে ও পরে আসামে প্রবেশ করাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান লক্ষ্য (Stephen, 1963-64: 411-29)। আশা করা হয়েছিল আসামের ভারতীয়রা 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর হবে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের ৮ই মার্চ জাপানি সৈন্যবাহিনী ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' ইম্ফল অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে অভিশপ্ত পরিণতি ডেকে আনে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ প্রতিরোধ ও অন্য অনেক কারণে জাপানি সৈন্যবাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপত্তি, অপর্যাপ্ত বিমান শক্তি, সঠিক নির্দেশদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি এবং মিত্রশক্তির মারাত্মক আক্রমণ শক্তি ছিল উল্লেখযোগ্য। পশ্চাদপসারণ হয় মারাত্মক ক্ষতিকর। যাহোক, আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটে গিয়ে বার্মায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বার্মার পোপায় সে প্রতিরোধ মিত্রশক্তির

Dhaka University Institutional Repository

মারাত্মক আক্রমণে পরাভূত হয় (শাহ্‌নওয়াজ, ১৯৪৬ : ৩৮৩-৪০০)। ফলে সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ মুক্ত করার স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত করার কিছুই ছিল না। জাপানি যুদ্ধ-কর্তৃপক্ষ নেতাজিকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল, যেখান থেকে তিনি রাশিয়ায় আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু যাত্রাপথে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইওয়ানের তাইহাকু বিমান বন্দরে এক দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে কথিত আছে, যদিও ভারতবাসী তা বিশ্বাস করে না।

শেষপর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই বাহিনীর ২০ হাজার সদস্যকে আত্মসমর্পণের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানি সৈন্যবাহিনীর ‘অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল’, তাদেরকে ‘সাদা’ ও ‘পাংশু’ শ্রেণিভুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয় বা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসন করা হয়। কিন্তু যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের ‘কালো’ তালিকাভূক্ত করে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের বিচার

‘দেশদ্রোহিতার’ অভিযোগে সব মিলিয়ে দশটি বিচার হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ বিচারটি ছিল দিল্লির লালকেল্লায়—যেখানে ভারতীয় বাহিনীর ১০ম বেলুচি রেজিমেন্টের অফিসার ক্যাপ্টেন পি. কে. সেহগাল, পাঞ্জাব রেজিমেন্টের গুরুবক্স সিং ধিলন ও ১১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার শাহ্ নেওয়াজ খানকে দেশদ্রোহিতা, হত্যা ও হত্যায় সহযোগিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল তথাকথিত বিচারের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর প্রেসের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ জনসমক্ষে ধীর ধীরে প্রকাশিত হয়। এর ফলে এই ফৌজের যে সকল অফিসার ‘দেশদ্রোহিতার’ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা জনগণের কাছে দেশপ্রেমিক হিসেবে গণ্য হন এবং এই বিচার বন্ধের দাবি ক্রমশ গণদাবিতে পরিণত হয়। ফলে কংগ্রেস, আকালি দল, সোশালিস্ট, ইউনিয়নিস্ট পার্টি, জাস্টিস পার্টি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, হিন্দু মহাসভা এমনকি মুসলিম লীগও এই প্রহসনমূলক বিচারের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন সেনা-অফিসার তিন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান—যা সহজেই এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে এই বিচারের বিরুদ্ধে গণ-ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়তা করে। কংগ্রেস কর্তৃক আসামিদের পক্ষসমর্থনকারী যে কমিটি গঠিত হয় সেখানে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুনোয়ার স্যার দিলীপ সিংহ, ভুলাভাই দেশাই, মি. আসফ আলী, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, পাটনা হাইকোর্টের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্তন বিচারপতি মি. পি. কে. সেন এবং রঘুনন্দন শরণ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ২২ বছর পর ব্যারিস্টারের পোষাক পরিধান করেন। ভারতীয় বাহিনীর ৭ জন অফিসার নিয়ে সামরিক আদালত গঠিত হয় এবং এই ৭ জনের মধ্যে ৪ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন ছিলেন ভারতীয়। ইউরোপীয় অফিসাররা হলেন মেজর জেনারেল এ. বি. রাক্সল্যান্ড, ব্রিগেডিয়ার এ. জি. এইচ. ক্লার্ক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সি. আর. স্কট ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল টি. আই. স্টিভেনসন। অন্যদিকে ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাসির আলী খান, মেজর বি. প্রীতম সিং এবং মেজর বনোয়ারীলাল।

১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লায় যখন এই বিচার শুরুর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেদিন থেকে এক সপ্তাহ আজাদ হিন্দ ফৌজ সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। আর এই দিল্লির লালকেল্লার জনগণ ভিন্নভাবে দেখে, কেননা এখানেই ১৮৫৮ সালে শেষ মুঘল সম্রাটের বিচার হয়েছিল। জনগণ আজাদ হিন্দ ফৌজ তহবিলে অর্থ দান করে ও সমস্ত ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান এই বিচারের প্রতিবাদে বন্ধ রাখা হয়। বিক্ষোভ ক্রমশ ঘনীভূত হয়। ৭ই নভেম্বর মাদুরাইয়ে এক প্রতিবাদ সভায় পুলিশ জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করলে কলকাতার আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির উপর জনতার আক্রমণ ও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এটি ব্রিটিশ-বিরোধী দাঙ্গায় পরিণত হয়। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং সেখানে ট্যাক্সি, ট্রামচালক ও শ্রমিক যোগদান করে। বিক্ষোভকারীরা একসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উত্তোলন করে। ব্রিটিশ বিরোধী দাঙ্গা কলকাতা থেকে মুম্বাই, করাচি, পাটনা, এলাহাবাদ, বারানসী ও রাওয়ালপিণ্ডি তথা সারা ভারতে সম্প্রসারিত হয়। এই সকল ঘটনায় ৩৩ জন ভারতীয় নিহত ও ২০০ আহত হয়। ফলে পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। শেষপর্যন্ত অভিযুক্ত সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁরা বীর ও দেশপ্রেমিকের সম্মান পান। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার পর্ব থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্ব শুরু হয় (নৃপেন্দ্রনাথ, ১৩৫২: ৭৩)।

## জাপানি সেনাবাহিনীর সমাধিস্থান

১৯৫০-এর দশকে বাংলাদেশে জাপানি সেনাবাহিনীর কবরস্থান নিয়ে জাপান সরকার আগ্রহ দেখায়। ১৯৫৬ সালের ৬ই মার্চ ঢাকায় অবস্থানরত জাপানি কনসাল চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত জাপানি সৈনিকদের সমাধিস্থানের অবস্থান, সমাধিফলক এবং সমাধিস্থান সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের নাম জানতে চান। একই সঙ্গে ঢাকায় অবস্থানরত জাপানি কনসাল জানান যে, জাপানি সৈনিকদের সমাধিফলকের কোনো ছবি প্রেরণ

*Dhaka University Institutional Repository*

করতে পারলে তা নিহত সৈনিকদের পরিবারের সান্তনার জন্য প্রেরিত হবে (Letter, 1956)। এই চিঠির উত্তরে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পূর্ব বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানান যে জাপানি কনসালের চিঠিতে জিজ্ঞাসিত তথ্য প্রেরণের পূর্বে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। যথাযথভাবে সরকারি অনুমতি পেয়ে ১৯মে জাপানি কনসালকে জানানো হয়—

১. সকল সমাধি সুরক্ষিত এবং মর্মরের উপর নিহত সৈনিকদের নাম রয়েছে;

২. কুমিল্লার ময়নামতীতে ৬০০ বর্গমিটার জুড়ে রয়েছে যুদ্ধ-সমাধি ক্ষেত্র, যেখানে ২৪ জন জাপানি সৈনিকের মরদেহ সমাহিত। তবে এখানে সৈনিকদের কোনো নাম বা পরিচয়ের উল্লেখ নেই;

৩. রাজকীয় যুদ্ধ সমাধি কমিশন এই সমাধি ক্ষেত্র সুরক্ষা করে;

৪. সুযোগ্য চিত্রগ্রাহকের অভাবে এই সমাধিতে রক্ষিত মর্মর-ফলকের কোনো ছবি প্রেরণ করা সম্ভব হলো না (Letter, 1956)।

১৯৫৬ সালের ১৯শে জুন চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর লাল মিঞা চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে জানান যে কোতোয়ালি থানার দামপাড়া এলাকায় অবস্থিত যুদ্ধ-সমাধি ক্ষেত্রে ১৯ জন জাপানি সৈনিকের সমাধি রয়েছে। তবে এখানে ১৮ জন জাপানি সৈনিকের নাম এলুমিনিয়াম প্লেটে লিখিত ও সমাধি সংরক্ষণের তারিখ রয়েছে। ১ জন সৈনিকের নাম পাওয়া যায়নি। এই সমাধি-ক্ষেত্র সুরক্ষিত এবং মি. জে. ই. উডম্যান এই সমাধি ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক। পরে আর এক পত্রে চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান যে, জাপানি সৈনিকের নাম সম্বলিত এলুমিনিয়াম প্লেটগুলো কালো বর্ডার দিয়ে কাঠের বোর্ডের উপর রক্ষিত। চট্টগ্রামে অবস্থিত এই যুদ্ধ-সমাধি ক্ষেত্রের পূর্বদিকে রয়েছে পামশালা রোড। প্রায় ৩ একর জমির উপর এই যুদ্ধ-সমাধি ক্ষেত্র অবস্থিত। এটি এখন নয়াদিল্লির রাজকীয় যুদ্ধ-সমাধি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই যুদ্ধ-সমাধি ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন তত্ত্বাবধায়ক মি. জে. ই. উডম্যান, ৪ জন মালী ও ১ জন ঘাস কাটার মেশিন ড্রাইভার। সমাধি-ফলকসমূহের ছবি তৈরি করা হয়েছে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তা প্রেরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, তখন জাপানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট থাকার কারণে অতি দ্রুত নিহত জাপানি সৈনিকদের সমাধি-ফলকের ছবি ঢাকায় অবস্থানরত জাপানি কনসালকে প্রেরণ করা হয় (Letter, 1956)।

চট্টগ্রামে সংরক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের সমাধি-ফলকের ছবি ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের নাম ও পুনঃসমাধিকরণের সময় সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ—

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ও চট্টগ্রামের রাজকীয় সমাধিতে উল্লিখিত জাপানি সৈনিকদের নাম ও পুনঃসমাধিকরণের সময়[৯]

| নাম | পুনঃসমাধিকরণের সময় |
|---|---|
| সার্জেন্ট | |
| সিনাকা | ১২. ৭. ১৯৪৫ |
| ল্যান্স কর্পোরাল | |
| নাকাগামিন আসাখি | ২৭. ৭. ১৯৪৫ |
| ইমামাতো ইয়াসো | ২৮. ৭. ১৯৪৫ |
| প্রাইভেট | |
| আয়োনা | ১১. ৫. ১৯৪৫ |
| আজামজুমাসাদুরা | ৭. ৫. ১৯৪৫ |
| হামাদা | ২৭. ৪. ১৯৪৫ |
| হোসেমিকোজি | ১৬. ১১. ১৯৪৫ |
| মাসুনাসা খিরো | ১১. ৮. ১৯৪৫ |
| মিসি | ৪. ৫. ১৯৪৫ |
| নোগনে তেইসুকোই | ৫. ৯. ১৯৪৫ |
| কে. সান্নো | ২৪. ৩. ১৯৪৫ |
| সিমাদা কাজুও | ৪. ৮. ১৯৪৫ |
| তানাকা মিতসু | ৫. ৮. ১৯৪৫ |
| কে. তেসুইকি | ২. ৫. ১৯৪৫ |
| ওয়াতানাবে | ২৮. ৪. ১৯৪৫ |
| টি. ইয়েসিহিসিগু | ১৮. ৫. ১৯৪৫ |
| এস. ইওসিদা | ২. ৫. ১৯৪৫ |
| ইউওয়াতো তেনতারো | ২৭. ৭. ১৯৪৫ |

উৎস: গবেষক কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ ওয়ার সেমিট্রি হতে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ, ২০১৪।

## তথ্যনির্দেশ

উত্তমচাঁদ (১৩৫৩), mfvlP‡›'i AšÍ×©vb Kwnbx, কলিকাতা

চন্দন সান্যাল (২০১৫), 'অভিনেতা চিন্ময় রায়ের খোলা খাতা', ^'wbK †óUmg¨vb, ৮ আগস্ট

---

৯. এই সমাধি-ক্ষেত্র কমনওয়েলথ যুদ্ধ কমিশন কর্তৃক নির্মিত ও সংরক্ষিত। চট্টগ্রামে সংরক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের সমাধি-ফলকে উল্লিখিত নাম সঠিক ও শুদ্ধভাবে লেখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার জন্য গবেষক কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকDr. Noma Haruo-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

চীন-জাপান মহাযুদ্ধ (১৮৯৪), XvKv cKvk, ৫ আগষ্ট।

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৯), ‘চল্‌তি ইতিহাসঃ সুদূর প্রাচী ও ভারতবর্ষ’, fviZel, অগ্রহায়ণ

†'k (১৯৪২), বিজ্ঞাপনের পাতা, ২০ জুন

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৪৯), ‘কোরিয়ায় জাপানের নীতি’, fviZel, ভাদ্র

নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (১৩৪৭), eþ-cevm kirP›¦, কলিকাতা

নরেন্দ্র নাথ সিংহ (১৯৪৪), AvawbK Rvcvb I eËgvb h×, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা

নরেন্দ্র দেব (১৩৪৯), ‘কলিকাতার চিঠি’, fviZel, ৩০ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ফাল্‌গুন

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও অন্যান্য (২০১৩), Rvcv‡bi miKvi I ivRbxwZ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ (১৩৫২), †bZvRxi Rxebx I evYx, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা

‘পল্লীগ্রামে বাড়ি ভাড়া’ (১৩৪৯), সাময়িকী (সচিত্র), fviZel, আষাঢ়

‘বস্ত্র সমস্যা’ (১৩৪৯), সাময়িকী (সচিত্র), fviZel, আষাঢ়

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৩৫২), AvRv' wn‡›'i A¼i, কলিকাতা

ভূপতি চৌধুরী (১৩৪৯), ‘সমস্যার স্বরূপ’, fviZeĺ, অগ্রহায়ণ

মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (১৯৪২), †evgvi f‡q evµ§v Z¨vM, কলিকাতা

মন্মথ নাথ ঘোষ (১৩২২), নব্য জাপান, কলিকাতা

মন্মথনাথ ঘোষ (১৩১৯), জাপানের ধর্ম, gvbmx, চৈত্র

মন্মথনাথ ঘোষ (১৩২০), জাপানের ধর্ম, gvbmx, জ্যৈষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (১৩৩৪), কো-বা-দাইশি ও কোইয়াসান্ আশ্রম, cevmx, কার্তিক

মানসী মুখোপাধ্যায় (১৩৫৭), wee'vq egv, কলিকাতা

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৭), জাপানী বন্দী শিবিরে, কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৬), ‘বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন : প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮)’, evsjv‡‘k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৭), বাংলাদেশের দলিল ও সংবাদপত্রে নেতাজী সুভাষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (২০০৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রন্থিত ইতিহাস (১৯২১-১৯৫২), দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ঢাকা

রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (১৯৯৬), দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

রুষ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৩), ঢাকা প্রকাশ, ১৭ এপ্রিল; ১২ জুন; ১০ জুলাই; ৭ আগষ্ট; ৪ সেপ্টেম্বর; ৯ অক্টোবর; ৭ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর; ১১ ডিসেম্বর; ১৮ ডিসেম্বর;

রুষ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫), ঢাকা প্রকাশ, ১ জানুয়ারি; ২৯ জানুয়ারি; ৫ মার্চ; ১৬ এপ্রিল; ১৪ মে; ৯ জুলাই; ২৭ জুলাই;

শান্তিলাল রায় (১৩৫২), AvivKvb d‡›U, কলিকাতা

শাহ্নওয়াজ খান (১৯৪৬), AvRv‘ wn›‘ †dŠR I †bZvRx, নয়াদিল্লী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৩৫৩), ivó-msMÖv‡gi GK Aa¨vq, কলিকাতা

সুশীলকুমার বসু (১৯৪২), G h× Avgv‡‘i, কলিকাতা

Amartya Sen (1982), *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation,* Oxford University Press, Oxford

‘Axis Says British Leaving Chittagong’ (1943), *Tweed Daily* (Murwillumbah, (NSW (1914-1954), Monday, 24 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article194674613.

B. Pattabhi Sitaramayya (1947), *History of the Indian National Congress*, Vol. 2, (1935-1947), New Delhi

*Dhaka University Institutional Repository*

‘Bombs on India: Stroke at Chittagong’ (1943), 30 May, *The West Australlian* (Perth. WA: (1842-1954), Monday, 31 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article46758101.

‘British Force Goes into Burma: Japanese Fall Back’ (1942), *The Sydney Morning Herald*, (NSW: 1842-1954), Monday, 21 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article17815897.

‘Calcutta Air Raid’ (1942), 21 December, 1942. *The Sydney Morning Herald*, (NSW: (1842-1954), Monday, 22 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article175821537.)

‘Chittagong Evacuated: Japanese Claim’ (1943), *Daily Mercury* (Mackey, Qld (1906-1954), Monday, 24 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article170876105.

*Far Eastern Economic Review* (1978), July 14

Jacquetta Hawkes (1962), Man and the Sun Gaithersburg, MD, USA, Solpub Co.

Isao Tomita (1999), The Tale of Genji, Viking.

‘Japanese Bomb Chittagong Area’ (1942), *Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate* (NSW: 1876-1954), Thursday, 17 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article132816251.

‘Japanese Raid Chittagong–Stung by Allied Bombing’ (1942), *The Sydney Morning Herald*, 14 December, National Library of Australia. http://nla.gov.au/nla.news-article17799625.

J. Hall (1978), Political Thought in Japanese Historical writing from Kojiki, Ontario, Canada.

Joseph Azize (2005), The Phoenician Solar Theory, NJ : Gorgias Press.

*Dhaka University Institutional Repository*

Letter from R.B. Banik, Head Clerk, Collector's Office to Khan Sahib B. Rahman (1942), Sub-divisional Officer, Patuakhali. 25 December, *F.O. Bell Papers: Additional Papers. MSS. Eur. D733/40. India Office Library*, *London* (Currently the British Library).

Letter from the Consul of Japan to the Magistarte of Chittagong (1956), 3 March, Government of East Pakistan, B-Proceedings, Department of Home (Political), *Bangladesh National Archives*, Bundle No. 153, July, 1957, Proceedings Nos. 84-95

Matthew Calbraith Perry (1856), *Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan*, New York.

Michele Marra (1993), Representations of Power : Literary Politics of Mediaval Japan, University of Hawaii, USA.

Moshe Yegar (1972), *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden

Nalini Ranjan Chakravarti (1971), *Indian Minority in Burma: The Rise and Decline of an Immigrant Community*, (London: Oxford University Press)

Nandalal Chatterjee (1962), 'Netaji Subhash Chandra Bose and India's Struggle for Freedom', *Journal of Indian History*, Vol. 40, April

'New Raids on Chittagong' (1942), *Examiner* (Launceston Tas: 1900-1954), Thursday, 17 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article91502398.

Secret Letter from District Magistrate of Barisal to G.H. Mannoach, Inspector General of Police, Bengal, Calcutta (1942), 30 December, *F.O. Bell Papers: Additional Papers. MSS. Eur. D733/40. India Office Library*, *London* (Currently the British Library).

Stephen P. Cohen (1963-64), 'Subhas Chandra Bose and Indian National Army", *Pacific Affairs*, Vol. 36, (Winter)

*Dhaka University Institutional Repository*

Sumit Sarkar (1959), *Modern India*, 1885-1947, Macmillan India Limited, Delhi

The Statesman, 22 December, 1942. The Statesman: An Anthology, (compiled by Niranjan Majumder, (Calcutta: The Statesman, 1975), p. 480.

*The Oxford Companion to World War II* (2002), British Commonwealth, London: Oxford University Press

'Troops Approaching is Japanese Claim' (1942), *Morning Bulletin* (Rockhampton, Qld: 1878-1954), Saterday, 16 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article56118456

Vishwanath Prasad Varma (1960), 'The Political Philosophy of Subhas Chandra Bose', *Calcutta Review*, Vol. 157, October

Walter Theimer (1950), *Encyclopedia of World Politics*, London Faber and Faber Limited, London

Wedgwood Benn (1939), The War and India's Freedom" *Contemporary Review*, Vol. 156, December

William Tylor Olcott (1914/2003), Sun Lore of All Ages: A Collection of Mythes and Legends Concerning the Sun and its worship, Adamant Media Corporation.

*Dhaka University Institutional Repository*

তৃতীয় অধ্যায়

# কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

‘একজন লোক ব্যবসা করছে। সে লোক করচে কি? তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনাফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে’ না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেচে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিল সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাংকে জমানো কোম্পানি-কাগজের কুল ত্যাগ করে’, সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কি দেখ্‌চি?—না, পাওয়া সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Rvcvb-hvÎx, বিশ্বভারতী, ১৩২৬

যে কোনো দেশের কৃষি অর্থনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে সে দেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে ভ্রমণরত বা জাপান সম্পর্কে বাংলায় লিখিত গ্রন্থে বা প্রবন্ধে সে দেশের ভূমি বা কৃষি সম্পর্কিত তথ্য অনুপস্থিত। ফলে এক্ষেত্রে ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত পৃথিবীর একটি ছোট রাষ্ট্র হলেও বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন, জন-পরিপোষণ ও আনন্দদায়ক জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সরবরাহ শেষ পর্যন্ত এই জাতিকে একটি কর্মঠ ও শিল্পোদ্যোগী জনগোষ্টিতে পরিণত করেছে। কমোডোর পেরি ১৮৫৩-৫৪ সালের মধ্যে দু’বার জাপান অভিযান পরিচালনা করেন। পেরির অভিযানের ফলে জাপান বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হয়, অবরুদ্ধ জাপান বহির্বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হয় এবং এর ফলে জাপানে নবউন্মাদনা ও পার্থিব উন্নতি ঘটে। ক্রমে পাশ্চাত্য থেকে শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন এবং তা স্বদেশের জন্য উপযোগী করে তোলার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানা না গেলেও ১৮ শতকের মাঝামাঝি দেখা যায়, দাইমিওরা কৃষকদের কাছ থেকে নগদ ফসলে রাজস্ব আদায় করতো। দাইমিওরা ছিলেন জাপানের শোগুনের অধীনস্থ শক্তিশালী সামন্ত, যাদের দোর্দণ্ড ক্ষমতা ১০ শতক থেকে ১৯ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রায় চারদিকে পাহাড় ও পর্বতবেষ্টিত জাপানের মৃত্তিকা সমরূপ ছিল না। কোনো কোনো স্থানে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা ও উদ্ভিদ-মিশ্রিত মৃত্তিকা; আবার কোথাও কিছু সমতল ভূমি। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছিল মাত্র ৬/৭ হাত সমতল ভূমি, আবার পাহাড়ের অনেক উঁচু জায়গা যেখানে কৃষি যন্ত্র ও গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে জাপানের মৃত্তিকার ধরন এমন যে সকল স্থানে গবাদি পশুর মাধ্যমে চাষ করা ছিল অসম্ভব। ফলে সেখানে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন ছিল। সে কাজে কৃষাণের সঙ্গে কৃষাণীও প্রায় সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতো (Samuel, 1880 : 197)।[১০]

প্রথমে ধান উৎপাদন ছিল কৃষকের প্রধান কাজ। ধান রোপন ও বপন এবং ধান পাকা ইত্যাদি কাজের প্রতি জাপানি কৃষক ছিল খুবই মনোযোগী। পূর্বে কৃষক দাইমিও-এর অনুসারী হিসেবে চাষাবাদ করলেও মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মিকাদো সরকারের অধীনে বার্ষিক রাজস্ব দিয়ে চাষাবাদ করতে হতো। শীতের সময় ধানের ক্ষেত থাকতো সাদা বরফে ঢাকা। ফলে জাপানি কৃষক বছরে একবারই ধান চাষ করতে পারতো। এপ্রিল মাসের শেষদিকে বা মে মাসের প্রথমদিকে কৃষক ধানের ক্ষেতের এক পাশে বীজ-তলা তৈরি করতো নিবিড় বা ঘন ধানের বীজ উৎপাদনের জন্য কিছু তরল সার প্রয়োগ করতো। আবহাওয়া ভালো থাকলে ৪/৫ দিনের মধ্যে বীজ ধানের অঙ্কুরোদগম হতো। এই সময়ের মধ্যে কৃষক কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করে ধান চাষের ক্ষেত তৈরি করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতো। ধান ক্ষেত চাষের জন্য উপযুক্ত হলে সেখানে সেচের মাধ্যমে তিন ইঞ্চি জল ধরে রাখা হতো। জুন মাসের প্রথমেই কৃষাণ, কৃষাণী ও কৃষিশ্রমিক বীজ-তলা থেকে সারি করে সবুজ ধানের চারা রোপন করতো। নভেম্বরের প্রথমদিকে পাকা ধান কাটা, ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ হতো সম্পন্ন(মন্মথনাথ, ১৩২০ : ২৯৩)।

---

১০. "It is not until within view of Fusiyama, that the dark, rich soil of the volcanic regions first appears. Then it spreads to the eastward and the north forming a soil of a blackish-brown colour, and composed chiefly of vegetative matter. This kind of soil is not confined to the low valleys, but also met with on the tops of the hills, and up the sides of high mountains. Hence the Chinese system of cultivating these by terraces has been adopted. Where cattle cannot draw the plough, men take their place, or substitute manual husbandry. As a rule the latter operation forms the principal kind of labour, in which females largely assist". Samuel Mossman, *Japan*, London: Sampson Low, 1880, p. 197.

*Dhaka University Institutional Repository*

গরমের ফসল ব্যতীত জাপানি চাষী শীতকালে যে সকল ফসল উৎপাদন করে তা হলো গম, বার্লি, মটরশুটি, বিভিন্ন প্রকার দানা শষ্য, বাজরা, রসুন ও আলু। জাপানে ধানের পর গম, বার্লি, মটরশুটি হলো প্রধান খাদ্যশষ্য। এসকল খাদ্যশষ্য ধান চাষের পাশে যে জমি উদ্বৃত্ত থাকে সেখানে অথবা পাহাড়ের পাদদেশে উৎপাদন করা হয়। এসকল জমি চাষের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

জাপানের গ্রামের সমতল ভূমিতে চাষ করার ক্ষেত্রে কৃষকদের কিছুটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। ভূমি চাষ নিয়ে জাপানিদের মধ্যে কিছু কুসংস্কার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাপানে চার বছর বসবাসকারী ও অভিজ্ঞ মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন—

> পল্লীগ্রামস্থ কৃষকরা ভূমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে উহা হইতে একখানি প্রস্তর কিংবা কিছু মৃত্তিকা লইয়া এক কোনে রক্ষিত করে। পরে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে জমিতে লাঙ্গল দেয়। কোনও বৃক্ষ ছেদন করিতে হইলে অগ্রে এরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া তৎপর উহাতে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে মৃত্তিকা এবং বৃক্ষেতে যে সকল দৈত্য অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইলে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে হয় (মন্মথনাথ, ১৩২০ : ২৯৬)।

১৯৩১ সালে ক্ষিতিনাথ সুর ‘আধুনিক জাপানের সমাজ’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন যে জাপান প্রধানত কৃষি-প্রধান দেশ। জাপানের শতকরা ৬০ জনের উপজীবিকা কৃষি। একমাত্র সম্পন্ন পরিবারের মেয়েরা ব্যতীত অন্য সকল মেয়েই পুরুষদের কৃষি কাজে বিশেষ সহায়তা করে থাকে (ক্ষিতিনাথ, ১৩৩৮ : ৭৯২)। মানব সভ্যতার সূচনা হয় কৃষি দিয়ে এবং অনেক পরে শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন টেকসই হয়। জাপানও এই প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম নয়। জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রভাব বর্তমান। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত। জাপানে পাহাড়ের আধিক্য রয়েছে। সমতল ভূমির পরিমাণ অতি নগন্য। চাষাবাদের জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। ভূসংস্থাপনিক পরিস্থিতি এত জটিল যে পাহাড়ের ছোট ছোট খাঁজে কৃষককে কৃষি কাজ করতে হয়। চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে ওঠা ও ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় (ক্ষিতিনাথ, ১৩৩৮ : ৭৯২)।

জাপানে ধান চাষের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নয়। ভূসংস্থাপনিক অবস্থা প্রাথমিকভাবে ধান চাষের উপযোগী ছিল না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে, প্রায় চারদিকে পাহাড়-পর্বত পরিবেষ্টিত জাপানে সমতল ভূমির পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই তথা ‘জুমন’ ও ‘ইয়াঐ’ অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

৬০০০ বছর আগে জাপানে স্বল্প পরিসরে ধান চাষের সূচনা হয়। প্রথমে ধান চাষ সীমিত ছিল কেবল সমতল ভূমিতে। তবে ধান চাষের পূর্বে বিভিন্ন এলাকায় যেমন, পাহাড়ের স্তরে স্তরে, নিচু বা ঢালু জায়গায়, তৃণভূমি ও উপকূলীয় এলাকায় গম, বার্লি, মিঠে আলু উৎপাদিত হতো। পরবর্তীকালে জনসংখ্যার চাপে জাপানি চাষীরা ধান চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে চাল জাপানিদের খাদ্য তালিকায় অনিবার্যভাবে চলে আসে এবং জাপানের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আবেগপূর্ণ ও প্রভাবক ভূমিকা পালন করে (মন্মথনাথ, ১৩২০ : ২৯৭)।

জাপানের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময় ধান চাষের জন্য উপযোগী। জাপানের উত্তরাঞ্চলে ধান চাষের উপযোগী সময় হলো জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ এবং ভাদ্র থেকে কার্তিক; মধ্যাঞ্চলে বৈশাখ থেকে আষাঢ় এবং ভাদ্র থেকে কার্তিক; দক্ষিণাঞ্চলে বৈশাখ থেকে আষাঢ় এবং শ্রাবণ থেকে আশ্বিন। জাপানের ধানের নাম 'কোশিহিকারি' বা 'জাপোনিকা'। এই ধানের ভাত একটু আঠার মতো, একটি অন্যটির সঙ্গে লেগে থাকে। জাপানিরা আতপ চালের ভাত খায় এবং কখনো ভাতের ফেন বা মাড় ফেলে দেয় না। ফলে জোড়াপাঠি দিয়ে সহজেই ভাত খাওয়া যায়। জাপানের ধান থেকে প্রস্তুতকৃত ভাত খাদ্যগুণে খুবই সমৃদ্ধ, এজন্যই জাপানিরা কখনো বেশি পরিমাণে খায় না। নারকেলের খোলের মতো কাঠের বাটির মাত্র এক বাটি ভাত খায়। সাধারণ গৃহস্থের স্ত্রী ও কন্যা নিজ হাতে খাবার রেঁধে থাকেন। জাপানি মেয়েদের মতো এমন সুখাদ্য পৃথিবীর আর কেউ রান্না করতে জানে না। কিন্তু সরোজনলিনী দত্ত তাঁর Rvcv‡b e½bvix শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনিতে জাপানের খাবার সম্পর্কে একটু ভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন—

> ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা আছে। তারই উপরে তিনটা ছোট গোল গদি পাতা ছিল, আমাদের বস্‌বার জন্য। আমরা বস্‌লে তাঁরা তিনটা 'ট্রে' এনে সামনে দিলেন, তাতে চারটা করে চিনে মাটির বাটি ছিল; একটাতে ভাত, একটাতে মাছের সুরুয়া, ও অন্য দুটো বাটিতে মাছের তরকারির মত কিছু ছিল। কিন্তু খাবারগুলিতে এত খারাপ গন্ধ লাগ্‌লো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব ছিল। খাতিরে পড়ে একটু ভাত মাত্র মুখে দিলাম, সুরুয়া ও তরকারিগুলো নাম মাত্র ছুঁলাম। এই গন্ধের চোট সামলাতে আমার কিন্তু চার পাঁচ দিন সময় লেগেছিল। যা খেতাম তাতেই ভয়ানক গন্ধ অনুভব করতাম (সরোজনলিনী, ১৯২৮ : ১৮৮-৮৯)।

ধান ব্যতীত জাপানি কৃষক আরো অনেক প্রকার ফসল উৎপাদন করে—যা তাদের নিত্যদিনের খাবারের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। জাপানিরা প্রতিদিন খুব কম ভাত খায় বলে উদরপূর্তির জন্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জী, মাছ-মাংশ ও ফল-মূল খেতে হয়। এজন্য জাপানি কৃষক বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জী ও ফল-মূল চাষ করে। সব্জীর মধ্যে আলু, মুলা, বেগুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জাপানে আউশ ধানের চাষ আরম্ভ হয়েছিল ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের পরে এবং এই ধানের চাষ জাপানিদের জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। 'ইয়াঐ' যুগে আউশ ধানের চাষ জাপানিদের জীবন ও সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। আউশ ধান জাপানের যাযাবর জনজাতিকে গৃহবাসী করে তোলে। কেননা এই ধানের চাষ অপেক্ষাকৃত বড় জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জন্য ছিল খুবই উপযোগী। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, আউশ ধান চাষ প্রাচীন যুগে জাপানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক ছিল। এই ধানের চাল খুবই পুষ্টিকর। সাধারণত জলা জমিতে বর্ষাকালে আউশ ধান উৎপন্ন হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জাপানের কিউসু দ্বীপে আউশ ধানের চাষ হতো এবং আউশ ধান চাষের যন্ত্রপাতিও ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এরা মনে করেন জাপানে অভিবাসী চীন ও কোরিয়ার জনগণ আউশ ধান চাষের বীজ এনেছিল। চীনের চ্যাঙ্গজিয়াং থেকে কোরিয়া উপদ্বীপ হয়ে আউশ ধান চাষের ধারণা উত্তর কিয়সু দ্বীপে পৌঁছে। জাপানের 'ইয়াঐ' যুগে সিগা, ফুকুওকা ও উত্তর তোহুকু প্রদেশে প্রাচীনতম আউশ ধানের ফসিল পাওয়া গেছে। এখানে সেচের সাহায্যে আউশ ধান চাষের প্রমাণ রয়েছে।

কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ধান জাপানে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। ধান ছাড়া সয়াবিন, আখ, গাজর, শালগম, বাঁধাকপি, নানা প্রকার সব্জি, কমলা লেবু, আপেল, নাসপাতি, পীচ ও চেরি ইত্যাদি ফল উৎপন্ন হয়। জাপানের শীতলতম প্রদেশ হোক্কাইদো ও হনসু এলাকায় গম, যব, ভুট্টা, লাল সীম ও কড়াইশুটি, শণ, কিছু ধান, তরমুজ, বাজড়া ও লোধ্র চাষ হতো। সেখানে ইতিহাসের এক অধ্যায়ে গবাদি পশু, শূকর, ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রচুর পরিমাণে প্রতিপালিত হতো।

জাপানে প্রাচীনকালে গ্রামীণ জনগণ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল সেই কৃষকের যে নিজের জমি নিজেই চাষ করতো। সে সমাজে ধনী কৃষক বলে বিবেচিত হতো। এদের মধ্যে জমি চাষের পরিমাণ অনুযায়ী কয়েকটি উপবিভাগ বা শ্রেণি ছিল। কারিগর ছিল কৃষকের সহযোগী, কেননা সে কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। বণিকের স্থান ছিল সবার নিচে, কারণ সে অন্যের উৎপাদন থেকে লভ্যাংশ ভোগ করতো(রঙ্গলাল, ১২৯৩ : ৫২)।

জাপানের কৃষিকাজ পদ্ধতি কামাকুরা শাসনকালে উন্নততর হয়। এই সময় জাপানের কৃষক বছরে দু'বার ধান চাষ করে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়। চাষের কাজে গরু ও ঘোড়া উভয় ব্যবহৃত হতো। সেচ ও ধান গাছ থেকে ধান ছাড়িয়ে নেওয়ার পদ্ধতিও এসময় পরিচালিত হতো। কৃষক কৃষিকাজ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতীত পশুপালন, কাগজ ও মাটির পাত্র তৈরি এবং ক্ষুদে ব্যাবসা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত থাকতো।

জাপানের চারদিকে সমুদ্র এবং তা ছিল মাছে পরিপূর্ণ। উপকূল আঁকাবাঁকা ও সমুদ্র অগভীর এবং উষ্ণ কুরোশিও, শীতল সুমেরু বা কিউরাইল স্রোতের মিলনের ফলে জাপানের সমুদ্র অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় (রঙ্গলাল, ১২৯৩ : ৫৩)।

অন্য অনেক জাতির তুলনায় জাপানিদের স্বাস্থ্য ভালো এবং সেজন্য তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করতে পারে। অনেক জাতির তুলনায় জাপানিদের গড় আয়ুও বেশি। জাপান সরকার জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। জাপানের আইন অনুযায়ী কোনো বিদেশি জাপানে জমির মালিক হতে পারে না। একইভাবে কোনো বিদেশির জাপানের ভূগর্ভ থেকে কোনো খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও বিক্রয় করার অধিকার নেই।

জাপান সরকার তার নাগরিকদের জন্য উৎকৃষ্ট ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার ব্যবস্থা করেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের কারখানা স্থাপনের জন্য জাপানি প্রজাদের অনুপ্রাণিত করছে। বাণিজ্য জাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের দায়িত্ব জাপান সরকার নিজ হাতে রেখেছে। জাপানিরা বেশি শ্রমের মাধ্যমে বেশি আয় করতে পারে এবং এজন্য সরকারকে করও বেশি দিতে পারে। ফলে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার এবং উন্নতির ক্ষেত্রে বেশি খরচ করতে পারে (cevmx, ১৩৩০ : ১১৭-২৩)।

যদুনাথ সরকার জাপান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যদুনাথ সরকার ছাত্র হিসেবে জাপান গিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনায় এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাঁর e½mwwnZ¨wfavb-এ উল্লেখ করেছেন যে যদুনাথ সরকার জাপানের কৃষি কলেজের ছাত্র ছিলেন (যদুনাথ, ১৩১৯ : ১১৩০, ১১৩৩, ১১৩৯)। যদুনাথ সরকার fviZx সাময়িকপত্রে লিখেছেন যে— 'আমরা এক শ্রেণিতে ৫২টি ছাত্র ছিলাম। আমি উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান দখল করিলেও ওজন ও শক্তিতে একজনের মাত্র উপরে ছিলাম (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪১)।' তিনি শিক্ষা শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে বাংলার কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং পদোন্নতি পেয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষি বিভাগের সহ-পরিচালকের পদে অলঙ্কৃত হন (হংসনারায়ণ, ১৯৯২ : ১২)।

যদুনাথ সরকার একটি চমৎকার বিষয়ের উল্লেখ করেছেন—

> আর একটা কথা, জাপানে কোন জিনিস নষ্ট হয় না। বাড়ি-ঘরের আবর্জ্জনা বলুন, আর পায়খানার ময়লা বলুন, কিছুরই অপব্যয় হয় না। সকলই কোন-না-কোন কাজের উপযোগী

> করিয়া লওয়া হয়। বলা বাহুল্য, মেথর প্রভৃতিকে মাহিয়ানা দিতে হয় না, বরং মেথরই অনেক সময় গৃহস্বামীকে পয়সা দিয়া থাকে। ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি দিয়া ক্ষেতের সার প্রস্তুত হইয়া থাকে (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৪৭২)।

বিশ শতকের প্রথমদিকে জাপানের কৃষিকাজে সার হিসেবে মানুষের 'মল' বা 'বিষ্ঠা' ব্যবহৃত হতো। বিষয়টি অনেকের কাছে অপ্রিয় হলেও জাপানিদের কাছে ছিল সত্য ও বাস্তব। তখন জাপানিরা কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কৃষিকাজে সার হিসেবে মানুষের মল বা বিষ্ঠা ব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন গ্রিসের এ্যাটিকা বা এ্যাথেন্সের কোনো অঞ্চলে ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, চীন, হংকং ও সিঙ্গাপুরে, মায়া সভ্যতায়, মধ্য-আমেরিকায়, টিউডর যুগের ইংল্যান্ডে এবং ভারতে সার হিসেবে মানুষের মল বা বিষ্ঠা ব্যবহৃত হতো। জাপানে এই সারের নাম ছিল 'কুমিতরি বেন্‌জো' (Ebery, Walthall, Palias, 2006)।[১১]

যদুনাথ সরকার সাময়িকপত্র f√iZx-তে 'জাপানের সহর' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বিশ শতকের প্রথমদিকে জাপানের গ্রাম ও শহরে পায়খানা অবশ্যই ছিল, কিন্তু পৌরসভার সঙ্গে এই ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই বিষয়ে যা কিছু করার, গৃহস্বামীই তা সম্পাদন করতেন। জাপানের শহরে কতগুলো কোম্পানি ছিল, মানুষের মল বা বিষ্ঠা সংগ্রহ করা ছিল তাদের ব্যাবসা। এই সকল কোম্পানির নিয়োজিত কর্মচারী কাঠের পাত্রে মল সংগ্রহ করতো। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> এক একজন ঐরূপ ৮/১০টি পাত্র একখানা গাড়ির উপর সাজাইয়া মফস্বলে টানিয়া লইয়া যায়। যে সময়ই তোকিওর পথে বাহির হও না কেন দেখিবে সারি সারি ময়লা গাড়ির যেন শেষ নাই। জাপানীরা উহার গন্ধে অভ্যস্ত; আমরা কিন্তু নাকে রুমাল না দিয়া চলিতে পারিতাম না। জাপানীদের উহাতে একটু ঘৃণার ভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি সহরের অনেক কেন্দ্রস্থলে ঐ সকল গাড়ির আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপথেও বহু দূরবর্ত্তী গ্রামে ঐ সকল গাড়ি লইয়া যাওয়া হয়। তোকিও সহরে জলপথে নৌকাযোগে উহা রপ্তানি হইবার উল্লেখযোগ্য প্রধান ষ্টেশন আছাকুশার বিখ্যাত হায়ার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউশানের দ্বারদেশের সম্মুখভাগ। আমাদের দেশে—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ির সম্মুখে এরূপ ষ্টেশন থাকিতে পারা না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সে বিষয়ে আদৌ আকৃষ্ট হয় না। যেহেতু উহা অনেকটা ধানের বস্তা, তুলার বস্তা, পাটের বস্তা প্রভৃতির ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৬৩১)।

---

১১. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, P. Ebrey, A, Walthall and J. Palias, *Modern East Asia: A Cultural, Social, & Political History,* New York, 2006.

*Dhaka University Institutional Repository*

মানুষের মল বা বিষ্ঠা কোম্পানি নিয়োজিত কর্মচারীরাই পরিষ্কার করে। এজন্য তাদেরকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তারাই উপহার হিসেবে গৃহস্বামীদের কিছু শাকসব্জি দিয়ে থাকে। যদিও জাপানি গৃহস্বামী ইচ্ছা করলে মানুষের মল বা বিষ্ঠার জন্য কিছু মূল্য দাবি করতে পারে; কিন্তু জাপানিরা তা করে না। জাপানে 'মেথর' নামে কোনো পেশা বা জনগোষ্ঠী নেই। সকল লোকই এই কাজ সম্পাদন করতে পারে। যার বাড়ি তিনিই একাজ করে থাকেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোম্পানিই এসকল সংগ্রহ করে। জাপানিরা মনে করে—

> ...গরুর বিষ্ঠা জমির পক্ষে খুবই মূল্যবান সার। মনুষ্যের বিষ্ঠা উহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু মনুষ্য গরুর চেয়ে পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভূক্ত পদার্থের কিয়দংশ অস্থি, মাংশ ও রক্তে পরিণত হইয়া দেহ পুষ্ট করে এবং বাকী অংশ অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ঠারূপে বহির্গত হয়। ইহা উদ্ভিজ্জের পরিপোষণে বিস্তর সহায়তা করে। মনুষ্য খাদ্যের সহিত উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। অতি অল্প খরচে এই মূল্যবান সার সকলেই লইতে পারে। জাপানে ছোট বড় ধনী দরিদ্র কেহই এ সার জমিতে প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করে না (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৬৩২)।

এভাবে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে এই সারের প্রচলন ছিল। কিন্তু জাপানি চাষী কোন পদ্ধতিতে এই সার সংগ্রহ ও ব্যবহার করতেন—সে বিষয়ে প্রবন্ধকার কিছু লিখেননি। একইভাবে কোন কোন ফসলে এবং কোন পদ্ধতিতে এই সার ব্যবহার করা হতো, তাও তিনি উল্লেখ করেননি। এছাড়া এই সার বাজারজাতকরণ ও মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কেও লেখক কোনো তথ্য দেননি।

যদুনাথ সরকারের তথ্য অনুযায়ী জাপানের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য নিবিড় ধান চাষ করা সম্ভব না হলেও জাপানিরা গম, যব, রাই ও বার্লি উৎপাদন করে। অন্যদিকে জাপানের দক্ষিণাঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয় এবং এখানে সয়াবিন, আখ, অতসী, মিষ্টি আলও উৎপাদিত হয়। জাপানে পাট উৎপাদন সম্ভব ছিল না, তবে প্রাকৃতিক কারণে সেখানে বাঁশ ও বেত ফলতো। সেখানের দরিদ্র পরিবারগুলো গৃহ নির্মাণের জন্য বাঁশ ও বেত কাজে লাগাতো। পরে জাপানিরা বাশ ও বেত শিল্পের কাজে ব্যবহার করে।

জাপান খ্যাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেখানে কোনোদিন দুর্ভিক্ষ হয়নি। কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে শিল্প নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি তাদের দেশে ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু দ্রব্য আমদানি করতো। প্রথমদিকে জাপান ছিল একটি কৃষি-নির্ভর দেশ এবং কয়েকটি ধাপে এই দেশ কৃষি-নির্ভর শিল্পের দেশে উন্নীত হয়। জাপানিরা অনুকরণ প্রিয়। যোগ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের

*Dhaka University Institutional Repository*

পর  স্বদেশের জন্য উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। এমন কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানিরা কিছু আবিষ্কার করেছে। জাপানে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দেশের উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ছিল জাপানের প্রতিষ্ঠিত নীতি। তারা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রেলওয়ে, ট্রাম ও স্টিমার ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় এবং ক্রমে দেশকে শক্তিশালী রপ্তানিকারক হিসেবে গড়ে তোলে।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪) বেথুন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. কালিদাস নাগের সহধর্মিনী। স্বামীর সঙ্গে তিনি ভ্রমণ করেছেন। ১৯৩৮ সালে স্বামীর সঙ্গে জাপান ভ্রমণ করেন। সংসদ evOwj PwiZwfav‡bi (১৯৯৮) বিভিন্ন স্থানে Rvcv‡bi Wv‡qwi নামে তাঁর একটি গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও এই শিরোনামে কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক সাময়িকপত্র cevmx-তে 'জাপান ভ্রমণ' শিরোনামে তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়। সরোজনলিনী দত্তের পর তিনি জাপানের গ্রামের অবস্থা তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। তিনি জাপানের নৈসর্গিক ও কৃষির অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। শান্তা দেবী লিখেছেন—

> ট্রেনে চড়েই জাপানের গ্রাম্য দৃশ্য অনেকটা চোখে পড়ে। যদিও কোবে থেকে ওসাকা পর্য্যন্ত জাপানে গ্রাম নামক পদার্থ লোপ পেয়ে গিয়েছে মনে হয়, কারণ এই অংশে জাপান ইলেকট্রিক থাম, তার, কারখানা আর ছোট বড় ঘরবাড়ি দিয়ে যেন মোড়া। আমি জীবনে এত তার এবং লোহার থাম কোথাও দেখিনি; তবে নারা যাবার পথে গ্রাম্য ছবি অনেক দেখা যায়। বড় বড় তরকারির ক্ষেতে কত যে সবজী চাষ হয়েছে বলা যায় না, আমাদের দেশের অসংখ্য পোড়ো জমিতে এমন ক'রে চাষ করতে পারলে দেশ রাজা হয়ে যেত। ধানের ক্ষেতে আমাদের দেশেরই মত করে খড়ের গাদা, খড়ের আঁটি সাজান রয়েছে, কচিৎ দুই-এক জায়গায় মাথায় রুমাল বেঁধে মেয়েরা কাজ করছে। ক্ষেতে কর্ম্মরত মানুষ কেন জানিনা খুবই কম দেখলাম। বড় বড় ক্ষেতের মধ্যেই ছোট ছোট গ্রাম্য বাড়ি বাগান দিয়ে ঘেরা ... শুনেছি এদেশে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাড়ী হয় স্কুলের। বাড়িগুলির পাশে বাগানে ঘন সবুজ বেড়া (শান্তা, ১৩৪৫ : ১০৪-১০৫)।

১৯২৩-২৪ সালে জাপানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে Rvcvb g¨vMwRb সাময়িকপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তথ্য নিয়ে cevmx-তে জাপান ও ব্রিটিশ-ভারতের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, এই প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক। ১৯২৩-২৪ সালে জাপানের আয় ছিল একশো পয়ত্রিশ কোটি ইয়েন।[১২] ইয়েনকে তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায় ২০২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কোনো সূত্রই সমর্থন করে না যে, জাপানের মাটি খুব উর্বর। জাপান পাহাড় ও পর্বত সমন্বিত একটি দেশ। তার মোট ভূমির ছয় ভাগের এক ভাগ চাষযোগ্য। জাপানে খনিজ দ্রব্য খুব বেশি নেই। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে। জাপানের সরকার নাগরিকদের পণ্যশিল্পে ও বাণিজ্যে উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট প্রেরণা দিয়ে থাকে।

১৮৯১ সালে জাপানের চেম্বার্স অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৯৫ সালের মে মাসে হাকোদাতে অনুষ্ঠিত এটির এক সভায় মি. কানেকা বলেন যে, শিল্পে উন্নয়নের সমগ্র উপাদান জাপানে আছে এবং ব্যাবসা ও বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রয়োজনীয় জনশক্তিও এখানে বিদ্যমান। জাপানিদের কাজ করবার শক্তি অনেক বেশি এবং তাদের বুদ্ধি অতিব প্রখর। তাঁরা অনেক বিষয়ে সুক্ষ্মদর্শী ও পৃথিবীর অনেক জাতির চেয়ে বুদ্ধিমান, ফলে আমেরিকা পর্যন্ত জাপানিদের সমীহ করে। এই অধিবেশনে জাপানের কৃষি ও শিল্প বিভাগীয় উপমন্ত্রী বলেন যে, ১৮৬৮ সালে মেইজি শাসন প্রতিষ্ঠার পরেই জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধন হয়। পূর্বে এখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তা তথা 'দাইমিও'র দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। ১৮৬০ সালে জাপানে দাইমিওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তাদের প্রচেষ্টাতেই তার অবসান ঘটে। এই সময় জাপানে অনেক কুসংস্কার ছিল। দাইমিওদের প্রচেষ্টাতে এই কুসংস্কারেরও ঘটে অবসান। তিনি আরো বলেন যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে কশাই ও চামারদের ব্যাবসা নিন্দনীয় ছিল এবং তারা সমাজচ্যুত হতেন। কালচক্রের পরিবর্তনে সে সকল এখন বর্জিত। যদিও এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

নবীন জাপান কেবল যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আধুনিক জগতে যশস্বী হয়েছে তা নয়। জাপান ব্যাবসা ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে উন্নতিকামী জাতির আদর্শস্বরূপ হয়েছে। জাপানের ওসাকায় ১৮৯১ সালে চেম্বার্স অব কমার্স স্থাপন করা হয়। এই চেম্বার অব কমার্স প্রতি বছর নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন—

১. একটি ব্যবসায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে নিয়মিত পরিচালনা করে

২. ওসাকা ও তৎসন্নিহিত স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, অথচ যাদের ব্যবসায় প্রবৃত্তি ও অনুরাগ আছে, তাদের জন্য প্রতি বছর পরীক্ষার আয়োজন

১২. ইয়েন জাপানি মুদ্রার সরকারি নাম। তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রায় ১ ইয়েন = ১.৫০ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এই পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হলে তারা ব্যাবসার জন্য উপযুক্ত—এই মর্মে সনদপত্র দেওয়া হয়।

৩. জাপান, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর দু'বার 'যাযাবর মেলার' আয়োজন করা হয়।

৪. চেম্বার্স অব কমার্স-এর পরিচালনায় প্রতি বছর দু'বার শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

৫. ওসাকার চেম্বার্স অব কমার্স-এর নিজস্ব ভবন ৫ লক্ষ ইয়েন দ্বারা নির্মিত হয়েছে। ভবনটি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। এখানে আধুনিক নক্সায় তৈরি হোটেল রয়েছে এবং এই হোটেলের নিচের তলায় কর্মচারিদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই হোটেলের দ্বিতীয় তলায় চেম্বার অব কমার্স-এর কার্যালয়, চেম্বারের প্রেসিডেন্টের কক্ষ, সম্পাদকের কার্যালয়, পরিচালকদের কক্ষ, সংবাদপত্রের কক্ষ, আগন্তুকদের অপেক্ষার কক্ষ ও চেম্বারের সভার অধিবেশন কক্ষ রয়েছে। তৃতীয় তলায় চেম্বার অব কমার্স-এর কমিটির সদস্যদের বসার কক্ষ ও গ্রন্থাগার অবস্থিত। চতুর্থ তলায় বাণিজ্যিক পণ্যসমূহের নমুনা এবং ওসাকায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের নমুনা রয়েছে (জাপানের, ১৩৩২ : ৩১১)।

যদুনাথ সরকার জাপানি ভাষাও কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। তিনি 'জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য' শিরোনামে ১৯০৪ সালে f\iZx সাময়িকপত্রে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বিশ শতকের সূচনালগ্নে আধুনিক জাপানের সামগ্রিক উন্নতিতে বিশ্ববাসী অবাক হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন—

> জাপান অন্যান্য বিষয়ের চেয়েও অতি অল্পকাল মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে, এরূপ পৃথিবীর কোন জাতি কোন বিষয়ে দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অনেকেই বলিয়া থাকেন যেন অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাবে জাপানীরা ভেল্কিবাজীর ন্যায় অসম্ভব কার্য্যসমুদায় অতি সহজে নীরবে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সামরিক কৌশলে ইহারা চীন ও রুশকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্য-যুদ্ধে জাপানীদের অসাধারণ নৈপুন্য দর্শনে শিল্পবীর ইংরাজ, ফরাসি, জার্ম্মান এবং মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছেন (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৫৪-৫৫)।

১৮৯৫ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনী হয়। জাপান এই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। এখানে জাপানি সূতি, চীনামাটির বাসনপত্র, রেশমি বস্ত্র, বাঁশ

ও বেতের জিনিস, মাদুর ও বার্নিশের কাজ দেখে আমেরিকার জনগণ স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আমেরিকার শিল্প ও বাণিজ্যে ক্ষতির আশঙ্কা লক্ষ করে সে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি মি. পি. রবার্টকে জাপানি শিল্পের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য জাপানে প্রেরণ করে। আমেরিকানরা জাপানকে যথেষ্ট লাভজনক ক্ষেত্র মনে করে ১৮৫৪ ও ১৮৫৭ সালে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেছিল। কিন্তু রবার্ট জাপানে এসে দেখেন যে লাভ তো দূরের কথা বরং জাপানই আমেরিকার অর্থ শোষণের বিধি-ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে।

পি. রবার্ট তাঁর বিবরণীতে বলেন—

> আমেরিকার শিল্পসংস্থার পক্ষে তার প্রাচ্য দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। কেননা প্রাচ্য দেশীয় অর্থাৎ জাপানের শিল্পসংস্থার বিশেষ কতগুলো সুবিধা রয়েছে, যেমন—অল্প মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক প্রচুর দক্ষ শ্রমিক—যা আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৫৫)।

যদুনাথ সরকার মানচেস্টারের তন্তুবায়দের তথ্য উল্লেখ করে লিখেন যে, জাপানিরা অতি দ্রুত শিল্পে উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম।

জাপানি শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায় বৈজ্ঞনিক পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বেই তারা বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে জাপান বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতায় অপারগ হয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বুঝতে পারে ইউরোপ ও আমেরিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। ফলে জাপান সরকার বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য বহু ছাত্রকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে এবং এসকল ছাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও জ্ঞান অর্জন করে জাপানে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁরা জাপানে শিল্পবিজ্ঞানের কার্যকর ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলে। এসব ছাত্র জাপানে শিল্প স্কুল, কলেজ ও কারখানা স্থাপন করে সেখানে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে। অন্যান্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্য দেখে যা সবচেয়ে সহজসাধ্য, অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে অল্প অর্থে পরিচালনা করে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব, সেই নতুন পদ্ধতি জাপানিরা গ্রহণ করে।

বিভিন্ন দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এনে জাপানিরা তাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। অন্যান্য দেশের মতো জাপান আমদানি ও রপ্তানি সমানভাবে করছে। যে দেশের ভূমির ৮২%-এর উপর পাহাড়, সেখানে অবশিষ্ট স্থানে খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সঙ্কুলান করা যায় না। কারখানা পরিচালনার জন্য

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানের তুলা, পশম ও চামড়া ইত্যাদি কাঁচামাল প্রয়োজন এবং এসব জাপান আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। জাপানের কোনো অধিবাসী অবসরে সময় নষ্ট করে না। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, ‘জাপানে এমন লোক অতি বিরল, যিনি ঘরে বসিয়া শুধু অন্ন ধ্বংস করেন। সকলেই কিছু-না-কিছু করিতেছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই (বিশেষত শহরের) কোনো-না-কোনো বিষয়ের একটি ছোটখাট করাখানা অছে (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৫৭)।’ জাপানের জনসংখ্যার ৬০% কৃষিকার্যে, ৩৫% শিল্পবাণিজ্যে এবং অবশিষ্ট ৫% অন্যান্য কাজে লিপ্ত।

শান্তা দেবী তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন যে, পাশ্চাত্য জাপানি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কারণ হিসেবে মনে করে যে, জাপানি কারিগর অল্প বেতনে সন্তুষ্ট। জাপানিরা প্রথম অতি ক্ষুদ্র একটা কারখান স্থাপনা করে এবং পরে তা ক্রমান্বয়ে বড় করে তোলে। জাপান সরকার নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। পরে শিল্প ও কারখানার আয় থেকে সরকারের ঋণ পরিশোধ করা হয় (শান্তা, ১৩৪৫ ২৬৫)।

জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য দ্রুত অগ্রগতি সাধন করছিল। যদুনাথ সরকার জাপান সরকারের প্রকাশনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং এর ফলে তিনি সরকারের অনেক তথ্য অবগত হন। তিনি দেখিয়েছেন ১৮৮৪-৯৪ সালে যে পরিমাণ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে, ১৮৯৪-১৯০০ সালের মধ্যে তার ৯০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সকল দ্রব্য আমেরিকাতেই বেশি প্রেরিত হয়েছে। ফলে আমদানি কমে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। সরকারি বিবরণী অনুযায়ী ১৮৭৪-১৮৮৪ সালে জাপান আমেরিকায় ৮৮ গুণ এবং ১৮৯৪-১৯০৪ সালে ১৩৫ গুণ দ্রব্য রপ্তানি করেছে। শিল্প ও বাণিজ্যে জাপান ক্রমশ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে, আর জাপানিদের জীবনের মান উন্নত ও দ্রব্যাদির দাম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে।

উনিশ শতকে জাপানের বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন দ্রব্য আমেরিকাতেই বেশি রপ্তানি করা হয়েছিল। জাপান থেকে প্রধানত রেশম, রেশমি বস্ত্র, কার্পেট, মাদুর, চীনামাটির বাসন, বার্নিশের জিনিস, ছাতা, চা, কয়লা, মাছ, মাছের তেল, পাখা, কাগজ, মদ, অসুধ, সুতা, শিঙের তৈরি দ্রব্য, তামাক (সিগারেট), পাট, লতা, বেতের জিনিস, দেশলাই, তামা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য, কর্পুর, পেন্সিল এবং সাবান আমেরিকা-সহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে।

আধুনিক যুগে শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতির জন্য অনেক পূর্বশর্ত থাকে, যেমন, বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়ক, বিদ্যুৎ, ব্যাংক, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, অবকাঠামো ও পরিকাঠামো, শিল্প-শিক্ষার সূযোগ, অর্থ, যন্ত্রপাতি, স্থান, কাঁচামাল, প্রতিষ্ঠান, শিল্পোদ্যোগ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি। ১৮৬৫ সালে জাপানে মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্বে তেমন কিছুই ছিল না। এসব পূর্বশর্ত গড়ে ওঠে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৭২ সালে ইয়াকোহামা থেকে টোকিও পর্যন্ত ১৮ মাইল রেললাইন বসে এবং ৩০ বছরের মধ্যে সরকারি রেল লাইনের পরিমাপ দাঁড়ায় ১০৫৯ মাইল এবং বেসরকারি রেললাইন হয় ২৯৬৬ মাইল অর্থাৎ মোট রেললাইনের পরিমাপ দাঁড়ায় ৪০২৫ মাইল। ১৮৮৪ সালে জাপানে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং ১৮৯০ সালে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০টি। জাপানিরা বুদ্ধিমান জাতি। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা মাথায় রেখে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে তাদের জাহাজের সংখ্যা ৫,৪১৫টিতে উন্নীত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সকল জাহাজ ক্রমে অত্যাধুনিক আকারে তৈরি করা হয়।

পরিব্রাজক (ছদ্মনাম) এর বর্ণনা অনুযায়ী, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতিকল্পে যে সকল বন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন, তার সবই জাপান সরকার করে। সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আর্টস্কুল, আর্টকলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। প্রতি বছর বহু ছাত্রছাত্রী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাপান সরকার কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত হয় (পরিব্রাজক : ১৩৯-৪০)।

যদুনাথ বলেছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে জাপানিদের মুনশিয়ানা অতুলনীয়। পূর্বে জাপানিরা একমাত্র শিন্তো ধর্ম পালন করতো। শিন্তো ধর্মাবলম্বীরা প্রকৃতিকে দেবী ও সম্রাটকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদের মধ্যে দেখা যেতো অতুলনীয় আনন্দ। তখন মেয়েরা শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করতো। যদুনাথ সরকার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> জাপানী মেয়েরা রেশমি এবং সূতিকাপড়ের, কাগজের এবং কাঠের পাতলা পাতের যে লতা-পাতা এবং ফুল রচনা করেন, তাহা প্রাকৃতিক লতা-পাতা এবং ফুলের অবিকল অনুরূপ। কার্য্যতঃ অনেক সময় আমরা স্বাভাবিক ফুল মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি। আমেরিকা এবং ইউরোপের সৌখীন মেয়েরা জাপানী রেশমি-ফুল সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কবরীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৬১)।

যদুনাথ বলেছেন অনুকরণে বিশেষ দক্ষ জাপানিরা। বিশ্বের কোনো স্থানে নতুন  কিছু বের হলে অবিকল তাই নিজেদের দেশে তৈরি করে। এমনকি অনেক জিনিস বিদেশের দ্রব্য হলেও দেশি ও বিদেশি একাকার করে ফেলছে। জাপানিদের ঘরে ঘরে কারখানা। জাপানের কোনো কোনো স্থান টোকিও-এর চেয়েও বেশি কারবারি। ওসাকাকে লোকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে মানচেস্টার বলে জানে। অন্যান্য দেশের মতো জাপানের বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ এবং পাওয়া যায়। যেমন—

| স্থান | দ্রব্য |
|---|---|

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| নাগানো | রেশমের কেন্দ্র-স্থল |
| নাগোইয়া | বস্ত্রবয়ন ও ঘড়ি তৈরি |
| সাকাই | রাগকম্বল, টুপি, চিকিৎসার দ্রব্যাদি ও লোহার জিনিস |
| হোক্কাইদো | কয়লা, কেরোসিন ও খনিজ দ্রব্যাদি |

সারণি: ৩
প্রসিদ্ধ দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান

সূত্র :যদুনাথ সরকার, ১৩১৩ : ৪৬১-৬২

ব্যাবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব সময় দুই পক্ষের মধ্যে আদান ও প্রদান অপরিহার্য, কেননা পৃথিবীর কোনো দেশই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জাপান কেবল বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করে না, শিল্পের প্রয়োজনে আমদানিও করে। ১৮৬৮ সালে জাপানে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এই দেশ শিল্প, ব্যাবসা ও বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। ক্রমে জাপানের আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে জাপান যে সকল কাঁচামাল আমদানি করে তার ৭৭ ভাগের ২০.২০ ভাগ ইংল্যান্ড থেকে, ১৯ ভাগ ভারত থেকে, ১৫.৭০ ভাগ আমেরিকা থেকে, ১৪.৮০ ভাগ চীন থেকে এবং ৭.৭০ জার্মানি থেকে। অবশিষ্ট ২৩ ভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অনেকের মনে হতে পারে যে, ভারত থেকে যা আমদানি করা হয়, তা প্রায় ইংল্যান্ডের সমান এবং ভারতের তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে তাঁদের উচ্চ ধারণা জন্মাতে পারে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। ভারত থেকে কেবল কাঁচামাল আমদানি করা হয়। যেমন চাল, চামড়া, নীল, পাট, শন, মোম ও কাঠ।

অন্যান্য দেশ থেকে জাপান চাল, ডাল, কেরোসিন, ময়দা, চিনি, তুলা, স্টিল ও লোহার বিভিন্ন কল-কব্জা, কেরোসিন, পশমি কাপড়, চামড়া, ঘড়ি, নীল ও মদ ইত্যাদি এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করে কেরোসিন, ময়দা, তুলা, চামড়া ও সুতি কাপড় ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের চেয়ে জাপান আমেরিকাতেই বেশি শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

*Dhaka University Institutional Repository*

যদুনাথ আরো বলেছেন যে, ১৯০৫ সালে জাপান আমেরিকায় যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করে তাহলো রেশম, রেশমি বস্ত্র, চা, মাদুর, চীনা মাটির বাসন, কর্পুর, খড়ের বুনান জিনিস, কাঠ ও বেতের জিনিস, কাগজ, গন্ধক, দাঁতের ব্রাশ, পাখা, চাল ইত্যাদি। জাপান থেকে অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয় রেশম, রেশমি বস্ত্র, কার্পেট, মাদুর, চীনা মাটির বাসন, বার্নিশের জিনিস, ছাতা, চা, কয়লা, মাছ ও মাছের তেল, পাখা, কাগজ, মদ, অসুধ, সুতা, শিঙের দ্রব্যজাত, তামাক (সিগারেট), কাঠ, লতা, বেতের জিনিস, দেশলাই, তামা নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্য, কর্পুর, পেন্সিল ও সাবান। উল্লেখ্য, জাপানের শিল্প ও কারখানার প্রায় সবই বেসরকারি। কেবল লবণ, মদ ও তামাকের রপ্তানি সরকারের নিজের হাতে। সরকার শিল্পে উৎসাহ প্রদান ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য শুল্কমুক্ত রপ্তানির ব্যবস্থা করেছে। তবে সকল প্রকার আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা হয়।

জাপানের রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ নিচের আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যাবে। বস্ত্রবয়ন বিষয়ে যদুনাথ বলেছেন যে:

বস্ত্রবয়ন : সুতি ও রেশমি বস্ত্রবয়নে জাপানিরা অতি অল্প সময়ে লক্ষণীয় কৃতিত্ব লাভ করে যার দৃষ্টান্ত বিরল। বিদেশ থেকে সুতা এনে তারা বস্ত্রবয়ন করতো। জাপান শীত প্রধান দেশ এবং সেখানে সুতা উৎপাদন অসম্ভব। ১৮৭৭ সালে জাপান সরকার সুতা কাটার কল স্থাপন করে সুতা আমদানির জন্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে। ১৮৮৭ সালে জাপানে ৬,৩২,৫২৯.৪ পাউন্ড সুতা বিদেশ থেকে আমদানি করে। ১৮৯৫ সালে সুতা আমদানি বেড়ে ১৯,৬০,০০০০ পাউন্ড হয়। অন্যদিকে জাপানের বহুসংখ্যক সুতা কাটার কল স্থাপন করা হয়। ক্রমে জাপানে সুতা আমদানি হ্রাস পেয়ে জাপান থেকে সুতা রপ্তানি শুরু হয়। তখন কোরিয়া ও চীনে জাপানিরা প্রচুর সুতা রপ্তানি করে। ১৮৯৪ সালে জাপানে ৫৯টি সুতা কাটার কল স্থাপন করা হয় এবং ১৮৯৬ সালে সেখানে সুতা কাটার কল বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭টি হয়। এভাবে প্রতি বছরই সুতা কাটার কল বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৫ সালে জাপানে ত্রিশ হাজার মহিলা ও দশ হাজার পুরুষ শ্রমিক কলের সাহায্যে বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত ছিলেন। নিজস্ব তাঁতে কত লোক বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত ছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন। এই সময় আমেরিকার জাতীয় শিল্পসমিতির প্রধান থিওডোর সি. চার্চ জাপানের বস্ত্রবয়ন সম্পর্কে বলেন, জাপানের প্রতি ঘরেই তাঁত রয়েছে, সেখান নারী ও পুরুষ সকলেই দিনরাত বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত। জাপানিরাই সময়ের সঠিক মূল্য অনুধাবন করেছেন। কোনো কোনো কারখানায় ২৪ ঘণ্টাই কাজ হয় এবং কোনো কোনো করাখানায় ২০-২২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টার নিচে কোনো কল চলে না। সেখানে গড়ে ২২.৩০ ঘণ্টা কাজ চলে।

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৯০ সালে জাপানে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকার বস্ত্র তৈরি হয় এবং ৮ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে এই বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩ কোটি টাকার উপর। বলা যায় ৮ বছরের মধ্যে জাপানে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। কেবল ১৯০১ সালে জাপানে সুতা কাটার জন্য ৬৩,০০০ শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই সুতিবস্ত্র জাপান চীন, ফরমোজা ও কোরিয়ায় রপ্তানি করেছিল। রেশম সম্পর্কে যদুনাথ বলেছেন যে:

রেশম : জাপানের রেশমের ইতিহাস খুবই বিচিত্র। ১৮৬৫ সালে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্বে জাপান বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। জিন ব্যাপটাইজ টেভার্নিয়ার (১৬০৫-?), বাংলায় সতের শতকে ফরাসি পর্যটক, উল্লেখ করেছেন যে, সতের শতকের মাঝামাঝি জাপান ওলন্দাজদের মাধমে মুর্শীদাবাদ থেকে রেশম সংগ্রহ করতো (Lewis, 1914 : 22)।[১৩] যদিও জাপানি রেশমও যথেষ্ট উন্নত মানের ছিল। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে প্রতি বছর প্রচুর রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাপানের কৃষি ও শিল্প বিভাগের বিবরণী থেকে জানা যায় সেখানে ২, ৪১৮টি রেশমি সুতা কাটার-সহ মোট ৪ হাজারের উপর রেশমের কারখানা ছিল। ১৮৮০ সালে জাপান ১৬,৫৯,৭৭৪৬ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করেছিল, ১৮৯৫ সালে এই রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬,৩৬,২৬৬০ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৫ সালে জাপান আমেরিকায় কেবল ৪৮,০০,০০০ টাকার রেশমি বস্ত্র রপ্তানি করেছিল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক্রমে জাপানে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে রেশমের আবাদও বেড়ে গিয়েছিল।

১৮৭২ সালে কার্বন্ট ইউরি ও প্রিন্স ইওকুরা একত্রে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সব জায়গায় রেশমি রুমালের ব্যবহার দেখতে পান। জাপানে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা রেশমি রুমালের উৎপাদন বাড়িয়ে দেন। ১৮৯৫ সালে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে জাপান কেবল ৮০,০৯, ৯৩৪ টাকার রুমালই রপ্তানি করে।

রসিকলাল গুপ্ত কম্বল সম্পর্কে বলেছেন যে, কম্বল তৈরি করার মতো প্রয়োজনীয় উপাদান জাপানে সহজ লভ্য ছিল না। তাই অস্ট্রেলিয়া থেকে পশম আমদানি করে জাপানিরা প্রথম লুই কম্বল ও পশম নির্মিত শীত বস্ত্র বয়ন করে (রসিকলাল, ১৩১১ : ৬৯)। ১৮৩১ সালে জাপানের মেকাই নামক স্থানে ফুজিমোজে ছোজা এমোম্ জাপানে সর্বপ্রথম কম্বল প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীরা কৃতিত্বের সঙ্গে বিশাল কারবার পরিচালনা করেন। বহুদিন শীত প্রধান জাপানে এই

---

১৩. Lewis Sydney Steward O'malley, *Bengal District Gazetteers, Murshidabad*, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1914, p. 22.

*Dhaka University Institutional Repository*

কম্বল শীতের হাত থেকে জাপানিদের রক্ষা করে। ১৮৮৯ সালে জাপান ৩৭,৫০০ টাকার কম্বল রপ্তানি করে এবং মাত্র ছয় বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে এই কম্বল রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬,৫০,০০০ টাকা। জাপানের কম্বল তুলা, পশম ও মোটা রেশমের দ্বারা প্রস্তুত হয়।

শান্তা দেবী মাদুর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, জাপানের মাদুরের সৌন্দর্য খুবই চিত্তাকর্ষক। তখন জাপানে চেয়ার, টেবিল, খাট ও পালঙ্কের তেমন প্রচলন ছিল না। জাপানে ভূমিকম্পের ঘটনা খুব বেশি, এজন্যই সেখানকার অধিকাংশ গৃহ কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। ঘরের মেঝেতে কাঠের পাটাতন থাকে। সাধারণত মেঝের কাঠের পাটাতনের উপর এই মাদুর বিছানো হয়। অতিথি-অভ্যাগত সকলেই জুতা গৃহের বাইরে রেখে এই মাদুরের উপর বসেন। ফলে জাপানে মাদুরের প্রচলন খুব বেশি। মাদুর প্রস্তুতের কারখানা হলো ওসাকায়। ১৮৮৫ সালে মাত্র ১৪০০ টাকার মাদুর জাপান থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৮৯৪ সালে সমগ্র জাপানে ১,৭৮১টি মাদুর প্রস্তুতের কারখানা ছিল। ১৮৯৫ সালে ৫২ লাখ টাকার মাদুর বিদেশ রপ্তানি হয়। ১৯০৪ সালে কেবল আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার মাদুর রপ্তানি করা হয়েছিল (শান্তা, ১৩৪৫ : ৩৪৬)।

খনিজ পদার্থ ও দেশলাই সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, জাপান সরকারের প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী খনিজ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেক যুবককে প্রতি বছর বিদেশে পাঠানো হয়। জাপানে টিনের কাজ আরম্ভ হলে প্রথমে বিদেশ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত দু'জন প্রকৌশলীকে খনিজ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দু'জন প্রকৌশলী দুর্ঘটনায় মারা গেলে সরকার তাঁদের পরিবারবর্গের সংসারযাত্রা নির্বাহের সকল ব্যবস্থা করে। হোক্কাইদো দ্বীপ হলো খনির আকর কেন্দ্র। এখানে কয়লা ও কেরোসিন প্রধান আকরিক পদার্থ। হোক্কাইদোতে সোনা ও রূপার খনিও আছে। জাপানে ৫৭টি রূপা, ১৩৬টি তামা ও রূপা (মিশ্রিত) ও অনেক মিশ্রিত ধাতুর খনি রয়েছে। ১৮৯৪ সালে ২৩,৬৯৬ আউন্স, ১৮৯৫ সালে ২১,০০০ আউন্স সোনা উত্তোলন করা হয়। অনুরূপভাবে ১৮৯৪ সালে ১৯,৫৬,৯৩৮ আউন্স এবং ১৮৯৫ সালে ১৭,৬৮,২৫০ আউন্স রূপা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া ছয়টি তামার খনি থেকে প্রতি বছর গড়ে ২৬,০০,০০০০ পাউন্ড তামা উত্তোলন করা হয়।

১৮১২ সালে দেশলাই আবিষ্কার করা হয়। ১৮২৭ সালে ব্রিটিশ রসায়নবিদ জন ওয়াকার উন্নতমানের দেশলাই উদ্ভাবন করেন এবং এর পরে দেশলাই প্রস্তুতবিদ্যা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপান ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে দেশলাই বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কোবে, হিউগো ও টোকিও দেশলাই প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। কোনো কোনো দেশলাই কোম্পানিতে ১,৫০০ জন শ্রমিক পর্যন্ত কাজ করেন। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'বৈদেশিক বণিকেরা

Dhaka University Institutional Repository

কারবারের জন্য ওসাকার নাগোইয়া স্ট্রীটকে লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল, নিউয়র্কের বাউয়ারী এবং লিভারপুলের স্কট্‌ল্যান্ড রোডের ন্যায় বর্ণন করিয়া থাকেন (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৬৮)।

যাহোক, ১৮৮৪ সালে ৪,১৮৮ টাকার দেশলাই জাপান থেকে রপ্তানি হয়। কিন্তু এক দশকের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে জাপান ৭০,০৯,২১৮ টাকার দেশলাই রপ্তানি করে। জাপানের দেশলাই রপ্তানি উনিশ শতকে ক্রমবর্ধমান ছিল।

যদুনাথ সরকার মদ ও কাগজ সম্পর্কে বলেছেন যে,হোক্কাইদোর সাপোরের মদ জাপানে বিখ্যাত। প্রতি বছর বহু টাকার জাপানি মদ বিদেশে রপ্তানি হয়। জাপানিরা জাতি হিসেবে খুবই পানাসক্ত। কিন্তু বিদেশি মদের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। জাপানের কাগজ খুবই উৎকৃষ্ট মানের। আমেরিকার বণিক সমিতির প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জাপানের কাগজ ইউরোপ ও আমেরিকার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট মানের, কেননা এই কাগজ মসৃণ ও টেকসই। জাপানের মিৎসুমাতা, কোজো ও পাম্পি নামে তিন প্রকার কাগজ গাছের ছাল দিয়ে তৈরি করা হয়। জাপানের যে সকল ক্ষেত্র অনুর্বর, বালুকায়ও পাথুরে এবং সে সকল স্থানে অন্য কোনো শস্য জন্মে না, সেখানে এই তিন প্রকার গাছের প্রচুর আবাদ করা হয়। জাপানে চার প্রকার কাগজ তৈরি ও ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, জাপানে অনেকটা চামড়ার মতো কাগজ তৈরি করা হয় এবং এই কাগজ বাক্সের উপরে, নিচে ও চারদিকে লাগালে বাক্স খুব শক্ত ও টেকসই হয়। শীত-প্রধান জাপানে এই কাগজ ঘরের দেয়ালে ও মেঝেতে লাগানো হয়। দ্বিতীয়ত, জাপানের এক প্রকার কাগজ তৈরি হয়—যা কিছুটা তৈলাক্ত। এই কাগজ দিয়ে লন্ঠন ও ছাতা (জাপানি ভাষায় খাচা) প্রস্তুত করা হয়। তৃতীয়ত, জাপানে ধনী লোকের জন্য বা বিদেশে রপ্তানির জন্য অত্যন্ত শক্ত ও সাদা কাগজ প্রস্তুত করা হয়। শেষত, অন্যান্য দেশের মতো জাপানে তুলা বা সংবাদপত্রের কাগজ দিয়ে এক প্রকার কাগজ তৈরি করা হয়। প্রতি বছর আমেরিকা ও ইউরোপে অনেক টাকার কাগজ রপ্তানি করা হয়(যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৭০)।

চীনা লন্ঠন এমন যাতে সামান্য আলো থাকে আর বাকি সবটা কাগজে আবৃত। জাপানিরা তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য এই লন্ঠন ব্যবহার করতো, এখনও করে। উনিশ শতকে রাস্তা ঘাট, খাবারের ও অন্যান্য দোকান, এমনকি ঘোড়ার গাড়িতেও এই লন্ঠন ব্যবহার করা হতো। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে রাস্তায় জাপানিরা মিছিল করতো, যা জাপানি ভাষায় ‘চ্যোচিন’ নামে পরিচিত। জাপানিরা সকলেই একটা করে কাগজ নির্মিত লন্ঠন নিয়ে ‘লন্ঠন মিছিল’ করতো। জাপানিদের নির্মিত কাগজের রুমাল, কার্ড, পর্দা, লন্ঠন ও খেলনা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর রপ্তানি হতো। জাপানি কাগজ কোমল, মসৃণ, টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু দাম খুব কম বলে সহজেই আন্তর্জানিক বাজার দখল করে। ১৮৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সালে জাপান আমেরিকায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার কাগজ রপ্তানি করে। উন্নত কাগজ প্রস্তুতের জন্য জাপান নতুন কাগজের কল উদ্ভাবন করতে বাধ্য হয়।

যদুনাথ বার্নিশ, চীনামাটি ও কাঁচের দ্রব্যাদি বিষয়ে এই তথ্য দিয়েছেন যে, জাপানি বার্নিশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা বিখ্যাত। ইংরেজিতে 'জাপান' শব্দের অর্থ 'বার্নিশ' বিশেষ। যদিও জাপানের নাম জাপানি ভাষায় 'নিপ্পন', বিদেশি ব্যবসায়ীরা জাপানের নাম দিয়েছেন বার্নিশ। বাঙালি এদেশকে জাপান বলেই জানে, কিন্তু জাপানিরা তাঁদের দেশকে নিপ্পন বা নিহন বলে উচ্চারণ করে। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে জাপানে ৪৪০টি বার্নিশের কারখানা ছিল। কাঠের জিনিস জাপানে সুলভ ও সুন্দর। যে সকল পার্বত্য অঞ্চলে শস্য ও ফল উৎপাদিত হয় না, সেখানে অতীব যত্ন সহকারে বিবিধ ব্যবহার উপযোগী বৃক্ষ রোপন করা হয়। জাপানের কৃষি কলেজে বন-বিভাগ রয়েছে এবং বন-বিভাগের বেশকিছু কর্মচারী আমেরিকায় সরকারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাপানে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ রয়েছে বলে জাপানিরা দেশলাই, পেন্সিল, চেয়ার ও টেবিল ইত্যাদি আসবাবে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। ভূমিকম্পের জন্য জাপানের প্রায় সকল বাড়ি কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হতো। এক সময় জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের ৯৮% বাড়ি কাঠের ছিল। সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের জন্য সেখানে ব্যাপকভাবে বার্নিশ ব্যবহার করা হতো।

জাপানের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট শহরের নাম 'শেতো'। এই শহরে সর্বপ্রথম চীনা মাটির বাসন প্রস্তুত হয়। এজন্য জাপানি ভাষায় চীনামাটির নাম 'শেতোমনো'। এখানে চীনামাটির ব্যবহার খুব বেশি হয় বলে বিদেশি সাংবাদিক লিখেন যে, শেতো শহরের সকল বাড়িই যেন এক একটা ছোট-খাট কারখানা। ১৮৯৪ সালে জাপান ৪৮,০৫,৭৩৩ টাকার চীনামাটির বাসনপত্র বিদেশে রপ্তানি করেছিল। কাঁচের জিনিস প্রস্ততকরণে জাপান যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাপান কাঁচের বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করে। বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করে উন্নততর কাঁচের সামগ্রী তেরি করার প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বদেশে জাপানিরা কাঁচের জিনিসের উৎকর্ষ সাধন করেছে।

যদুনাথ সরকার বাঁশ ও বেতের দ্রব্যাদিবিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, জাপানে বিভিন্ন রকম বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। ফলে সেখানে বাঁশ ও বেতের অতি সুন্দর বাক্স তৈরি হয়—যা স্টিল্ট্রাঙ্ক ও

Dhaka University Institutional Repository

গ্লাডস্টোন ব্যাগকেও হার মানায়। এজন্য বিদেশে এই বাঁশ ও বেতের চাহিদা প্রচুর এবং জাপান এই বাঁশ ও বেতের বহু বাক্স বিদেশে রপ্তানি করে অনেক অর্থ আয় করতে সমর্থ হয়। জাপানিরা বাঁশ ও বেতের মাধ্যমে ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা গাড়ি প্রস্তুত করছে—যা দেখতে বিলাতি গাড়ির মতো, অথচ মূল্য খুবই কম। জাপানের অভ্যন্তরে এই গাড়ির চাহিদা প্রচুর(যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৭১)।

সূচ-সুতা থেকে রেল, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ ইত্যাদি যা সভ্য জাতির জন্য একান্ত আবশ্যক, তার সবকিছুই জাপানে তৈরি হচ্ছে। সামরিক সম্ভার হিসেবে বন্দুক, গোলা, কামান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সবকিছু জাপানে তৈরি হয়। জাপানে পাহাড় বেশি ও সেই পাহাড় থেকে দ্রুতবেগে চলে আসা জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রপেলার সংযোগে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। জাপানের প্রায় সর্বত্র টেলিফোন পাওয়া যায়। জাপান চিকিৎসা ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা ব্যবহার করে। জার্মান চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ঔষধ কোরিয়া ও চীনে জাপান প্রচুর রপ্তানি করে (যদুনাথ, ১৩১৩ : ৪৭৩)।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাপানে নানারকম কোম্পানি খোলা হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে ২৯৬৭টি কোম্পানি ছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২৯৪। তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

সারণি: ৪

১৮৯৯ সালে জাপানে বিভিন্ন শিল্প ও বানিজ্যিক কোম্পানির সংখ্যা

| কোম্পানি | সংখ্যা |
|---|---|
| কৃষি বিভাগ | ১৭৬ |
| শিল্প | ২২৫৩ |
| বাণিজ্য | ২৭২২ |
| ওপ্তানি | ৫১০ |
| ব্যাংক | ২১০৫ |
| রেলওয়ে | ৭৩ |

সূত্র : যদুনাথ সরকার, ১৩১৩ : ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য বিবরণী থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাপানিদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই বেতন বৃদ্ধির হার ছিল নিম্নরূপ—

সারণি: ৫
উনিশ শতকের শেষার্ধে জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির হার

| পেশা | বছর | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৮৯৫ | ১৮৯৬ | ১৮৯৭ | ১৮৯৮ | ১৮৯৯ | |
| কাঠের মিস্ত্রী | ৫৫.০ | ৫৭.৫ | ৬১.৫ | ৫৭.৫ | ৭৩.৫ | ৮২.৫ |
| রাজমিস্ত্রী | ৭৫.০ | ৯১.০ | ৭৬.০ | ৫৫.০ | ৪৪.০ | ১৫৫.০ |
| অন্যান্য আসবাব প্রস্তুতকারী | ৪৭.৫ | ৬৫.০ | ৫৭.৫ | ৬২.৫ | ৭৩.৫ | ৯০.০ |
| জুতা প্রস্তুতকারী | ৮০.০ | ৬০.০ | ৬০.০ | ৫০.০ | ৬৮.৮ | ১২০.০ |
| বিদেশি পোষাক প্রস্তুতকারী | ৮২.৫ | ৭৬.০ | ৬২.৫ | ৭০.০ | ৭১.০ | ৮৫.০ |
| লোহার কর্মকার | ৫০.০ | ৫০.০ | ৫০.০ | ৫০.০ | ৬২.০ | ৬৫.০ |
| ল্যাকার বার্নিশকারী | ৭৫.০ | ৮০.০ | ৭৫.০ | ৫০.০ | ৬৯.০ | ৮১.৭ |
| প্রেসের কম্পোজিটর | ৫০.০ | ৫০.০ | ৫০.০ | ৪২.০ | ৪৯.২ | ৫৭.৫ |
| কুলি (মুটে) | ৩৭.৫ | ৩৫.৫ | ৩৮.০ | ৩৭.৫ | ৪৬.৯ | ৫০.০ |

সূত্র : wkí I ewYR¨ weeiYx, টোকিও, ১৮৯৫-১৮৯৯

উল্লেখ্য উপর্যুক্ত অর্থ বিভিন্ন বিভাগের সুদক্ষ কর্মচারীরা প্রতিদিন আয় করেছিল। এই বিবরণীতে আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বছরে বৈষম্য লক্ষ করা যায়। উৎপাদন ও চাহিদার তারতম্যের কারণে আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বছরে বৈষম্য হয়।

যদুনাথ সরকার এর বর্ণনা অনুযায়ী বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারত ও জাপানের সঙ্গে 'ইন্দো-জাপানীজ এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। জাপানিরা সুচতুর এবং তাদের পরামর্শে ইন্দো-জাপানীজ এসোসিয়েশন-এর অর্থে একজন জাপানি ব্যবসায়ীকে ভারতে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে জাপানের বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। ফলে ১৯০৪ সালে 'ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি' গঠিত হয়। এই কোম্পানির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ:

১. ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানির প্রধান কার্যালয় হবে জাপানের টোকিও শহরে

Dhaka University Institutional Repository

২. সেখানে একটি বাণিজ্যিক জাদুঘর নির্মিত হবে

৩. এই বাণিজ্যিক জাদুঘরে ভারতীয় খনিজ ও কৃষিজ দ্রব্যাদির নমুনা সংরক্ষিত হবে ও মূল্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে এবং

৪. ভারতে কোন কোন জাপানি শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করা যেতে পারে সে সবের নমুনা ও বিবরণ সংরক্ষণ করা হবে।

ইন্দো-জাপানিজ এসোসিয়েশন ও ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি অতি সহজেই ভারতের তদানীন্তন শাসক ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেননা এরূপ সংগঠন ব্রিটিশ সরকারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যিক লাভের সম্ভাবনার ঈঙ্গিতবহ ছিল। ভারত থেকে জাপানে খনিজ ও কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করা হলে ব্রিটিশ সরকার নিয়মানুযায়ী রপ্তানি শুল্ক পাবে। অনুরূপভাবে জাপানি শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে আমদানি করা হলে ব্রিটিশ সরকার আমদানি শুল্ক পাবে। উভয়দিক থেকেই ব্রিটিশ সরকার লাভের সম্ভাবনা দেখে সংগঠন দু'টিকে অবাধে কার্যকলাপ পরিচালনার সুযোগ দেয়। কিন্তু পরিণতি লক্ষ করে জাপান থেকে শিল্পশিক্ষা শেষে স্বদেশে আগত যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> দেখিতে দেখিতে জাপানী পণ্য ক্রমেই আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। দলে দলে জাপানী বণিক ভারতে আসিয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিয়েছে। এমনকি রাজপুতনার এ সুদূর মরুভূমি প্রদেশেও উহাদের হাত এড়াইবার যো নাই। ইয়োকোহামা ও কোবে বন্দরে অনেকগুলি ভারতীয় বণিক আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালাইতেন। কিন্তু আজকাল জাপানীরা স্বয়ং ভারতে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান পর্য্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করায় আমাদের বণিকেরা ফেল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই কয়েকটি করিয়া কোম্পানী ফেল হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। আমি কলিকতার বাজারে জাপানী পণ্যকে স্বদেশী জিনিসের ন্যায় গণ্য করিয়া আগ্রহের সহিত অনেককে ক্রয় করিতে দেখিয়াছি (যদুনাথ, ১৩১৯ : ৪৩৫)।

'জাপানী কাপড় ও বিলাতী' শিরোনামে cevmx পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে এই অবস্থার কুড়ি বছর পর ঐতিহাসিক মহামন্দা শুরু হবার প্রারম্ভে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বিশ শতকের ত্রিশ দশকের ঐতিহাসিক মহামন্দা প্রায় সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে মারত্মক প্রভাব বয়ে আনে। আমেরিকায় ১৯২৯ সালে এই মহামন্দা শুরু হয়। ফলে অনেক দেশে মুদ্রার মান মারাত্মকভাবে কমে যায়। ১৯৩২ সালে ভারতে জাপানি ইয়েনের দর অনেক কমে যাওয়ায় ভারতের বাজারে জাপানি বস্ত্র সস্তা হয়ে যায়। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশ সরকার জাপানি বস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার স্বার্থে ইংল্যান্ডের বস্ত্র ব্যতীত অন্য সকল দেশের বস্ত্র আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করে। ১৯৩১ সালে cewmx সাময়িকপত্রে 'জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড়' শিরোনামে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য প্রকাশিত হয়—

> জাপানী মুদ্রা ইয়েনের দর খুব কমিয়া যাওয়ায় জাপানী কাপড় ভারতবর্ষের বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে। অতএব ভারতীয় কাপড়কে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার অজুহাতে গভর্নমেন্ট বিলাতী ছাড়া আর সব বিদেশি কাপড়ের উপর খুব বেশী শুল্ক বসাইয়া ইংরেজ তাঁতীদের খুব সুবিধা করিয়া দিলেন। যেন বিলাতী কাপড় ভারতীয় কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না! জাপানী কাচের জিনিষ, জাপানী মোজা, জাপানী সুতা প্রভৃতির উপর কেন শুল্ক বসান হইল না? এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কিছু করুন বা নাই করুন আমাদের সকলেরই দেশী বস্ত্র ও যাবতীয় দেশী জিনিষ ব্যবহার করা উচিৎ (জাপানী, ১৩৩৯: ৮৯৬)।

বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ রয়েছে। ১৯০৪ সালে যখন ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি গঠিত হয়েছিল তখন ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার তেমন স্ফূরণ ঘটেনি এবং ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি-র মধ্যে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দেখেছিল। কিন্তু যখন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্রোত প্রবাহমান, তখন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা না করে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অব্যাহত রাখে।

যদুনাথ সরকার রেল ও ট্রাম বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯১২ সালে জাপানে মোটর গাড়ির প্রচলন হয়নি। জনগণ তখন গুটি কয়েক ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা ও ট্রাম ব্যবহার করতো। অতি স্বচ্ছল ব্যক্তি বা পরিবার কয়েকটি কারণে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিল। সে কারণগুলো হলো— (১) জাপান একটি পর্বতাকীর্ণ দেশ; এমনকি শহরের মধ্যেও ছোট ছোট পাহাড়। (২) জনবহুল শহরে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার সময়ের অপব্যবহার। (৩) জাপানের বিভিন্ন বড় শহরে ট্রাম গাড়ির সংখ্যা ও ট্রাম গাড়ির লাইন অনেক বেশি। লোকজন কম খরচে ও অল্প সময়ে, অতি সহজে শহরের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে পারে। (৪) জাপানে ট্রামে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সকলেই সমান সুবিধা পায়। (৫) জাপানিরা ঘোড়ার গাড়ি ও মোটর গাড়ি রেখে অর্থের অপব্যয় করতে চায় না; বরং তারা সেই অর্থ দিয়ে ছোট খাট কারখানা তৈরি করতে আগ্রহী। (৬) জাপানে তুলনামূলকভাবে ঘোড়া অত্যল্প। তাই জাপানিরা ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে গরু ও ঘোড়া আমদানি করে(যদুনাথ, ১৩১৯ : ৪৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের গ্রামে ও শহরে রিক্সা এবং সাইকেল রয়েছে। জাপানিরা রিক্সাকে 'জিন্-রিক্সা' বলে। 'রিক্সা' ইংরেজি শব্দ এবং 'জিন্' জাপানি শব্দ। 'জিন্' শব্দের অর্থ 'মানুষ', অর্থাৎ মানুষ-চালিত দু'চাকার গাড়িই হলো 'রিক্সা'।

এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এই সুন্দর একখানা কেদারার ন্যায় স্প্রিং আঁটা মকমলে মোড়ান দ্বিচক্র শকট। রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য ইহাতে তৈলবস্ত্রের আবরণের বন্দবস্ত আছে। বড় লোকের রিকশার চক্র রবারে মোড়ান; রাস্তায় লোককে সতর্ক করিতে বেল (ঘণ্টা) লাগানও থাকে। একজন লোক একজন আরোহীকে এবং স্থলবিশেষে দুইজন আরোহীকেও রিকশায় বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়। বড়লোকের রিকশা একজনের পরিবর্তে দুইজনে টানিয়া লইয়া যায়। সংকীর্ণ রাস্তায় কিম্বা গ্রামের ভিতরে রিকশায় যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা। সাধারণ রকমের একখানা রিকশার মূল্য ৬০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা (যদুনাথ, ১৩১৯ : ১১৩২)।

১৮৮৮ সালে জাপানে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হয়। কোজু থেকে হাকোনে পর্যন্ত ৮ মাইল এই ট্রাম চলে। তবে ১৯০২ সাল পর্যন্ত জাপানে ঘোড়ার ট্রামের প্রচলন ছিল। ১৯০০ সালের মধ্যে টোকিও শহরে বহুসংখ্যক ট্রাম লাইন স্থাপন করা হয়। ১৯০৫ সালে জাপানে ১১টি ট্রাম কোম্পানি ছিল। এগুলোর মধ্যে ৩টি ছিল টোকিও শহরে। জাপানের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এত ট্রাম কোম্পানির অবস্থান অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বিবেচনায় ১৯০৭ সালে ৩টি কোম্পানি একত্রিত হয়ে একটি বড় কোম্পানি গঠন করে। এটির মূলধন ছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা।

যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন দেশের ও নিজেদের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীরা কার্যকরীভাবে ঐক্যবদ্ধ। ১৯১২ সালে টোকিও-র মতো বড়ো শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে টিকিটের মূল্য ছিল মাত্র ১ আনা। ট্রাম পরিবর্তন করলেও কোনো অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হতো না। ট্রাম মাত্র ১ মিনিট বিরতির পরেই ছেড়ে যেতো। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> অথচ প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত গাড়িতে সব্বদাই লোকারণ্য। সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থাও আমাদের চেয়ে স্বচ্ছল, তাছাড়া প্রত্যেকেই সময়ের মূল্য জানে বলিয়া ট্রামে যথেষ্ট লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। শীতকালে প্রাতঃকাল ৮টার পূর্ব্বে এবং অন্যান্য ঋতুতে ৭টার পূর্ব্বে কুলি, মজর, অফিসবাবু, ছাত্র শিক্ষক প্রভৃতি সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য অর্দ্ধমূল্যে ফেরৎ টিকেট (রিটার্ন টিকেট) দেওয়া হয়।ট্রাম গাড়িতে একটি মাত্র শ্রেণি।

Dhaka University Institutional Repository

> গাড়ি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মকমল আঁটা। ইতর, ভদ্র, ধনী দরিদ্র, লর্ড, মজুর সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া সানন্দে যাতায়াত করে (যদুনাথ, ১৩১৯ : ১১৩৩)।

জাপানে ট্রাম কোম্পানি চালক ও টিকেট-বিক্রেতার বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য এমন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহার, আলো ও তাপ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের যাত্রীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার ও বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হয়। সেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণের পর জাপানি তরুণ চাকরি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা বাধ্যতামূলক নয়। জাপানি তরুণেরা অতি ভদ্র এবং তাদের শিষ্ঠাচার সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। কোনো ট্রাম যাত্রীর কাছে টিকেট না থাকলে সে ব্যক্তির সম্মুখে অভিবাদন করে তাকে টিকেট দিয়ে থাকে এবং যথাযোগ্য মূল্য নিয়ে পুনরায় অভিবাদন ও ধন্যবাদ দিয়ে স্বস্থানে চলে যায়।ট্রামে ওঠা ও নামার জন্য যাত্রীদের বিভিন্ন পরামর্শ যত্ন সহকারে দেওয়া হয় ও যাত্রী সুরক্ষার প্রতি সকল সময় রেলকর্মীরা অতি সতর্ক ও বিনীত থাকেন। তারা সব সময় নম্র ব্যবহারে অভ্যস্ত।

পি.সি. সরকারতার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৭২ সালে জাপানে সর্বপ্রথম টোকিও থেকে ইয়োকোহামা পর্যন্ত সরকারিভাবে রেললাইন খোলা হয়। ইতোপূর্বে ১৫ থেকে ২০ মাইল ছোট বৈদ্যুতিক রেললাইন চলে। দশ বছরে কেবল ১১৪ মাইল রাস্তায় রেলপথ খোলা হয়। ১৮৮৩ সালে একটি কোম্পানি প্রাইভেট রেলপথ স্থাপন করতে আরম্ভ করে। ক্রমে জাপানে রেল কোম্পানির সংখ্যা চব্বিশে পরিণত হয়। ১৮৯৯ সালে সরকার ৮৩২ মাইল ও ২৮০৬ মাইল ব্যক্তিগত রেলপথ স্থাপিত হয়। ১৯০৪ সালে সরকার ১৬৬০ মাইল ও ৪৮৮৯ মাইল ব্যক্তিগত রেলপথ হয়। এই রেলপথে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি ছিল। জাপানের মধ্যবিত্ত লোকজন দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যবহার করে (পি.সি. সরকার, ১৩৪৫ : ৬৯-৭০)।পর্বতাকীর্ণ জাপানে বড় লাইন খোলা সম্ভব নয়। যাহোক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বসার আসন স্প্রিংয়ে আঁটা ও মখমলে মোড়ান এবং তৃতীয় শ্রেণির বসার আসন মাদুরে মোড়া। ট্রেনে খাবার, শয়নাগার ও শৌচাগার রয়েছে। শয়নাগার ব্যবহারের জন্য কিছু অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। ময়লা ও আবর্জনা ফেলার জন্য পৃথক ধাতব পাত্র রয়েছে।

ট্রেনে জাপানিরা উঠেই পার্শ্ববর্তী আরোহীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আলোচনা আরম্ভ করেন।[১৪] যাহোক, জাপানের ট্রেন যাত্রীদের কোনো মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেলে তা ফেরৎ পান। কেননা সকল ট্রেনে 'হারানো ও প্রাপ্তির' সরকারি সাহায্যের অফিস রয়েছে। জাপানের রেলে ভ্রমণের সময় অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। রেলে ভ্রমণের বিষয়ে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> জাপানের রেলপথে যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভোগ করা যায় এরূপ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। আমাদের ট্রেন কোথাও প্রশান্ত মহাসাগরের ধার দিয়া, কোথাও মহাসাগরের সিকি মাইল বা অর্দ্ধ মাইল জলের উপর দিয়া, কোথাও পাহাড় শ্রেণী ভেদ করিয়া, কোথাও বা পাহাড়ের তলবর্তী সুরঙ্গ পথের ভিতর দিয়া আবার কোথাও বা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। আমি আগ্রহের সহিত স্বভাবের সে বিচিত্রতা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রকৃতির এও মনোরম দৃশ্যই বন্ধুর মনে অশান্তি ও উদ্বেগের অনেকটা লাঘব করিয়া দিল (যদুনাথ, ১৩১৯ : ১১৩৬)।

জাপানের প্রত্যেকটি ট্রেন স্টেশনে বসার সুবন্দোবস্ত রয়েছে; রয়েছে জাপানি ও ইংরেজি সংবাদপত্র। অধিকাংশ ট্রেন স্টেশনে খাবার পাওয়া যায়। অধিকাংশ ট্রেন স্টেশনে হাত-মুখ পরিষ্কারের জন্য রয়েছে সাবান, তোয়ালে ও গরম জল-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। শীতকালে জলের বাস্পের মাধ্যমে ট্রেনগুলো গরম রাখা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাপানের ট্রেনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এরূপ ব্যবস্থা সমকালীন বিশ্বে অভাবনীয় ছিল।

জাপানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে তুরস্কের লিডিয়া, লেবানন বা ফিনিশিয়া, চীন গ্রিস ও ব্যাবিলনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের মন্দির গ্রাহকদের মধ্যে লেনদেন ইতাদি ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে আমেরিকায়। জাপানে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাস মধ্যযুগ থেকে পাওয়া যায়, যখন কোনো ব্যক্তি বা সঙ্ঘবদ্ধ একদল ধনী ব্যক্তি ব্যাংকের কাজ চালাতেন। সে সময় এটি কোনো কঠিন ব্যবস্থা ছিল না। তখন সরকার ও জমিদারকে ঋণ দেওয়াই ছিল ব্যাংকের প্রধান কাজ। জাপানের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকে উৎসাহিত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮৬৯ সালে জাপানে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসান ও মেইজি রাজপরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার সম্প্রদায়ের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়। এসময় বাণিজ্যিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ব্যাবসাকেন্দ্রে কিছু ব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাবসা-কেন্দ্রে গড়ে ওঠে। ১৮৭০ সালে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'এক্সচেঞ্জ কোম্পানি'।

নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জীতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত †'k-we‡'‡ki e¨v¼ শীর্ষক গ্রন্থে জাপানি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ১৮৭২ সালে আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করে জাপান সরকার জাতীয় ব্যাংকিং বিধি ঘোষণা করে। ১৮৭৩ সালে পূর্বতন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে—যার 'টাকা' বা 'নোট' তৈরির ক্ষমতা ছিল। কালক্রমে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রত্যেক ন্যাশনাল ব্যাংককে নোট বের করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৮৭৬ সালে জাপান সরকার ঘোষণা করে যে, কোনো ব্যাংকই তার নোটের বিনিময়ে নগদ টাকা সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে না। এই নিরাপদ ও লাভজনক ব্যাবসার সুযোগে বহু ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রচুর নোটও মুদ্রিত হতে থাকে। জাপান সরকারও 'নোট' মুদ্রণ করতে থাকে। বেপরোয়াভাবে নোট মুদ্রণের ফলে অর্থ বাজারে মুদ্রাস্ফিতি ঘটে। ফলে ১৭৮৯ সালে জাপান সরকার এমন আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয় যাতে বলা হয় আর কোনো ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবে না বা কোনো 'নোট' মুদ্রিত হবে না (নরেন্দ্রনাথ ও জীতেন্দ্রনাথ, ১৯৩০: ৫৬)।

তারা আরো উল্লেখ করেন যে, ১৮৮২ সালে জার্মানির 'রাইখস্' ব্যাংকের আদর্শে ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৮৮৩ সালে এক সম্পূর্ণ পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ১৮৭২ সালে প্রবর্তিত 'ন্যাশনাল ব্যাংকিং রেগুলেশন' সংশোধন করে বলা হয় ন্যাশনাল ব্যাংকগুলো আর কোনো নতুন নোট বের করতে পারবে না। অন্যদিকে সরকারি অনুমোদন নিয়ে যে সকল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো সাধারণ ব্যাংকে পরিণত হবে। এরপর শুধু ব্যাংক অব জাপানই নোট বের করতে পারবে। ১৮৮৫ সালে এক সম্পূর্ণ পৃথক আইনের মাধ্যমে ব্যাংক অব জাপানের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া করে নেওয়া হয়। ১৮৮৬ সালে জাপানের ব্যাংক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যখন জাপান সরকার নোটের পরিবর্তে টাকা দিতে আরম্ভ করে এবং বাজারের সকল নোট চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, মধ্যযুগে ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের যে কয়েকটি এসময় টিকে ছিল ১৮৯০ ও ১৮৯৩ সালে প্রবর্তিত আইন দু'টির ফলে সে সকল ব্যাংকের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়(নরেন্দ্রনাথ ও জীতেন্দ্রনাথ, ১৯৩০: ৫৮)।

ত্রিশ বছরের অধিক সময় জাপানের ব্যাংক ব্যবস্থা এভাবে চলার পর ১৯২৬ সালে সরকার দেশীয় ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের লক্ষ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯২৭ সালে সরকার ১৮৭০ সালের ব্যাকিং রেগুলেশনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। ফলে ব্যাংক অব জাপান ব্যতীত জাপানে তিন ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা থাকে। যেমন, (ক) সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংক (খ) সেভিংস ব্যাংক ও (গ) ব্যাংক অব জাপান।

এরপর বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে সরকার নতুন নিয়ম চালু করে। জাপানে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সেই ব্যাংকের মূলধন দশ লক্ষ ইয়েন হওয়া অত্যাবশ্যক। টোকিও বা ওসাকা শহরে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সেই ব্যাংকের মূলধন কুড়ি লক্ষ ইয়েন হতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক ব্যাংকই যৌথ-কারবার প্রণালিতে চলতে বাধ্য। তবে মফস্বলে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে সরকার একটু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। সেখানে এই নিয়ম চালু করে যে, যেখানে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে সেখানকার জনসংখ্যা দশ হাজারের কম হলে ঐ মফস্বল ব্যাংকের মূলধন পাঁচ লক্ষ ইয়েন হলে চলবে। কিন্তু এই মফস্বলে ব্যাংক কোনো শাখা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

এছাড়া আরো কিছু নিয়ম করা হয়। যেমন, (১) প্রত্যেক ব্যাংকের বার্ষিক লভ্যাংশের দশ ভাগের এক ভাগ আলাদাভাবে তার রিজার্ভ তহবিলে রাখতে হবে, যতদিন সেই অর্থ ঐ ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণের সমান না হয়; (২) বছরে দু'বার ব্যাংকের হিসাব নিরীক্ষা; (৩) বছর শেষ হবার একমাস পূর্বে ব্যাংকের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রণয়ন; (৪) ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত এবং (৫) এই ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব ব্যাংকের পরিচালকদের স্বাক্ষর-সহ পত্রিকায় প্রকাশ ইত্যাদি। জাপানে এই ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ১৯২২ সালে ছিল ১,৭৯৯; ১৯২৬ সালে ১,৫০০ ও ১৯২৭ সালে ১,২৭৬টি। ব্যাংকের সংখ্যা কমে যায়, কারণ অনেক ব্যাংকের একসঙ্গে উপস্থিতি লাভজনক ছিল না। ফলে কিছু ব্যাংক একত্রিত হয়ে একটা বড় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বিদেশি ব্যাংকের শাখা জাপানে ছিল, তবে তা আইন ও সরকারের নিয়মে ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সরকার সব সময় লক্ষ রাখতো বিদেশি ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের ফলে জাপানের দেশিয় ব্যাংকের যেনো কোনো ক্ষতি না হয়। তবে বিদেশি ব্যাংকের শাখা জাপানে সরকার এই সকল ব্যাংকের পূর্বতন কার্যকলাপ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে অনুমোদন দিতো। জাপানে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকের শাখা জাপানের অন্যত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের কাছে ১ লক্ষ ইয়েন সিকিউরিটি হিসেবে জমা রাখতে হতো।

১৮৯৩ সালে জাপানে সর্বপ্রথম সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে এক সংস্কার আইনের মাধ্যমে এই ব্যাংককে যৌথ মালিকানাধীন হতে বাধ্য করা হয় এবং এদের মূলধন কমপক্ষে ৫ লক্ষ ইয়েন ও সরকারের পূর্বানুমতি-সহ ও বিশেষ নিয়মের অধীনে আনা হয়। জাপানের সেভিংস ব্যাংকে সাধারণত মধ্যবিত্ত জনগণের সঞ্চয়ের টাকাই রাখা হয়। ফলে এ সকল সেভিংস ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পর্কে সরকার সবসময় সচেতন থাকে।

১৮৭৫ সালে জাপানে সর্বপ্রথম পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানে পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক-এর আদর্শের উপর ভিত্তি করে। এসকল ব্যাংক জাপানের পরিবহণ বিভাগের অধীন ছিল। প্রথমে খুব কম অর্থ জমা দিলেই জাপানের পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক-এ হিসাব খোলা যেতো। তখন কোনো আমানতকারী সর্বোচ্চ দু'হাজার ইয়েন পোস্টাল সেভিংস ব্যাংকে জমা রাখতে পারতেন। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সরকারি বন্ড ক্রয় বা অন্যত্র পাঠাতে চান তবে জাপানের পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক দু'হাজারের বেশি ইয়েন জমা নিতে

*Dhaka University Institutional Repository*

পারে। ১৯০৬ সালে এ ব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে সরকারের খাজনা আদায়, পেনশন-বণ্টন ও বন্ডের সুদ-বিতরণ প্রভৃতি কাজ পোস্টাল সেভিংস ব্যাংকগুলোই পরিচালনার সুযোগ পায়।

শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে জড়িত। ১৮৯৫ সালে জাপানে ব্যাংক ছিল ৯৫০টি এবং ১৮৯৯ সালে ব্যাংক হয় ২১৫০টি। জাপানি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্পেশাল ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এই বিশেষ ব্যাংক বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র পায় এবং সেজন্য তারা অসাধারণ ক্ষমতাও ভোগ করে। তবে এই ব্যাংকের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সরকারের কড়া অনুশাসন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের পরিচালক সরকার মনোনীত করে। এই স্পেশাল ব্যাংকগুলোর কার্যাবলির উপর ভিত্তি করেই জাপানের কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে এবং এজন্য এদের কার্যকলাপও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ক্ষিতিনাথ সুর উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৭২ সালে এক কমিশনের মাধ্যমে আমেরিকার আদর্শে ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার অনুধাবণ করে যে, একটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক না থাকলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিরাপদ নয়। জাপানের ব্যাংক অব জাপান 'ব্যাংকের ব্যাংক', যেমন বিভিন্ন ব্যাংক জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে, তেমনই ব্যাংক অব জাপানের কাজ হলো জাপানের সকল ব্যাংককে সহায়তা করা। ব্যাংক অব জাপানের পরিচালক সরকার নিয়োগ করে থাকে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ (ক্ষিতিনাথ, ১৩৩৮ : ৭৯২)।

ক্ষিতিনাথ সুরকলকারখানায় নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, জাপানি শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। পৃথিবীর মধ্যে জাপান সবচেয়ে উন্নত মানের ও বিপুল পরিমাণের সিল্ক উৎপাদনকারী দেশ। সিল্কের কাজে মেয়েরাই লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করে। ১৯৩১ সালে ্রeিPÎv সাময়িকপত্রে ক্ষিতিনাথ সুর বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্যে 'আধুনিক জাপানের সমাজ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। জাপানের গৃহ-শিল্পের সকল কাজ মেয়েরাই করে থাকে। সেখানকার কল-কারখানায় মেয়েদের লক্ষণীয় ভূমিকা রয়েছে। শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ৬০-৮০% নারী। শিল্পে নারী শ্রমিক সম্পর্কে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি বিদেশি লেখকদের রচনার ওপর নির্ভর করেন। ক্ষিতিনাথ সুর দু'জন ইংরেজ লেখকের গ্রন্থের সাহায্যে নারী শ্রমিকদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরেছেন। এদের একজন হলেন হ্যারল্ড মঙ্ক ভিনাকে, যিনি জাপানের বিশ্ববিদ্যালের দু'বছর অধ্যাপনার কাজ করেছেন। AvaybK 'i-cv‡P¨i BwZnvm গ্রন্থটি ১৯২৯ সালে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয় (Harold, 1929: 53)।অন্য গ্রন্থটির লেখক জন ইনগ্রাম ব্রায়ান (১৮৬৮-১৯৫৩), তিনি পেশায় একজন পর্যটক ও সাংবাদিক। জাপানের রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখিত

Dhaka University Institutional Repository

ইনগ্রাম ব্রায়ানের গ্রন্থটি দশ বছরের মধ্যে ষোলবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ক্ষিতিনাথ সুর জানান, শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ৮০ জন বালিকা। এই মেয়েদের দূরের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়। ভারতের চা-বাগানের নারী শ্রমিকদের মতো। শিল্পে কাজ করার জন্য দূরের পল্লী থেকে দালালেরা মেয়েদের প্রলুব্ধ করতে সতত তৎপর থাকতো। ভীষণ ঘৃণ্য পরিবেশে মেয়েদের বসবাস করতে বাধ্য করা হতো। এই বিভীষিকাময় পরিবেশে মেয়েদের রাখাকে অন্যায় বলে গণ্য করা হয় না।

হ্যারল্ড মঙ্ক ভিনাকের বই থেকে অনুবাদ করে ক্ষিতিনাথ সুর লিখেছেন—

> কোন স্ত্রী-শ্রমজীবী কারখানায় উপস্থিত হইলে যাহাতে সে পলায়ন না করিতে পারে সেজন্য তালাবন্ধ ঘেরা বাড়ির মধ্যে তাহাকে আটকাইয়া রাখা হয়। শয়নের জন্য মাত্র একটি করিয়া মাদুর দেওয়া হয় এবং সেখানে সম্ভ্রম বা লজ্জাশীলতা রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। যেখানে রাত্রি দিন কাজ চলে, সেখানে একই বিছানা দিবারাত্র ব্যবহার হয়। খুব দীর্ঘ সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া চিত্ত-বিনোদন বা আমোদ-প্রমোদের কোনো ব্যবস্থা থাকিলেও অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ কেহ তাহা ভোগ করিতে পারে না। এই রকম অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে ও বাস করিতে হয় বলিয়া শ্রমজীবীদের মধ্যে যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। তাহাদের নৈতিক অবস্থাও ভালো নয় (ক্ষিতিনাথ, ১৩৩৮ : ৭৯২)।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে জাপানি শিল্প-কারখানায় নারীর এই অবস্থা ছিল খুবই বিব্রতকর ও দুঃখজনক। জন ইনগ্রাম ব্রায়ানের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জাপানি শিল্প-কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের অর্ধেক প্রতি বছর তাদের সতীত্ব হারাতো। শিল্প-কারখানায় প্রধান আনন্দদায়ক বিষয় ছিল মদ্যপান, জুয়া খেলা ও যৌনসুখভোগ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিলার্ড ফিলমোর (১৮০০-১৮৭৪) জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য আমেরিকার নৌ-বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মচারি ও বিচক্ষণ কূটনীতিক ম্যাথু কলব্রেইথ পেরিকে জাপানে পাঠান। পেরি ১৮৫৩ সালের ৮ই জুলাই চারটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে টোকিও পৌঁছে জাপানের সম্রাটের কাছে আমেরিকার বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বমূলক চুক্তির প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু জাপান সরকার পেরির আমন্ত্রণে সাড়া না-দেওয়ায় তিনি চীনের দিকে অভিগমন করেন। পেরি ১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরো শক্তিশালী রণতরি নিয়ে আবার টোকিও পৌঁছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সালের ৩১শে মার্চ আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে বলা হয়, ঝঞ্ঝাতড়িত হয়ে আমেরিকার কোনো জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেই জাহাজের নাবিকেরা জাপানে মানবিক কারণে আশ্রয় পাবে এবং আমেরিকা জাপান থেকে কয়লা ক্রয় করতে পারবে। একই সঙ্গে আমেরিকা জাপানের সিমোডা ও হাকোদা বাণিজ্যিক বন্দরে বাণিজ্য চালাতে পারবে। এভাবে জাপান আমেরিকাসহ

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। ক্রমে জাপান উপলব্ধি করে যে, আমেরিকা ও পাশ্চাত্য উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অনেক অগ্রসর। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে চারটি পাহাড়-বহুল দ্বীপ নিয়ে গঠিত জাপানে সম্পদ একেবারেই ছিল না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। ফলে জাপানিদের বাণিজ্যিক জীবনে আমদানি ও রপ্তানি প্রায় সমান্তরাল গতিতে চলে।

এই পটভূমিকায় জাপান স্বদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জোয়ারে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সামিল হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে জাপানিদের তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই স্বদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ হলো বিদেশে দলে দলে জাপানি ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণ করে সেখানকার উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা। অনুকরণ-প্রিয় জাপানিরা তাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য থেকে সংগৃহীত উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিজেদের প্রযুক্তিগত কৌশলে নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে।

জাপানিরা ভালোভাবেই অনুধাবন করে যে কেবল কৃষির মাধ্যমে টেকসই উন্নতি সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিল্পের অগ্রগতি। এই কারণে জাপান শিল্পে উন্নতির জন্য অগ্রসর হয়। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে জাপানি শিক্ষার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিগুণ উৎসাহে অনেক উন্নত মানের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে জাপান হয়ে যায় আন্তর্জাতিক মানের দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানির দেশ। এক্ষেত্রে জাপান সরকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থাপন করা হয় শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়, আর্টস্কুল, আর্টকলেজ, সাধারণ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, নারীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি ও চেম্বার্স অব কমার্স ইত্যাদি। প্রচলন করা করা উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার। এভাবে জাপান বিশ্বে উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করে এবং আবির্ভূত হয় শিল্প ও অর্থে সমৃদ্ধ এক নব্য-জাপান হিসেবে।

তথ্যনির্দেশ

ক্ষিতিনাথ সুর (১৩৩৮), 'আধুনিক জাপানের সমাজ', wewPÎv, জ্যৈষ্ঠ

'জাপানের ব্যবসায় বৃদ্ধি' (১৩৩২), cevmx, জ্যৈষ্ঠ

যদুনাথ সরকার (১৩১৩), 'জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য', fviZx, ভাদ্র

যদুনাথ সরকার(১৩১৭), 'জাপানের সহর', fviZx, ৩৪ বর্ষ, অষ্টম সংখা, অগ্রহায়ণ

যদুনাথ সরকার(১৩১৮), 'জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি', fviZx, বৈশাখ

Dhaka University Institutional Repository

যদুনাথ সরকার(১৩১৯), ‘জাপানের রেল ও ট্রাম’, fviZx, ফাল্গুন, কলিকাতা

যদুনাথ সরকার(১৩১৯), ‘ভারতের সহিত জাপানের সম্বন্ধ’, fviZx, ৩৬ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ

‘জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড়’(১৩৩৯), বিবিধ প্রসঙ্গ, cevmx, আশ্বিন

মন্মথনাথ ঘোষ(১৩২০), ‘জাপানের ধর্ম্ম’, gvbmx, জ্যৈষ্ঠ

নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জীতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯৩০), দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক, কলকাতা

পরিব্রাজক, জাপানের পত্র, mwnZ¨, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

পি. সি. সরকার (১৩৪৫), ‘জাপানের সংবাদপত্রবাহী কবুতর’, ceËK, জ্যৈষ্ঠ

পি.সি. সরকার (১৩৪৫), জাপানের পথে, fviZel, আষাঢ়

cevmx(১৩৩০), বৈশাখ,কলিকাতা

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯৩), wek‡Kvl, প্রথম খণ্ড, রাহুতা, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩২৬), Rvcvb-hvÎx, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

রসিকলাল গুপ্ত (১৩১১), ‘জাপান সম্বন্ধে ক-একটি কথা’, দ্বিতীয় প্রস্তাব, evÜe, জ্যৈষ্ঠ

শান্তা দেবী(১৩৪৫), ‘জাপান ভ্রমণ’, cevmx, বৈশাখ

সরোজনলিনী দত্ত (১৯২৮), Rvcv‡b e½bvix, কলিকাতা

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (১৯৯২), e½mwnZ¨wfavb, তৃতীয় খণ্ড,কলিকাতা

Lewis Sydney Steward O'malley (1914), *Bengal District Gazetteers, Murshidabad*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta

P. Ebrey, A, Walthall and J. Palias (2006), *Modern East Asia: A Cultural, Social, & Political History*, New York

Samuel Mossman (1880), *Japan*, Sampson Low, London

## চতুর্থ অধ্যায়

# জাপানের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সততই পরিবর্তনশীল। মানুষ নিয়েই গঠিত হয় সমাজ। জাপানে জাতিগত, ধর্মগত বা ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো সমাজের অস্তিত্ব নেই। জাপানের সমাজ পরিবারভিত্তিক জাতীয় সমাজ। জাপানি ভাষা জেনে, জাপানের শিল্পবিদ্যালয়ে পড়ে ও সে দেশে দীর্ঘদিন বাস করার অভিজ্ঞতা থেকে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> এখানকার সমাজ জাতীয় সমাজ। সকলেই এক প্রাণ, এক-মন। জাপানীদের সহিত বিশেষ মিশিয়া দেখিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই যেন রাজনীতি', যোদ্ধা, এবং শিল্পবাণিজ্য বিশারদ। এমন কোনো বিষয় নাই, যাহার কিছু-না-কিছু জাপানী গাড়োয়ানগুলি পর্য্যন্ত না জানে। ইহাদের রীতি, নীতি, আচারপদ্ধতি বাস্তবিক আমাদের অনুকরণীয়। মন প্রাণ সমপ্পূর্ণ এক না করিতে পারিলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি জাতীয় শক্তির বিকাশ হইতে পারে না (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০০)।

জাপানের সমাজ দুর্বল ও ভঙ্গুর নয়। স্বয়ং জাপান-সম্রাট এই সমাজের সমাজপতি। জাপানের জনগণ সম্রাটের অনুসারী। একটি অভিন্ন পরিবারের সদস্যদের মতো জাপানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে একসূত্রে আবদ্ধ। দেশটি তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও মহাপ্রতাপশালী সুবিশাল রাশিয়াকে কম্পমান করে তুলেছিল। সেই বিজয়ের মাধ্যমে যে প্রখর ও অমিত তেজ জাপান প্রদর্শন করেছিল তার অনুপ্রেরণা এসেছিল সামাজিক ঐক্য থেকে।

সমাজ সম্বন্ধে জাপানিদের চিন্তার বিশেষত্ব সুপ্রসিদ্ধ লেখক ড. ইনাজো নিতোবে (১৮৬২-১৯৩৩)-এর e⁄k‡'v শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ড. ইনাজো নিতোবে ব্যতীত সুনেতমো ইয়ামাতো (১৬৩৯-১৭১৯) n⁄vRvK‡i গ্রন্থের সঙ্গে *Bushido: The Soul of Japan* গ্রন্থটি রচনা করেন। বুশিদো হলো সামুরাইদের ক্ষাত্র ধর্ম—যা তাঁদের জীবন-যাত্রায় পরিচিত। ড. ইনাজো নিতোবে ১৮৯৯ সালে ইংরেজি ভাষায় e⁄k‡'v গ্রন্থ রচনা করেন—যা আমেরিকার পেনসেলভেনিয়া থেকে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন ইংরেজিতেই ছিল, জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। যখন জাপান মধ্যযুগের আবিলতা মুক্ত হয়ে ঐতিহ্যিক জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে আধুনিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন ড. ইনাজো নিতোবে জাপান জাতির মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। এই অনুসন্ধানের প্রাপ্তি হলো ড. ইনাজো নিতোবের জাপান জাতির মধ্যে চিরতরে নিজের স্থায়ী স্থান পাওয়া। ড. ইনাজো নিতোবে জাপান জাতির মধ্যে পরিচিত হলেন। ড. ইনাজো নিতোবে তাঁর e⁄k‡'vকে পরিচিত করেছেন জাপান জাতির সমাজ বন্ধনের মূল ভিত্তি হিসেবে। যার মূল কথা হলো স্বদেশ প্রেম ও স্বদেশ-বৎসলতা। সমাজ সম্বন্ধে এক স্থানে ড. ইনাজো নিতোবে বলেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> To us, the country is more than land and soil, from which to mine gold or to reap grain—itis sacred abode of Gods, the spirits of our forefathers (Inazo, 1969: 53-54).

'বুশিদো'-এর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে আটটি মানবীয় গুণ, যেমন—সততা বা ঋজুতা, সাহসিকতা, হিত সাধনের সংকল্প, শিষ্টাচার, আন্তরিকতা, সম্মান, আনুগত্যতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। ড. ইনাজো নিতোবে 'বুশিদো'কে জাপানের দেশীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে জাপানের নিজস্ব ধর্ম 'শিন্তো', চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াসের (৫৫১?-৪৭৯? খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) নৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে 'বুশিদো'র অঙ্কুর বিদ্যমান। এর আরো গভীর ও আরো অতীতে যেতে হলে রোমানদের মধ্যযুগীয় বীরব্রত ও হোমার লিখিত সুপ্রাচীন গ্রিসের কাব্যদ্বয় BwjqW ও IwWwm-র সামাজিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয় (J. Frost, 2010: 56-57)।

বিষয় হিসেবে কোনো সমাজই অভিন্ন সত্তা নয়; সমাজের অভ্যন্তরে রয়েছে সে জাতির আচার-বিচার, সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুশাসনের এক মিশ্রিত যৌগিক রসায়ন। সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সব কিছুর অতীত ইতিহাস ও সামাজিক অনুশাসনের আদ্যপ্রান্ত ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন। অনেক আগে জাপানে ভারতের মতো জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন জাপানে জনগণ আটটি সামাজিক শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপে এক শ্রেণির লোক অন্য শ্রেণিতে যোগদান করতে পারতো না। যদুনাথ সরকার লিখেছেন—

> বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যাহারা চর্ম্মের ব্যবসা করিত, তাহারা তাহাদের স্ব-শ্রেণির সমাজেই বদ্ধ থাকিত। সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই পার্থক্যের ভাব বিলুপ্ত হইতে থাকে। আজ কাল আর তেমন ভাব নাই। থাকিলেও পদ-অনুযায়ী বা ব্যাবসানুযায়ী কিঞ্চিৎ ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। সেটুকু না থাকিলে, আবার কোনো জাতির উন্নতি হইতে পারে না। সকলের ভিতর নিয়তই উচ্চ আকাঙক্ষা জাগরূক থাকা চাই। যে জাতির হৃদয়ে বল নাই, তাহাদের বাহ্যিক শক্তিও থাকিতে পারে না (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০১)।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাপানের সকল লোক তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যেমন সম্ভ্রান্ত, সামুরাই বা ক্ষত্রিয় ও সাধারণ। তবে বিশেষ গুণসম্পন্ন হলে যে কেউ সর্বোচ্চ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। তবে জাপানে কোনো উচ্চ পর্যায়ের গুণ ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অজস্র অর্থব্যয়ে কোনো রকম সম্মানীত উপাধি পান না। যে কোনো রকম সম্মানীত উপাধি পাবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত, সম্মানীত

Dhaka University Institutional Repository

ও জনকল্যাণমূলক কাজই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। লক্ষ করার বিষয় যে শুরু থেকেই এই তিন শ্রেণির জাপানিরা স্বদেশের জাতীয় উন্নতিতে কর্মরত ছিল।

ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত, ঠিক সেভাবে জাপানে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত নয়। জাপানের জনগণ অতীতে যে তিনটি উল্লিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, সেগুলোর মধ্যে নিজস্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। যদিও, কালক্রমে এসকল শ্রেণির মধ্যে নিজস্ব প্রথার প্রচলন চিরতরে তিরোহিত হয়। পূর্বে জাপানের সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে পাঁচটি বংশ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এসকল বংশ হলো কুণোএ, কুজো, নিজো, ইচিজো এবং তাকাৎসুকাছা। এই পাঁচটি পরিবারের সঙ্গেই কেবল জাপানের সম্রাট বা মিকাদো পরিবারের যোগাযোগ ও সামাজিক আদান-প্রদান হয়ে থাকে (আর. কিমুরা, ১৩২৯: ২৬৩)।

বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে সামাজিক সম্প্রদায় হিসেবে ৬০৭টি সম্ভ্রান্ত পরিবার, ৪,৩২,১৫৯টি সামুরাই পরিবার এবং ৭৯,১৮,৪৭৪টি সাধারণ পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু কালের গতিতে জাপানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবারের সংখ্যাও লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন পরিবেশে যুদ্ধ-বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক পরিবার সামুরাই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন। অন্যদিকে জ্ঞান ও অর্থ আয়ের মাধ্যমে আবার অনেক পরিবার অভিজাত শ্রেণিভুক্ত হয়। এভাবে জনগণের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার (Social Mobility)সৃষ্টি হয়(যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০১)।

ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম ও কর্নেল টড ভারতের রাজপুতদের শৌর্য ও বীর্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। রাজস্থান ছিল ভারতের রাজপুতদের আদি বাসস্থান। জাপানের সামুরাই জাতির কীর্তি-কাহিনি অনেকটা রাজপুতদের মতো। বাংলার রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তিত ‘কৌলীন্য’ প্রথানুযায়ী ভারতের প্রত্যেক কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে নয়টি গুণ থাকা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। ঠিক তেমনি কতগুলো নির্দিষ্ট গুণ না থাকলে কেউ সামুরাই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো না।

যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> সম্মুখ যুদ্ধে সুনিপুণ ও গুণবান ব্যক্তি অতি সহজেই সামুরাই শ্রেণীর অতি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধণ, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ-প্রকাশ করিয়া থাকে, যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যে আভাষ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জাহাজ ইয়াকোহামা বন্দরে লাগাইতে না লাগাইতেই, নৌকাযোগে গাড়োয়ানেরা আরোহীর প্রত্যাশায় জাহাজে উঠিয়া আমাদের কাছে আকার-ইঙ্গিতে এবং দুই

> একটা ইংরাজী বা জাপানী কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। আমরা তাহাদিগকে কোন জিনিসের জাপানী নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নম্রভাবে তাহার উত্তর দিয়াই জিজ্ঞাসা করিত—'অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, ইহাকে ইংরাজী এবং ভারতীয় ভাষায় কি বলিয়া থাকে।' একটি গাড়োয়ান কিছু ইংরাজী জানিত। সে বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের সহিত অনেক বিষয়ের গল্প করিয়াছিল। কোন জায়গায় যাইতে হইবে, প্রায় প্রত্যেক জাপানীই একখানি ইংরাজী-জাপানী ক্ষুদ্র পকেট-অভিধান, এবং নূতন বিষয় টুকিবার জন্য একখানা ছোট নোটখাতা সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। গাড়োয়ানটী সমস্ত দিনে তাহার নোটখাতায় অনেক বিষয় টুকিয়া লইয়াছিল। সহজ কতকগুলি কথা তখনই মুখস্ত করিয়াছিল। সে দিনের জন্য, সে তাহার উপার্জ্জনের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। সামান্য নিম্ন-শ্রেণির লোক পর্য্যন্ত, শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, বাহিরের বিষয় অবগত হইতে নিতান্ত উৎসুক। এখন দেখিতেছি, আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই আবালবৃদ্ধ ভারতে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। অনেক সময় ভারতসম্বন্ধে এমন কথা ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে, যাহা ভারতবাসী হইয়াও আমরা জানিতে প্রয়াস পাই নাই (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০২)।

জাপানের সামুরাই জাতি সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য লিখেছেন—

> ক্ষাত্রজনোচিত কার্য্য না করিলে, কাপুরুষের ন্যায় জীবনাতিবাহিত না করিয়া, অনেক সামুরাই 'হারিকিরি' অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া পাপজীবনের অবসান করেন; জীবনের মায়ায় বন্দী হইয়া থাকাও ইহারা হেয় মনে করেন। তাই, গত রুশজাপান যুদ্ধে, কোন কোন সৈন্য বন্দী হইবার উপক্রম দেখিবামাত্রই, আত্মহত্যা করিয়া শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০৩)।

সামুরাইদের সমাজ এত মারাত্মকভাবে দৃঢ় হবার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। তবে প্রধান কারণ হলো সামুরাইদের— (ক) রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগ (খ) শিক্ষা-পদ্ধতি বা শিক্ষা প্রণালি (গ) বাণিজ্য-নৈপুণ্য (ঘ) প্রবল জ্ঞান-তৃষা ও অনুসন্ধিৎসা (ঙ) সরলতা ও সহৃদয়তা (চ) পরস্পরের প্রতি সমভাব পোষণ (ছ) উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা (জ) ঐক্য ও একতা (ঝ) কষ্ট-সহিষ্ণুতা (ঞ) স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরশীলতা ও (ট) অধ্যবসায়। এসব বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন।

জাপানিদের মধ্যে জ্ঞান-তৃষা অত্যন্ত প্রবল এবং এ ধরনের প্রবণতা অন্য কোনো জাতির মধ্যে আছে কিনা—তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি জানিয়েছেন যে কলেজে প্রবেশ করার আগে তিনি একটি কারখানায় শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করতেন। এসময় একজন দক্ষ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতবর্ষের

*Dhaka University Institutional Repository*

শক্তি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে যদুনাথ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ভারতীয়দের জাপানি ভাষা শিক্ষক ইংরেজি, রাশিয়ান ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদুনাথ সরকারের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টাও করেছিলেন। যদুনাথ সরকার মনে করেন জাপানের একজন পরিচারিকা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে এত তথ্য জানে যে ভারতের অধিকাংশ মহিলা সেভাবে এত তথ্য জানেন না। জাপানিদের মনে জ্ঞানের স্পৃহা এতই প্রবল যে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তারা দলে দলে বিভিন্ন দেশে যেয়ে শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে অর্জিত জ্ঞান জনগণের মধ্যে বিতরণের সুবন্দোবস্ত করেছেন। এই ব্যবস্থার ফল হলো জাপানের দ্রুত উন্নতি। অভিজাত বংশের কোনো ব্যক্তি নতুন যে কোনো বিষয় সামান্য দরিদ্র লোকের কাছ থেকে জেনে নিতে কোনো দ্বিধা করে না। কিন্তু অধিকাংশ ভারতবাসী নির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বৃথা পরিশ্রম ও অযথা সময় নষ্ট বলে বিবেচনা করে। কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে ভারতবাসী লজ্জিত ও সঙ্কোচ বোধ করে।

মধ্যযুগে যে জাপানি সামুরাইরা রক্ত না দেখে অন্ন গ্রহণ করতো না, আধুনিক সভ্যতার যুগে সেই জাপানিরা নিরতিশয় সরল প্রকৃতির লোক; কুটিলতা বা জটিলতা তাদের মনে সামান্য স্থান করে নিতে পারেনি। প্রাচীনকালে একজন প্রসিদ্ধ কবি লিখেছিলেন, জাপানিদের হৃদয় প্রাতের সাকুরা ফুলের মতো নির্মল ও বিশুদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাকুরা জাপানের একটি অতি প্রিয় ফুল যা কিয়োটোতে এপ্রিল থেকে মে মাসে ফুটে থাকে এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকে (Awazuhara, 2001: 39-51)।

প্রাচীনকালের এই কবির মূল্যবান বাণীটি টোকিও শহরে যাদুঘরে রক্ষিত। যদুনাথ সরকারও জাপানিদের নির্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে টোকিও শহরে বসবাসকারী বিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে কোনো ঝগড়া-কলহ, বাদ-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লক্ষ করা যায়নি। ট্রামে, বাসে, রেলে, হাটে-বাজারে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হলেও জুতা তথা 'গেতা' অর্থাৎ খড়মের শব্দ ব্যতীত আর কোনো কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়নি। জাপানিদের মন ও মানস সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> ইহাদের হৃদয় এমনই ঋজু যে, ক্ষণেকের জন্যও কোন রহস্য বা গোপনীয় বিষয়টী পর্য্যন্ত ইহারা মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিতে পারে না; হঠাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাহির হইয়া পড়ে; অথবা কখন কখন খোলাখুলিই প্রকাশ করিয়া ফেলে। শুনিতে পাই, অন্যের সহিত

Dhaka University Institutional Repository

> মনোমালিন্যে কোনরূপ মনোকষ্ট পাইলে, শত্রুর প্রতিশোধ না লইয়া, জাপানীগণ আত্মহত্যা দ্বারা সে কষ্টের অবসান করে (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০৬)।

জাপানিদের প্রীতি ও সৌজন্য আন্তরিক। যদুনাথ সরকার ও তাঁর এক অসমিয়া বন্ধু তখন হোক্কাইদোর ছাপ্পোরোয় অবস্থিত রাজকীয় কৃষি-বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেলেন, তখন সেখানের বোর্ডিং-এর ও বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দু'টি পৃথক সভা আহ্বান করে তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানায়। কলেজ ক্লাশের সভায়, জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও এই কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক, যিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি সম্পর্কে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, সভাপতি হিসেবে ড. মিইয়ারি বলেছিলেন—

> প্রাচীন সুসভ্য আর্য্যজাতির আবাসভূমি ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রগণ আমাদের কলেজে বিদ্যালাভ করিতে আসিয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। আমাদের শিক্ষায় ইহাদের দেশের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও, আমরা আমদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিব (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০৬)।

যদুনাথ সরকার বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রবন্ধেটোকিওতে এরপর গঠিত হয় 'ওরিয়েন্টাল স্টুডেন্টস্ সোসাইটি' যেখানে জাপান, কোরিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র ছিল। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জাপানিদের ভদ্রতাবোধের পরিচয় নিয়ে অনেক লেখক আলোচনা করেছেন। জাপানে তখন পয়সার অভাবে কোনো ভারতীয় ছাত্র বাস বা ট্রেনের টিকেট দিতে অসমর্থ হলে জাপানি ছাত্র বা কোনো ভদ্রলোক টিকেট কিনে দিতেন, কোনো ছাত্র গন্তব্য স্থান না চিনতে পারলে তাঁকে অবশ্যই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের উন্নত ভদ্রতার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। জাপানি জনগণের মধ্যে সমভাব ছিল সর্বদা বিরাজমান। জাপানি জনগণের একটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, কেউই স্বীকার করতে চান না যে তিনি ধনী, সকলেই মধ্যবিত্ত বলে নিজেকে পরিচিত করতে খুব পছন্দ করেন। জাপানে ধনী দরিদ্রকে, কিংবা বিদ্বান অশিক্ষিতকে পৃথক ভাবতেন না বা কোনো প্রকার অবহেলার ভাবও পোষণ করতেন না। যখন যেখানে যার সঙ্গে দেখা হোক না কেন, পরিচিত হলেই একে অন্যকে অবনতমস্তকে অভিবাদন করতেন। ট্রেন,ট্রাম বা বাস ইত্যাদি পরিবহণে চলাচলের ক্ষেত্রে ধনী, গরিব, মুটে বা মজুর ইতর বা ভদ্র, সম্ভ্রান্ত বা মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছিল না। সকলেই এক বেঞ্চে বসে চলাচল করে, পরিচিত হলে তো কোনো কথাই নেই, এমন ভাব দেখাবেন যেন তাদের মধ্যে প্রগাঢ় ও প্রলম্বিত আতিথেয়তার সামান্য অভাবও নেই। স্থানাভাবে কখনও কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সকলেই একটু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তার জন্য বসার জায়গা করে দেবেন। জাপানিদের মধ্যে উন্নতির কামনা ও বাসনা এতই প্রবল যে তাঁরা অহঙ্কার ও অভিমান বিসর্জন করিয়ে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে মন্ত্রীর ছেলেও বাস বা ট্রামে কলেজে আসেন, তাতে তাঁর সম্মান আদৌ হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়(যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০৭)।

সমাজের শীর্ষে অধিরোহণের জন্য বংশ পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন বিদ্যা ও বুদ্ধির। জনগণের প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা হলো যে-কোন মূল্যে জাপানের উন্নতি সাধন করতে হবে। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে জাপানিদের মধ্যে নবজাগরণের উন্মেষ হয়। স্বদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে অনেকেই দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বিশেষ শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশের আর্থিক উন্নতির প্রয়াসী হয়। অনেকে ব্যবসায়ী হয়, আবার অনেকে সৈনিক হয়। জাপানিরা মনে করে ভালো ও দক্ষ সৈনিক হলে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেনাপতিও হওয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে জাপানি যুবকরা দলেদলে বিদেশে গিয়ে শিল্প-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষিতত্ত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, রেল ও জাহাজ নির্মাণ কৌশল ইত্যাদি শিখে স্বদেশের অনেক মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই জাতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলেই জাপানে আজ লক্ষণীয় যুগান্তর উপস্থিত হয়েছে (চন্দ্রশেখর, ১৯১৯: ৮৩) ।

জাপানিদের চরিত্রের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুণ হলো কষ্ট সহিষ্ণুতা। জাপানের অধিকাংশ স্থানই পাহাড়-পর্বতে আবৃত। মনে করা হয়, ইশ্বর জাপানের আবাস-ভূমি জাপানিদের উপযোগী করেই সৃজন করেছেন। দশ বা বারো বছরের জাপানি মেয়েরা কাঠের খড়ম পায়ে ও পিঠে ছোট ভাই বা বোনকে কাপড়ের সাহায্যে বেঁধে সাত বা আট মাইল হেটে চলে। স্থান বিশেষে অর্থাৎ পাহাড়ের পথে চলতেও তারা ক্লান্ত হয় না। ছোট শিশুরা পর্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। তাদের কান্না বড় একটা শোনা যায় না। কল-কারখানায় পুরুষ ও মহিলা সকলেই বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে প্রবেশ করে। তারা প্রতিদিন পনের ঘণ্টা কাজ করে। জাপানে গৃহপালিত পশু যেমন ঘোড়া, গরু ইত্যাদি অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম, এ কারণে কোনো কোনো সময় মানুষে পশুর কাজ সম্পন্ন করে। এজন্য বিশ শতকের প্রথম দশকে একজন আমেরিকান লেখক তাঁর একটি গ্রন্থে জাপানবাসী ও জাপান সভ্যতাকে পরিহাস করেছিলেন। এখন সেই মার্কিনিরা জাপানিদের শ্রমশীলতাকে একটি প্রধান গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জাপানিরা সকল ক্ষেত্রে এমন এমন কৃতকার্যতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন যে ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে পানামা খাল খননের সময় অনেক জাপানি শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছিল (James, 2010: 67; মন্মথনাথ, ১৯১০: ৯৩)।

ভিক্ষায় সম্মান হ্রাস পায়। বক্তব্যটি ভারতের প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের। জাপানিরা ভিক্ষাবৃত্তিকে অতিমাত্রায় ঘৃণা করে। এ বিষয়ে যদুনাথ সরকার f\iZx সাময়িকপত্রে 'জাপানে ভিক্ষুক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যদুনাথ সরকার জাপানে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> একদিন এক জাপানী কোন ইউরোপীয় প্রবাসীর বাড়িতে ভিক্ষার্থী হইয়া গমন করে। তথায় গৃহস্বামীকে উপস্থিত না পাইয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানা কাগজে আপন অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া চলিয়া আইসে। বারান্তরে গিয়া প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে বলিয়া গৃহস্বামীকে উহা তাঁহার চাকরের কাছে রাখিতে উক্ত আবেদন পত্রেই অনুরোধ করে। বৈদেশিক গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াই টেবিলের উপর ভাঙ্গা ইংরাজীতে লিখিত আবেদনখানি দেখিতে পান। তিনি Rvcvb UvBgm নামক পত্রিকায় বিষয়টী সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। পরদিন তোকিওর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে উহার প্রতিবাদ বাহির হয়। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠেন যদি ঘটনা সত্য হয় তবে ঐ প্রার্থীকে আমরা জাপান জাতির লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। পবিত্র জাপানীর রক্ত উহার ধমণীতে প্রবাহিত হয় না; এমন নীচমনা ব্যক্তি জাপানের ত্যজ্য সন্তান (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৩০)।

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জাপানের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের শেন্‌দাই, মোরিওকা ও আওমোরি নামক তিনটি জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টান পাদরি ও জাপান সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুরাবস্থা তদারকি করতে বের হন। শেন্ দাই জেলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অবস্থা ছিল। কয়েকজন ইউরোপীয় ও আমেরিকান দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রত্যেকের বাড়িতে যান এবং গ্রামের কোনো ব্যক্তির খাদ্যাভাব বেশি সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহে অভাব থাকা স্বত্ত্বেও বলেন যে তাঁদের গৃহে কোনো অভাব নেই। সকলে অভাব ও অনশনের মধ্যে থেকেও সব কিছু গোপন করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বিদেশিরা জাপানিদের এই প্রবণতা দেখে অবাক ও মুগ্ধ হলেন (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৩০)।

জাপানে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের ভাষাতে প্রকাশ করা সঙ্গত—

> সেদিন টোকিও সহরে, ট্রামে উঠিতেই, রাস্তার উপর কয়েকটি পয়সা দেখিতে পাইয়া ভিক্ষুকের জন্য তুলিয়া আনিলাম। কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া খুজিয়াও রাস্তায় একটী ভিক্ষুক দেখিলাম না। অথচ যে সে দরিদ্রকে দিতেও সাহসী হই নাই। কেন না সে অনর্থক অপরের মুদ্রা লইবে কেন? কর্ম্মে অশক্ত বৃদ্ধ কি অন্ধ, অপরের শরীর টিপিয়া অথবা শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া পয়সা লইবে, তবুও সহজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২০৯)।

জাপানে নিঃসহায়, দীন দরিদ্র ও কর্মক্ষম ব্যক্তি অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবন ধারণ করতে অপমান বোধ করে। তারা এক পরিবারভুক্ত হয়েও লজ্জা বোধ করে পরিবারের উপর নির্ভরশীল হতে। জাপানিরা মনে করে যে সক্ষম অবস্থায় সোপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ না করতে পারলে অনেকাংশে

*Dhaka University Institutional Repository*

তা পশু-পাখির মতো জীবন অতিবাহিত করা হয়। জাপানের উত্তরে হোক্কাইদো দ্বীপটি অনেকটা শাখালিন দ্বীপের সন্নিকটে অবস্থিত। জাপানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে শিক্ষিত লোকের হার অনেক বেশি। এই হোক্কাইদো দ্বীপের ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধা কোনো লোকের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন। একদিন এই বৃদ্ধাকে গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্তিকর দেখে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'ওবাসান![১৫] তোমার বয়স অনেক বেশি হয়েছে এবং পরিশ্রম করবার শক্তি ক্রমশঃ কমে আসছে। তোমার আর কে আছে যে জীবনের বাকি কয়টা দিন তাঁর নিকট অবস্থান করতে পারো?' উত্তরে বৃদ্ধা বললেন—

> আমার নিজের খাবার উপায় আছে। তবে আমার কুড়ি বা একুশ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে এবং টোকিওতে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। আর এক বছরের মধ্যেই আমার মেয়ের শিক্ষা শেষ হবে। আমার এখন প্রধান কর্তব্য হলো যে, মেয়েটির শিক্ষা সমাপনান্তে সৎপাত্রে বিয়ে দেওয়া। আর আমি এখনো এত দুর্বল নই যে কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে সাধারণ কাজকর্ম সম্পাদন করে মেয়ের পড়ার খরচ নির্বাহ না করতে পারি (যদুনাথ, ১৩১৭ : ৩১)।

শিক্ষার সঙ্গে আত্মসম্মানের জ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এজন্যই জাপান এত উন্নত ও বিদেশিদের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত। জাপানে পঙ্গু, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ মানুষের সাহায্যের জন্য সরকারি ব্যবস্থা আছে। তবে সাধ্যমত সকলকেই কম বা বেশি কিছু কাজ করতে হয়। জাপানের মফস্বলে একদল মহিলা বাস করেন যারা গান ও বাদ্যের সাহায্যে মানুষের মনোরঞ্জন করে অর্থ আয় করেন। উল্লেখ্য, এই মহিলাদের সকলেই অর্থ দেন না, কেবল যাঁরা তাদের গান ও বাজনা শোনেন তারাই অর্থ সাহায্য করেন।

জাপানি খাদ্য ও পানীয়

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা জাপানিদের চরিত্রের সহজাত অংশ। দীন ও দরিদ্রের কুটির অভ্যন্তরটি যেন একটি চিত্রিত পট। কাজকর্ম সবই পরিষ্কার। প্রত্যেক জাতির খাদ্য ও পানীয় তাদের দেশের প্রাকৃতিক ও ভূসংস্থাপনিক অবস্থার উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে এবং যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সতত পরিবর্তনশীল। শোনা যায় অনেক পূর্বে জাপানিরা গরুর দুধ পান করতো না। কিন্তু এক সময় তারা গরুর দুধ পান করতে শুরু করে। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

যদুনাথ সরকারের তথ্য অনুযায়ী জাপানি শব্দ 'দাইতোকোরো'-র অর্থ হলো রান্নাঘর বা প্রধানঘর। জাপানিদের আহার্য্য সম্পর্কে জানা একটি আকর্ষণীয় বিষয়। অনেকের ধারণা জাপানিরা

---

১৫. জাপানে বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদের 'ওবাসান' বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিরামিষভোজী; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কোনো কোনো লেখক নিরামিষ আহার্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে সংবাদপত্রে লিখে থাকেন যে নিরামিষভোজী জাপানিরা প্রবল পরাক্রান্ত রাশিয়াকে জলে স্থলে পরাভূত করেছে (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৫)। জাপানিদের মতো, অন্য কোনো জাতি, এত কম আহারে পরিতৃপ্ত হয় না। ভাত, দুই বা চার টুকরা সিদ্ধ মূলা বা অন্য কোনো তরকারিতেই তারা সন্তুষ্ট।

> সিদ্ধ ডাল বা দুই এক টুকরা সিদ্ধ বা ভাজা, অথবা কাঁচা মাছ ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। জাপানীরা সাধারণত মসলা পছন্দ করে না। অতীতে অনেক লোকই ছিল দরিদ্র। তারা ভাত আর মুলাতেই সন্তুষ্ট। জাপানীরা ভারতীয়দের মতো দুধ ও চিনি দিয়ে চা পান করে না। তারা চায়ের শুক্‌না পাতার জল বেশী পছন্দ করে—যাকে বলা হয় 'ওচা'। জাপানীরা দিনে অন্তত ১০ বার 'ওচা' পান করে। কোন আগন্তুক বা অতিথী এলে তাঁকে 'ওচা' দিয়েই অভ্যর্থনা জানানো হয় (যদুনাথ, ১৩১৪ : ২১০)।

জাপানি পণ্ডিত রিঘাং এন. আর. কিমুরা (১৮৮২-১৯৬৫) জাপানে রবীন্দ্রনাথের দোভাষীর কাজ করেছিলেন। চট্টগ্রামে সংস্কৃত ও পালি শিখে ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশুনা শেষ করে ১৯১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)-র অধীনে শিলালিপি নিয়ে গবেষণা করেন। (পরবর্তীকালে তিনি আর. কিমুরা নাম ব্যবহার করেন।) আর. কিমুরা 'জাপানের সামাজিক প্রথা' নিয়ে e½e√Y¤ সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। বেশ কিছুদিন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানের কারণে সেখানকার খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। জাপানিদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> ... বাঙ্গালায় যেমন ডাল না হইলে ভাত খাওয়া চলে না, মাদ্রাজে যেমন অত্যন্ত ঝালযুক্ত আমের চাট্‌নি না হইলে চলে না, ব্রহ্মদেশে যেমন 'নাপ্পি' বলিয়া একরকম লবনাক্ত বিকৃত মাছ না হইলে চলে না, সাহেবদের যেমন 'চীজ্' না হইলে চলে না, তেমনি জাপানীদেরও 'মিসেসিরু' ও 'টুকেমন' না হইলে নিত্যকার ভোজন চলে না (কিমুরা, ১৩২৯ : ৫০)।

জাপানিদের মিসোসিরু ও টুকেমন তৈরির প্রণালি বেশ আগ্রহউদ্দীপক। মিসোসিরু তৈরির জন্য বিভিন্ন রকম ডাল প্রথমে ২/৩ দিন জলে ভিজিয়ে রেখে সেগুলোকে বাস্পের উত্তাপে ধীরে ধীরে ভালো করে সিদ্ধ করতে হয়। এরপর এই ডালের সঙ্গে বেশি করে লবণ মিশ্রিত করে সেগুলো কম পক্ষে এক বছর বায়ুরোধী কাঠের টবে সংরক্ষণ করা হলে মিসেসিরু তৈরি হয়। সবশেষে প্রচুর পরিমাণ জল গরম করে তাতে আলু, বেগুণ বা অন্যান্য সব্জি অথবা ছোট ছোট মাছ দিয়ে দুই চার চামচ 'মিস' মিশিয়ে দিলেই মিসোসিরু তৈরি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

> টুকেমন এক প্রকার চাট্‌নি। টুকেমন তৈরির জন্য পরিষ্কার চালের কুঁড়া ৮/১০ কিলো নিয়ে তাতে অন্তত ৩/4 কিলো লবণ মিশিয়ে মুখ বন্ধ কোন পাত্রে এক সপ্তাহ রেখে দিলে চালের কুঁড়া বেশ সরস হয়ে ওঠে। এই লবণ মিশ্রিত চালের কুঁড়া শসা, বেগুন, মূলা ও সালগমের মধ্যে রেখে দিলে টুকেমন তৈরি হয়। টুকেমন মুখের স্বাদ বাড়ায় ও সহজপাচ্য হয়। পূর্বে টুকেমন ব্যতীত খাবার জাপানীরা খেত না (কিমুরা, ১৩২৯ : ৫০)।

জাপানিদের সুদৃঢ় গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখলে স্বাভাবিক কারণেই তাদের আহার্য নিয়ে প্রশ্ন আসে। কিন্তু তাদের রান্নাঘর ও আহার্য  দেখলে অবাক হতে হয়। অবশ্য এসকল আলোচনা বিশ শতকের প্রথম দশকের। মন্মথনাথ ঘোষ এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ধনী, দরিদ্র, ভদ্র বা ইতর সকলেরই রান্নাঘরে এক রকমের আসবাব ও বাসনপত্র থাকে। ঢালাই লোহার একটি চুলা, একটি মাটির ক্ষুদ্র চুলা—জাপানি ভাষায় 'শিচিরিণ', ভাত রান্নার পাত্র ২/১টা কাঠের বালতি ব্যতীত আর তেমন কোনো কিছু নেই। অন্যান্য আসবাব ও বাসনপত্রের মধ্যে 'ওচা' পানের জন্য কয়েকটি চীনা মাটির প্লেট ও পেয়ালা, একটি চীনা মাটির কেটলি (দোবিন্য), সব্জি কাটার জন্য ছোট কাঠের পিঁড়ি ও একখানা কাটারি। জাপানিরা হাত দিয়ে ভাত খায় না—এজন্য বাঁশ বা কাঠের তৈরি কয়েক জোড়া কাঠি, যা জাপানি ভাষায় 'হাসি' নামে পরিচিত ব্যবহার করে (মন্মথনাথ, ১৯১০: ৯২)।

যদুনাথ সরকার এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন—

> প্রতি (অতি?) প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা রান্না করিতে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক দিন হইতেই ধুম নির্গমের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চিমনি উহাদের রান্নাঘরে সংযোজিত। বড় বড় সহরে যেখানে জলের কল আছে সেখানে রান্নাঘরের ভিতরে পাইপে জল নেওয়ার বন্দোবস্ত রাখা হয়। এমন কি অনেক জায়গায় গ্রামের ভিতরও বাঁশের পাইপের সাহায্যে রান্নাঘরে জল লইতে দেখিয়াছি (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৫)।

জাপানে সকালে ও বিকালে চায়ের সঙ্গে জলখাবার ছাড়া ভদ্রলোকেরা দিনে ও রাতে রোজ দু'বার ভাত খান। জাপানিরা সকাল ৭-৮টার মধ্যে সকালের খাবার, তারপর ঠিক ১২টার সময় দুপুরের খাবার ও সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে থাকেন। সাধারণত সকালে বিশেষ কোনো তরকারি রান্না হয় না। কেবল গরম গরম ভাত আর গরম গরম মিসেসিরু ও টুকেমন খাওয়া হয়। দুপুর ও সন্ধ্যার খাবারে মাছ বা মাংস থাকে। জাপানে ওচা বারে বারে পান করা হয় বলে এটিকে স্বাধীন খাবার হিসেবে গণ্য করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে খাবার খাওয়া ও পরিবেশনের পদ্ধতির সঙ্গে অন্য কোনো দেশের তেমন খুব একটা মিল নেই। আর. কিমুরা লিখেছেন—

> জাপানীরা এদেশীয়দের (ভারতীয়) ন্যায় মাটির উপর থালা রাখিয়া আসনে বসিয়া খায় না; আবার ইউরোপীয়দের ন্যায় চৌকিতে বসিয়া টেবিলে খাওয়ার প্রথাও তাহাদের নাই। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্যের অনুকরণে কেহ কেহ চৌকিতে বসিয়া টেবিলে খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ দুই চারিটি লোক ছাড়া আর সকলেরই খাইবার প্রথা দেশীয় ধরনের। জাপানীরা সাধারণতঃ গৃহের একটী কামরায় স্ত্রী-পুরুষে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ভোজনে বসে। ভোজনের এই কামরাটীকে আমাদের (জাপানের) দেশের ভাষায় বলে 'মকুদ'। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সাধারণতঃ পদ্মাসন হইয়া খাইতে বসে। জাপানে কেবল নীচশ্রেণীর পুরুষেরাই ঐরূপে বসিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের রমণীরা বা উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই খাইবার সময় বীরাসনে বসিয়া থাকে। আবার কোন বিশিষ্ট ভোজের সময় উচ্চনীচ স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলকেই বীরাসনে বসিয়া খাইতে হয়। এখানে একটা কথা বলিতে চাই, ইহা অবশ্য পূর্ব্বেও বারবার বলিয়া আসিয়াছি যে, জাপানীদের গৃহে মেজের উপর প্রায় এক ফুট উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত আর একটী স্থান আছে। তাহার উপর সর্ব্বদাই 'তাতামী' বলিয়া এক ইঞ্চি মোটা মাদুর বিছান থাকে। এই মাদুরের উপর বসিয়াই আমাদের দেশের লোকেরা খাইয়া থাকে। মাদুরটি এক ইঞ্চি পুরু বলিয়া তাহার উপর বীরাসনে বসিলেও পায়ে ব্যথা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বড় লোকের বাড়ির ব্যবস্থা আবার একটু অন্য রকমের। সেখানে ঐ পুরু মাদুরে এর উপর প্রত্যেকের জন্য এক-একটা তুলার গদি-আসন বিছাইয়া দেওয়া হয় (কিমুরা, ১৩২৯ : ৫১-৫২)।

ভাত জাপানিদের প্রধান খাদ্য। এই জন্য আতপ চালের ভাতের ফেন জাপানিরা ফেলে না। ফলে ভাত ঝরঝরে হয় না এবং জাপানিরা বাঁশ বা কাঠের কাঠি বা 'হাসি'র সাহায্যে এই ভাত সহজেই খেতে পারে। জাপানে ডালের মাধ্যমে অনেক রকম খাবার হয়। পিঠা, মিঠাই ও তফু ইত্যাদি অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর। জাপানে ছোট নদী অনেক। এসব নদীতে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। জাপানিরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ কাঁচাই খায়। এই মাছ পাতলা পাতলা টুকরার আকারে কেটে কেকের মতো সাজিয়ে রাখে। তখন একে বলা হয় 'ছাসিমি'। এক ধরনের আখনি বা সসের মধ্যে ভিজিয়ে হাসির সাহায্যে এই ছাসিমি সহজেই খাওয়া যায়। ছাসিমি আখনি বা সসের মধ্যে ভিজালে খুব নরম ও উপাদেয় হয়। ছাসিমি জাপানিদের খুব প্রিয় খাদ্য। প্রত্যক্ষদর্শী যদুনাথ সরকার কোনো কোনো ভোজে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের এই ছাসিমি পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখেছেন (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৭)।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাড়ির সকলে খাবার ঘরে এলে গৃহপরিচারক বা গৃহপরিচারিকা সবার সম্মুখে একটি করে 'ওজেন' বা ভাত রাখার জন্য নির্মিত ছোট চৌকি রাখে। চাকর বা চাকরানি না থাকলে বাড়ির স্ত্রীরাই এই কাজ করেন। ওজেন বা ভাত খাবার জন্য নির্মিত ছোট চৌকি বাংলাদেশের জলচৌকির মতো এবং সেটা চওড়া ও উচ্চতায় আধ হাত মাত্র। এতে কেবল একজনের থালাবাটি রাখা যায়। এ সম্পর্কে আর. কিমুরা লিখেছেন—

> লোকে খাবার সময় বীরাসনে বসিলে এই ছোট চৌকীগুলি তাহাদের বুকের কিছু নিচে থাকে। প্রত্যেকেরই এক-একখানি নিজস্ব 'ওজেন' আছে। সেই ওজেনখানির উপর তাহার নিজস্ব থালাবাটীগুলি সাজাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য ঐ থালাবাটীগুলি এদেশের মতো কাঁসার তৈয়ারি জিনিস নয় বা তাহাদের আকারও ওরূপ নহে। আমাদের দেশের চীনামাটির পাত্রগুলি তাহাদের থালাবাসনের কাজ করে। কতকগুলি ঢাকনীওয়ালা ছোট ছোট বাটী ও রেকাবিই আমাদের থালাবাসন। বাটীগুলির কোনটাতে ভাত, কোনটাতে বা টুকেমন, মিসসিরু প্রভৃতি তরকারীগুলি, আর রেকাবিতে ভাজাভুজি প্রভৃতি রাখা হয়। চীনামাটির এই বাসন ও ওজেনগুলি সর্ব্বদা একটী আলমারীতে বদ্ধ থাকে। খাবার সময় হইলে এগুলিকে এক-একজনের সম্মুখে আনিয়া রাখা হয়। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া আবার সেই আলমারীতেই যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। এখানে কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিৎ যে, একজনের ওজেন ও বাসনগুলি অন্যের ব্যবহার করিবার কোন নিয়ম নাই (কিমুরা, ১৩২৯ : ৫১-৫২)।

হরিপ্রভা তাকেদা ও সরোজনলিনী দত্ত উভয়েই জাপানের নারীকে দ্বিধাহীন চিত্তে কুৎসিত ও কদাকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একথা সত্য যে, খুব কমসংখ্যক বাঙালির কাছে জাপানি খাদ্য প্রশংসনীয়। হরিপ্রভা তাকেদা ও সরোজনলিনী দত্ত উভয়েই জাপানের খাদ্যকে 'অখাদ্য ও বিশ্রী' বলতে কুণ্ঠিত হননি। সরোজনলিনী দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতার আলোতে লিখেছেন—

> যে ঘরটাতে মিসেস্ সুকামোটো 'লাঞ্চ' খাওয়াতে নিলেন সেটাতে জাপানী আদব কায়দা ও সেরিমোনিয়েল চা কেমন করে সুচারুভাবে পরিবেশন করতে হয় তা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা আছে। তারই উপরে তিনটা ছোট গোল গদি পাতা ছিল, আমাদের বস্‌বার জন্য। আমরা বস্‌লে তাঁরা তিনটা 'ট্রে' এনে দিলেন, তাতে চারটা করে চীনে মাটির বাটি ছিল; একটাতে ভাত, একটাতে মাছের সুরুয়া, ও অন্য দুটো বাটিতে মাছের তরকারির মত কিছু ছিল। কিন্তু খাবারগুলিতে এত খারাপ গন্ধ লাগ্‌লো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব ছিল। খাতিরে পড়ে একটু ভাত মাত্র মুখে দিলাম, সুরুয়া আর

Dhaka University Institutional Repository

> তরকারিগুলো নাম মাত্র ছুঁলাম। এই গন্ধের চোট সামলাতে আমার কিন্তু চার পাঁচ দিন সময় লেগেছিল। যা খেতাম তাতেই এই ভয়ানক গন্ধ অনুভব করতাম। আমাদের খাবার জন্য চপ্ষ্টিক্ দিয়েছিল; কিন্তু আমি তা ব্যবহার করতে পারলাম না, সে জন্য তাঁরা আমার জন্য একটা চামচ্ এনে দিলেন। আমার স্বামী কোন প্রকারে চপ্ষ্টিক্ দিয়ে খেলেন। জাপানী খাবার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হলো, এরপর আর জাপানী খাবার ছোঁব না প্রতিজ্ঞা করলাম (সরোজনলিনী, ১৯২৮ : ১৮৮-৮৯)।

জাপানের বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু মাছ সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য হয়তো অনেকের হাসির বিষয় হবে। তিনি লিখেছেন—

> আমাদের জাপান জীবনের প্রথম অবস্থায় আমরা একদিন চাকরানিকে কি কি মাছ পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় কই, মাগুড়, তাই প্রভৃতি অনেক মাছের সে নাম করিল। আমরা তখন এগার জন ভারতবাসী এক সঙ্গে থাকিতাম। আমাদের একজন বন্ধু, চাকরানিকে, প্রত্যেকের ২টি হিসেবে ২২টি কই মাছ আনিতে আদেশ দিলেন। চাকরানি মাছওয়ালাকে ডাকিয়া আনিলে সকলেই উৎসুক হইয়া মাছ দেখিতে নিচে নামিয়া আসিলাম। মাছ দেখিয়া সকলেই অবাক। রুই মাছের মতন বড় ২২টি মাছ আনিয়া হাজির। জাপানী কই আস্বাদনে রুই মাছের মতনই। যাহা হউক ২টি মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ২০টি ফেরৎ দেওয়া গেল (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৭)।

জাপানিরা শুকনা বা শুটকি মাছ খেতে ভালোবাসে। জাপানের উত্তর প্রদেশ থেকে টোকিওতে প্রচুর শুক্নো মাছ আমদানি হয়ে থাকে। সব্জি রান্নার সময় জাপানিরা শুকনো মাছ চেঁছে চেঁছে তার কণা সব্জিতে মিশিয়ে দেয়। জাপানে আলু, কপি, বেগুন, রাঙ্গা বা মিষ্টি আলু প্রভৃতি সব্জি বিস্তর পাওয়া যায়। সেজন্য মাছ ও সব্জি জাপানে অপেক্ষাকৃত সস্তা। ভারতীয়দের মতো এতো রকম মশলা জাপানে নেই। কোনো কোনো গাছপালার রস তাদের মশলা (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৭-৬৮)।

এক সময় জাপানিরা দুধ পান করতো না। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানের একজন চিকিৎসক চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য জার্মানিতে যান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দুধের উপকারিতা দেশবাসীর কাছে প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক জাপানি অসুধ হিসেবে দুধ পান করতে শুরু করে। ভারতীয় খাবার সম্পর্কে জাপানিদের উৎসুকের অন্ত নেই। এ সম্পর্কে জাপানের কৃষি কলেজের ছাত্র যদুনাথ সরকার একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা একদিন আমাদের ভাষাশিক্ষককে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। দেশের কয়েক রকম ডাল এবং ঘি মসলা আমাদের কাছে ছিল। জলযোগে লুচি, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় লুচি চেখিয়াই অবাক। তিনি বলিলেন এই গোলাকার স্ফীত এবং ফাঁপা জিনিষটির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার কোনই রাস্তা নাই, কি উপায়ে এ বলের ন্যায় ফাঁপা জিনিস প্রস্তুত হইল। মোহনভোগ মুখে দিয়া ঘিয়ের গন্ধে তিনি অস্থির। কাজেই এসকল আর তাঁহার খাওয়া হইল না। এলাচি, লবঙ্গ, মুগ এবং মুসুরের ডালের নমুনা দেখিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ করিলেন (যদুনাথ, ১৩২০ : ১০৬৮-৬৯)।

জাপানি ভোজ

ভারতে বিভিন্ন উৎসবে ভোজের আয়োজন করা হয়—যেমন বিয়ে, উপনয়ন বা উপবীত ধারণ, পুজা-পার্বণ ও পারলৌকিক কাজ-কর্ম ইত্যাদি। এসকল উৎসবে ভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে আমন্ত্রিত হন বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধব। আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন খাদ্য ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করা হয়। জাপানেও বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে ভোজের আয়োজন করা হয়, তবে সেখানে আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন খাদ্যের আয়োজন ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ একটা বিষয়ের আয়োজন থাকে। এই বিশেষ দ্রব্যটি হলো 'সাকে'—যা চাল দিয়ে তৈরি করা হয়। সাকে ব্যতীত 'বিয়ার' ও 'হুয়িস্কি' দিয়ে বিশেষ অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। এটি জাপানি ভোজের এক বিশেষত্ব।

জাপানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যখন কোনো ভোজ সভায় উপস্থিত হয়ে আসনগ্রহণ করেন, তখন গৃহস্বামী সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভোজে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানিয়ে নিজের দীনতা প্রকাশ করেন। দীনতা প্রকাশের পশ্চাতে যে কারণ বিদ্যমান তা হলো উপস্থিত অভ্যাগত অতিথিরা যেন সকলেই আয়োজিত দ্রব্যাদি প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করে আপ্যায়িত হন। এরপর আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ভোজনে প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়টি আর. কিমুরা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন—

> প্রথমেই আট দশ জন লোক এক একটা চীনামাটির জাগে ভরিয়া পূর্ব্বের সেই শাকে বা সুরা গরম করিয়া লইয়া আসে। পরিবেশন উচ্চস্থান হইতে সুরু হইয়া একেবারে নিম্নস্থানে আসিয়া শেষ হয়। প্রত্যেককে আধ ছটাক আন্দাজ ধরিতে পারে এমন ছোট একটী চীনামাটির পাত্র ভরিয়া শাকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রগুলিকে আমাদের দেশের ভাষায় 'শাকাজুকি' বলে। শাকে পরিবেশন শেষ হইলে সকলে ইহা এক সঙ্গে পান করে। পান করিবার সময় সকলকে এক সঙ্গে বলিতে হয় 'গোচিছো ছামা' অর্থাৎ সুন্দর খাওয়া আজ আমরা খাইব; ইহার পর ভোজন আরম্ভ হয়। জন্ম বিবাহ প্রভৃতি কোনো শুভ-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে

*Dhaka University Institutional Repository*

যে ভোজ হয়, সে সময় পূর্ব্বে এই কথাটি ছাড়া আরও কথা বলিতে হয়—'ওমেদেত' অর্থাৎ সুসংবাদ (কিমুরা, ১৩২৯ : ৫৫)।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা মদ্যপায়ী তাঁদের অনেকবার সাকে পরিবেশনের প্রথা আছে। কিন্তু তাঁরা একটানা সুরা পান করেন না। মাঝে মধ্যে একটু তরকারি, মাংস বা মাছও খান। অন্যদিকে যারা সুরা পানে অনভ্যস্ত, তাঁরা একবার সুরা পান করেই ভোজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই দলে থাকেন কিশোর, রমণী ও যুবকেরা। বলা বাহুল্য, ১৮ বছরের নিচে কোনো কিশোর মদ্য পান করেন না। জাপানে সাধারণত এদের মদ্যপান বিশেষ নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়। উপলক্ষ্য বিশেষে নারী-পুরুষ সকলে মিলে একাজ করে। তবে, বিশেষ আমন্ত্রণে সাকে বা সুরা পরিবেশন করার জন্য লোক থাকে এবং ধনীলোক সুদক্ষ বালিকাদের নিয়োগ করেন—যাদের জাপানে 'গেইসা' বলা হয় (মন্মথনাথ, ১৮৯৮: ২২৩)। জাপানের গেইসা সম্পর্কে অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

জাপানি নাট্যশালা

মন্মথনাথ ঘোষ এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জাপানি নাট্যশালার সৃষ্টি ষোড়শ শতকে। এর আগে নাচ ও গানের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সঠিক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়নি। সে সময় জাপানের নাট্যশালায় নারীদের অভিনয় করতে দেওয়া হতো না। নারীর চরিত্রে বালকেরা অভিনয় করতো। কোনো কলুষিত ব্যক্তির জীবন সংহারের দৃশ্যে জাপানিরা যারপরনাই পুলকিত হতো। অভিনয়কালে তরবারি ব্যবহার করা হতো, সকলেরই মনে হতো রক্তপাত হচ্ছে এবং অঙ্গ প্রতাঙ্গ সকল ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে পড়লো। সাধারণ মানুষ অভিনয় দেখতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। তারা অভিনেতাদের দেবতা বলে মনে করে। কিন্তু শিক্ষিত ও উন্নতমনা জাপানি ভদ্রলোকদের অনেকে নৈতিক অবনতির ভয়ে নাট্যশালায় আসেন না।

জাপানের নৃত্যগীতকারী রমণী

ভারতবর্ষের ন্যায় জাপানেও নৃত্যগীতকারী রমণী দেখতে পাওয়া যায়। এদের 'জিসাস' বলা হয়। এরা সাধারণত অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশীয়। অনেক সময়ে পিতৃমাতৃহীন বালিকাদিগকে কিনে জিসাস করা হয়। জিসাসরা সাত বছর থেকেই নাচ-গান ও অঙ্গ ভঙ্গিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এই সকল নৃত্যকারী নারীর মধ্যে সুন্দরী ও কৌতুকপ্রিয়ার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কোনো বাড়িতে ভোজ বা উৎসবের সময় আগন্তুকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য জিসাসদের পারিশ্রমিক দিয়ে আনা হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও নাচ-গান করে। জাপান সম্রাট মিকাদো আইনের মাধ্যমে তা নিবারণ করেন। মালিকের অনুমতি নিয়ে জিসাসরা স্বদেশ বা বিদেশি পর-পুরুষের সঙ্গে অর্থোপার্জনের জন্য যেতে পারতো (মন্মথনাথ, ১৮৯৮: ২২৫)।

জাপানেআত্মহত্যা ও মৃত্যুশোক

মন্মথনাথ সিংহ evgv‡ewabxcwÎKv-য় জাপানে আত্মহত্যা বিষয়েকিছু তথ্য দিয়ছেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী জাপানে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। আত্মহত্যাকারি প্রথমে নিজের উদর কেটে ফেলে, পরে তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ তার শিরোশ্ছেদ করে। এই ধরনের আত্মহত্যাকে 'হারাকিরি' বলা হয়। প্রকৃত অর্থে হারাকিরি হলো উদর কেটে ফেলে মৃত্যু। এটিকে জাপানিরা সম্মানসূচক মৃত্যু বলে অভিহিত করে। কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় শত্রুর হাতে মৃত্যুর চেয়ে জাপানিরা হারাকিরিকে প্রশংসনীয় বলে মনে করে। তবে সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, শোগুণ ও সামুরাইদের মধ্যে হারাকিরিতে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশি। এ বিষয়ে উনিশ শতকের শেষের দশকে মন্মথনাথ সিংহ evgv‡ewabxcwÎKv-য় অতীতের 'হারাকিরি' পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন—

> প্রত্যেক ভদ্রলোক দুইখানি করিয়া তরবারি ব্যবহার করিয়া থাকেন। একখানি দীর্ঘ, অপরখানি ক্ষুদ্র। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘখানির এবং আত্মহত্যার জন্য ক্ষুদ্রখানি ব্যবহার হয়। সাধারণ ঘাতকগণের হাতে নিহত হওয়া অতীব লজ্জাকর ও অপমানজনক, এই হেতু পূর্ব্বে অপরাধী ভদ্রলোক ও যোদ্ধারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে সাক্ষিগণের সম্মুখে আত্মহত্যা করিত। এইরূপে ব্যক্তি, উন্নত বধ্য ভূমিতে উত্তর মুখে উপবেশন করে, এবং তাহার বন্ধু বান্ধবরা তাহার চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়। এই সময় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-বিজ্ঞাপক রাজকর্ম্মচারী সমাগত জনমণ্ডলীর শ্রুতিগোচরে অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বা ছোরা অপরাধীর হস্তে প্রদান করেন। ছোরা গ্রহণ করিয়া হত্যাকরনেচ্ছু ব্যক্তি মৃত্যুকালীন অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করণানন্তর সমাগত বন্ধুমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহে 'আমি উদর কর্ত্তন করিলে, তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমার শিরশ্ছেদ করিও।' তারপর ছোরাখানি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া নাভির নিম্নদেশে প্রায় আট ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ত্তন করে। উদর কর্ত্তন করা হইলেই একজন বন্ধু তাহার শিরোচ্ছেদ করে। আত্মহত্যাকারী যদি উদরচ্ছেদ করণানন্তর পুনর্বার সেই ছোরা দ্বারা আপন ওষ্ঠচ্ছেদ করিতে বা ছোরা খানি কোষবদ্ধ করিতে পারে, তবে সকলে তাহার সাহসিকতায় শত শত ধন্যবাদ করিতে থাকে, এবং পুরুষানুক্রমে তাহার সাহসিকতায় প্রশংসাজনক গান গীত হয়। উদরচ্ছেদের সময় কেহ কিছুমাত্র ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও নিন্দা করে (মন্মথনাথ, ১৮৯৮: ২২৭)।

হারাকিরি-র মাধ্যমে যারা আত্মহত্যা করে, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাদের মৃতদেহ বৌদ্ধ মন্দিরের কোনো স্থানে কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা কেবল তার মাথা চা ভর্তি বালিসের

Dhaka University Institutional Repository

উপর রেখে পরে সাদা রঙের কাঠের সিন্ধুকের ভেতর বসিয়ে রাখতে হয়। এরপর এই মৃতদেহ কবর দিয়ে কবরের উপর পাথরের ফলক রাখা হয় যেখানে মৃত ব্যক্তির নাম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ থাকে। অনুরূপ তথ্যাদি সহকারে কাঠের উপর লিখিত একটি ফলক মৃতের বাড়ির একটি কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য যখন ছিল, তখন মৃতদেহ দাহ করা হতো। কিন্তু ১৬৫৪ সালে এই প্রথা বন্ধ করা হয় (মন্মথনাথ, ১৮৯৮: ২২৭)।

জাপানে উনিশ শতকের শেষের দিকে সকল মৃত ব্যক্তির জন্য দুই পদ্ধতিতে শোকচিহ্ন প্রকাশ করা হয়। (ক) শোক প্রকাশক পরিচ্ছদ পরিধানের মাধ্যমে ও (খ) নিরামিষ ভোজনের মাধমে। উল্লেখ্য, শ্বেতবর্ণ পোষাক জাপানিদের কাছে শোক-পরিজ্ঞাপক। কোন্ কোন্ আত্মীয়ের মৃত্যু হলে কীভাবে কতদিন শোক প্রকাশ করা উচিৎ তার তালিকা নিম্নরূপ—

সারণি: ৬
জাপানে পারিবারিক সদস্যদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের প্রক্রিয়া

| আত্মীয় | শোক প্রকাশক পরিচ্ছদ পরিধান | নিরামিষ ভোজন |
|---|---|---|
| পিতামহ | ৬৫০দিন | ৬০দিন |
| পিতা মাতা | ১৩ মাস | ৫০ দিন |
| স্বামী | ১৩ মাস | ৫০ দিন |
| স্ত্রী | ৯০ দিন | ২০ দিন |
| ভ্রাতা বা ভগ্নী | ৯০ দিন | ২০ দিন |
| জেষ্ঠ্য পুত্র | ৯০ দিন | ২০ দিন |
| অন্য পুত্র | ৩০ দিন | ১০ দিন |

সূত্র : মন্মথনাথ সিংহ, 'জাপান কাহিনি : জাপানিদের কয়েকটি দেশাচার', evgv‡ewabxcwÎKv, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।

## জাপানি পোষাক-পরিচ্ছদ

জাপানি পোষাক-পরিচ্ছদ ভারতীয়দের মতো নয়, চৈনিকদের মতোও নয়। এককালে জাপানিদের নিজস্ব ও জাতীয় পোষাক ছিল। কিন্তু ১৮৫৪ সালে কমোডোর গলব্রেথ পেরির জাপান অভিযানের পর ক্রমশ পাশ্চাত্য প্রভাব প্রকটিত এবং স্কুল, কলেজ, অফিস ও আদালত, এমনকি কৃষিক্ষেত্রে

ভিন্নতর পোষাক লক্ষ করা যায়। প্রায় সর্বত্র জামা, প্যান্ট ও কোটের ব্যবহার লক্ষণীয়। বিজ্ঞানী, লেখক ও রাজনীতিবিদ শাকুমা শোজান (১৮১১-১৮৬৪) পাশ্চাত্য জ্ঞান, ভাবধারা ও পাশ্চাত্যের পোষাক-পরিচ্ছদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপীয় পোষাক বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। তিনি জাপানে ইউরোপীয় পোষাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। শোজান মনে করেন, জাপানের পোষাক জাপানিদের অলস করে তোলে এবং ইউরোপীয় পোষাক জাপানি-সহ মানুষের সজীবতা বৃদ্ধি করে। জাপানে শাকুমা শোজান সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করেছিলেন। বিদেশি চালচলনে তাঁর নিরতিশয় নেশা ছিল। মতাদর্শগত কারণে শাকুমা শোজানকে ১৯৬৪ সালে কাওয়াকামি গেনজাই হত্যা করেন (Jason, 2012: 108)। উল্লেখ্য, যদুনাথ সরকার শাকুমা শোজানের হত্যার বছর নির্দেশ করেছেন ১৯৬৬ সালে (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪২)।

যে জাপানে পোষাককে কেন্দ্র করে বা অন্য কোনো কারণে পাশ্চাত্যের পোষাক সমর্থনকারী শাকুমা শোজানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেই জাপানের সর্বত্র আজ পাশ্চাত্যের পোষাকের ছড়াছড়ি। আজ মুটে ও মজুর পর্যন্ত সবাই মনে করেন কাজকর্মের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের পোষাক আরামদায়ক। এই পোষাক শরীরে লেগে থাকে এবং কাজে উদ্দীপনা বা স্ফূর্তি পাওয়া যায়। জাপানিরা কাজকর্ম শেষে বাড়িতে ফিরে তাদের জাতীয় পোষাক ‘কিমোনো’ বা ‘ইউকাতা’ পরিধান করে। ভারতের জামসেদজি টাটা কোম্পনির কর্ণধার ও পাকিস্তানের হোসেন আলি শাহি আগা খান (১৮০০-১৮৮১)-এর সঙ্গে জাপানের কাউন্ট ওকুমা (১৮৩৮-১৮৯৮) জাপানি পোষাক পরিধান করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর হিরোশি ওতাদা ও ড. হারাদা (১৮৭১-১৯৬১) ভারতে এসে দুজনেই ইন্দো-জাপানি সভায় আক্ষেপ করে বলেছেন যে, ভারতবাসী ইউরোপীয়ানদের প্রশংসনীয় গুণের দিকে না তাকিয়ে এবং নিজেদের জাতীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে কেবল সাহেবি বসন, সাহেবি কথন, সাহেবি ভূষণ এবং সম্ভব হলে সাহেবি অশন অনুকরণ করতেই সিদ্ধহস্ত।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জাপানি নারীরা রঙিন ও বাহারি পোষাক বেশী পছন্দ করে (সরোজনলিনী, ১৯২৮: ২১০)। বাড়িতে ছুটির দিনে জাপানি স্ত্রী ও পুরুষ কোমর বন্ধের সাহায্যে আলখেল্লার মতো পা পর্যন্ত লম্বা কোট পরিধান করেন—যার কোনো বোতাম নেই। কিন্তু সেই জাপানি স্ত্রী ও পুরুষ ভদ্র সমাজে মেলামেশা করার সময় কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটি গাউন ও শরীরের উপরিভাগে একটি ঢিলা কোট না পড়ে বের হন না। কোটের উপরে প্রত্যেক বংশের নিজস্ব নির্দিষ্ট নিদর্শন অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক বংশের নিজস্ব নির্দিষ্ট নিদর্শনের মধ্যে লতা, পাতা ও ফুলের চিত্রই বেশি। সম্রাট বংশের প্রতীক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। জাপানি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পোষাক প্রায় এক রকম। তবে মেয়েদের পোষাক জাঁকার সিটের। সিট ব্যতীত সম্পূর্ণ সাদা পোষাক বড় একটা

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় না। জাপানে শীতের পোষাক বাংলাদেশের বালিশের মতো তুলা পুরিয়া তৈরি করা হয় (Ashikari, 2003: 55-75)।

যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ছোট মেয়েরা এমনই জমকালো সিটের পোষাক পড়ে যে রাস্তায় দলে দলে চললে তাদের নানারঙে চিত্রিত চিনামাটির পুতুলের মতো লাগে। জাপানে স্ত্রীলোকের কোমরবন্ধ ব্যবহার করা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বিষয়। যে যত ধনী ও সৌখিন তা তাদের কোমরবন্ধে প্রকাশ পায়। সকল সময়ে বাড়িতে ব্যবহার্য কোমরবন্ধ তৈরি হয় সুতি দিয়ে, কিন্তু বড় সমাবেশে যেতে হলে কোমরবন্ধ তৈরি রেশমি বা পশমি কাপড় দিয়ে—যার উপর সোনার তারে নির্মিত নানারূপ লতা-পাতা, ফুল ও পাখি দেখা যায়। এই কোমড়বন্ধের নাম 'ওবি'। এই রেশমের ওবি দৈর্ঘে ১১/১২ ফুট এবং প্রস্থে এক থেকে দেড় ফুট। কোমরবন্ধের পেছনে তুলা ভরা একটা গদি থাকে। জাপানি পুরুষেরা ইউরোপীয়দের মতো টুপি পড়ে। কখনও কখনও দু'একজন জাপানি মহিলাকেও টুপি পড়তে দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই জাপানের রাস্তাঘাটে ও মাঠে ভদ্র, মুটে, মজুর, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই কোনো না কোনো রকম পাদুকা পড়তে দেখা যায়। সে পাদুকা খড়ম, কিম্বা খড় বা কাপড়ে নির্মিত হয়।

অধিকাংশ মেয়ে চুলের উপর রেশমি রিবন, কৃত্রিম ফুল বা চিরুণি এবং বৃদ্ধারা প্রায় বড় দুই একটি পুঁতি ব্যবহার করেন। জাপানি মেয়েরা চুল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। ঘরে রান্না ও বিভিন্ন কাজের সময় বা হোটেল রান্নার সময় মেয়েরা চুলের উপর বিশেষ কাপড় জড়িয়ে আত্ম-সচেতনার পরিচয় দেয়। এই সময় থেকেই মেয়েরা লিপস্টিক ব্যবহার করতে শুরু করে।

মেয়েরা অতি সামান্যই ধাতুর অলংকার ব্যবহার করে। অবস্থাপন্ন গৃহের মেয়েরা ঘড়ির সঙ্গে সরু সোনার চেন এবং পুরুষেরা নেকটাই-এর সঙ্গে সোনার পিন ব্যবহার করে। জাপানের বিশ শতকের প্রথম দশকের পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> আজকাল জাপানী অনেকে আংটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সৌখিন বাবু এবং মেয়েদের কাহারও কাহারও দুই হাতে ৫/৭টি আংটি সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের ভিতর আংটি ও চেনের প্রচলন কম। তবে মুটে মজুরের নিকটেও লোহার ঘড়ি ও চেন আছে। পরিচ্ছদের বাহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। কোথাও যাইতে হইলে যে কোন শ্রেণীর মেয়েই এত মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিতা হয় যে উচ্চ শ্রেণী বা নিম্ন শ্রেণী বুঝিবার যো নাই। অনেক সময় ট্রামের ভিতরে জাঁকাল পরিচ্ছদধারিনী চাকরাণী ও ইতর শ্রেণীর মেয়েদিগকে স্থান দিয়া অতি বিশিষ্ট ভদ্র লোককেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ট্রামে স্থানাভাব হইলে পুরুষ আরোহিগণ মেয়েদিগকে বসিতে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েক

*Dhaka University Institutional Repository*

> বৎসর পূর্ব্বে লোকের ভিতর এই অভ্যাস বেশি দেখিতে পাইতাম। ক্রমেই জাপানীরা উদ্বত স্বভাব হওয়ার পূর্ব্বাভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪৫)।

যদুনাথ সরকারের জাপান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিবর্তন ক্রমশ লক্ষ করা যায়। জাপানিদের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বক্তব্য করেছেন যে, অজ্ঞান ও তমসাচ্ছন্ন জাপান বৌদ্ধ ধর্মের মহিমায় ও তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ তখন জাপানিদের কাছে ছিল আদর্শ, তাঁরা ভারতকে বলতো স্বর্গ (তেন্‌জিকু) আর ভারতবাসীকে বলতো স্বর্গবাসী (তেন্ জিকু জিন)। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার আবিলতায় জাপানিদের প্রাচীন সরলতার স্থান দখল করেছে কূটনীতি। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা জাপানে গিয়ে প্রথমে তাদের বাহ্যিক বিনয়ী ও ভদ্র ব্যবহারে আহ্লাদিত হয়ে আনন্দে আটখানা হয়। সেখান থেকে ভারতে তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছেও সংবাদপত্রে জাপানের প্রশংসা করতো। যদুনাথ সরকারও এই প্রবণতার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু ক্রমশ জাপান সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের উপলব্ধির পরিবর্তন হয়। যদুনাথ সরকার অনুভব করেন যে, জাপানিদের চরিত্র ও প্রকৃতির দু'টি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে। নিজেদের কাছে ভিতরে বাইরে সমান, আর বিদেশিদের কাছে বাইরে একরূপ আর ভিতরে অন্যরূপ। এ প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—

> উহাদের যাহা তাহা কোন বৈদেশিক কিছুতেই নিন্দা করিতে পারিবে না। কাঁচা কিম্বা পচা আহার্য্য হউক মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। উলঙ্গ হইয়া ১৫/২০ জন এক ঘরের ভিতর স্নান করুক সে রীতির প্রশংসা করিতেই হইবে। ... গীত উন্মাদের ক্রন্দনের ন্যায় শ্রুত হইলেও অতি মিষ্টি মিষ্টি (উম্মাই উম্মাই) বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে হইবে। Gladstone was a great politicianএই কথা জাপানীরা উচ্চারণ করিবে, 'গুরাদোছুতোনু ওয়াজু এ গুরেতো পোরিতেশিয়ানু'। তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে 'মহাশয় আপনার ইংরাজী উচ্চারণ কি চমৎকার! আপনি অতি দক্ষ' (নাকা নাকা জোজু)। যাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর নাই এবং যাহারা চীনাদের বিশ হাজার অক্ষর হাওলাত করিয়া লইয়া কার্য চালাইতেছে তাহাদের সেই ভিত্তিহীন ভাষাকে অতি প্রাচীন সুসভ্য ভাষা বলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে। স্থূল কথা তাহাদের যাহা কিছু সবই ভাল বলিতে হইবে। এইসকল বিষয় যদি ঠিক মত প্রকাশ করিতে যাই তাহা হইলে উহারা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে এবং এমন কি উহারা উহাদের দেশের শত্রু বলিয়া মনে করে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক জাপানীরই প্রগাঢ় এবং অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ আছে বলিয়াই উহারা স্বদেশের কিছুই মন্দ দেখে না (যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪৬)।

একটি প্রবন্ধে জাপান সম্পর্কে অনেক কথা প্রকাশিত হওয়ায় জাপানীরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়। যদুনাথ সরকারের একজন সহাধ্যায়ী এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অপ্রীতিকর মনে

*Dhaka University Institutional Repository*

করে যদুনাথ সরকার বিষয়টি চাপা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সহাধ্যায়ী ছাড়বার পাত্র নন। অগত্যা যদুনাথ সরকার নিজের মত প্রকাশ না করে এ বিষয়ে ইংল্যান্ড, কোরিয়া, আমেরিকা, চীন ও হেগ্ কনফারেন্সের দুই একটা কথা বললেন। এতেই যদুনাথ সরকারের সহাধ্যায়ী রাগে লাল হয়ে যান। সক্রোধ বললেন যে, পৃথিবীর সকল দেশই জাপানের উন্নয়নে ঈর্ষার আগুনে পুড়ছে, তাই সকলে নীল বর্ণের চশমা দিয়ে জাপানকে দেখে থাকে।তবে পরে যদুনাথ সরকারের সহাধ্যায়ী পত্রযোগে এ বিষয়ে দুখঃপ্রকাশ করেছিলেন। যদুনাথ সরকার জাপানি সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। জাপানিরা কোনো ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে, অন্যায় করলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের অভ্যর্থনা ও ক্ষমা প্রার্থনার ধরন স্বতন্ত্র। তারা মনে করে, শিষ্টাচার দেখালে পদগৌরব বাড়ে বৈ কমে না(যদুনাথ, ১৩১৮ : ৪৬-৪৭)।

পারিবারিক জীবন

প্রতীচ্যবাদীরা প্রাচ্য সমাজের একটি বিষয় লক্ষ করে চমৎকৃত হন। প্রাচ্য দেশসমূহের প্রায় সর্বত্র, বয়োবৃদ্ধরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠতার জন্য সম্মানপ্রাপ্য। এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম জাপানেও নেই। এজন্য পূর্বে জাপানে নব-বধুর স্থান ছিল অনেক নিচে। অনেকেরই আদেশ তাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে ও অবনত মস্তকে পালন করতে হয়। এছাড়া সকল প্রকার রান্না, পরিবেশন, ঘর ধোয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি অনেক কাজই নববধুকে নিজের হাতে করতে হয়। কোনোক্রমে কোনো কাজ দাসদাসীর উপর ফেলে রাখলে নববধুর ভাগ্যে জোটে নিন্দা ও লাঞ্চনা। এক বিষয়ে জাপানিরা ভারতবাসীকেও অতিক্রম করেছে। কাপড়-চোপর ধোপা বাড়ি দিলে বাবুয়ানী প্রকাশ পায়। জাপানে সে সময় কাপড় কাচতে সাবান দিতে হতো না। জাপানিদের সংসারে প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কাপড়-চোপর ধুয়ে তারপর মসৃণ কাঠের দু'টি ফলকের মধ্যে চাপ দিয়ে ইস্ত্রি করা হয়। জাপানের নববধুকে নিদ্রান্তে শয্যা ত্যাগের পর মশারি তুলতে ও মাদুর গুটাতে হয়। বিছানা করা বা বিছানা তোলা দাসদাসীর কাজ নয়।

খুব সকালে সকলের আগে পত্নীকে শয্যা ত্যাগ করে শয়ন কক্ষের প্রদীপটা নিভিয়ে দিতে হয়। সমস্ত রাত প্রদীপটি আলো দিয়েছে, আর যেন তেল নষ্ট না হয়। তারপর বাসি কাপড়-চোপর পরিত্যাগ করে দাসদাসীদের তুলে দিয়ে নববধু রান্নার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। প্রাতরাশ প্রস্তুত হলে স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নববধুকে করতে হয়।

জাপানে শিশুর ছয় বছর, ছয় মাস ও ছয় দিন বয়স হলে বিদ্যারম্ভ হয়। দু'টি জানুতে হাত রেখে নমস্কার ও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার রীতি জাপানে প্রচলিত। শিশুরা গৃহত্যাগের সময় মাতার অনুমতি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে এবং মাতাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে। গৃহিনী গৃহে প্রত্যাগমন করলে চাকরবাকর ও সন্তানরা দরজায় গিয়ে মাতাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে। শিশুর জন্মের সাত দিনের দিন শিশুর নামকরণ করা হয়। এক মাস পর শিশুর মাথার চুল ফেলে স্থানীয় মন্দিরে নিয়ে ইষ্ট দেবতার পূজা করা হয়। শিশু তিন বছর পর্যন্ত মুণ্ডিত মস্তকে থাকে এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করতে দেওয়া হয়(মন্মথনাথ, ১৯১০: ২৩১)।

গেইসা

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পতিতা, গণিকা, বারবনিতা, বারবিলাসিনী, বেশ্যা, স্বৈরিণী প্রভৃতি পেশাজীবী সকল সমাজে ছিল। ভারতবর্ষ কোনোক্রমেই তার ব্যতিক্রম নয়। সর্ব সমাজেই পুরুষ ও রমণী একত্রে আমোদ ও প্রমোদের জন্য আগ্রহী এবং আদিম রস বা কলাবিদ্যার প্রতি অনুরক্ত। জাপানে 'গেইসা' নামে অভিহিত একদল নারী নাচ ও গান চর্চা করে। পুরুষের মন ভুলানো কুলনারীর বৃত্তি নয়, কিন্তু এটা গেইসার বৃত্তি এবং এই বিষয়ে তারা পারঙ্গম ও সিদ্ধহস্ত। পুরুষের মনোহরণের এই বিদ্যা কোনোভাবেই জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর ধারণানুযায়ী 'সহজাত' নয়; বরং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত। জাপানে শৈশব থেকেই এসকল বালিকা সুরসিকা, উত্তর-প্রত্যুত্তর-নিপুণা এবং কাব্য ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের মাধ্যমে রুচি-মার্জিত সুশিক্ষিতা। অল্প বয়স থেকেই এদের বিশেষ যত্ন সহকারে নাচ, গান ও কলাবিদ্যায় সুনিপুণ করা হয়। এ সকল জাপানি নটী প্রায়ই সমাজের নিম্নস্তর থেকে আসে। তবুও বহু সম্ভ্রান্ত জাপানি পুরুষ এদের সঙ্গলাভের জন্য বিশেষভাবে লালায়িত। প্রধানত মার্জিত রুচি, নরম প্রকৃতি ও সরস কথাবার্তার গুণে এরা সম্ভ্রান্ত জাপানি পুরুষদের মনোহরণে সমর্থ হয়। যদিও একটি তথ্য দেওয়া আবশ্যক যে জাপানি গেইসারা দেহ-ব্যবসায়ী নয়। তারকনাথ মুখোপাধ্যায় জাপানি গেইসাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন—

> গেইসা চিরকাল স্বাধীনা, অর্থ দিলেই কাহারও ক্রীতদাসী হয় না। ভারতে কামরূপের মহিলারা যেমন যাদুমন্ত্র বলে পুরুষকে ভেড়া করিতে পারেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে বা এক সময় ছিল, জাপানী গেইসাও সেইরূপ পুরুষকে নাকে দড়ি দিয়া চালাইতে চিরনিপুণা। রূপ এজন্য তাদের প্রধান সম্বল নহে; হৃদয়ে তুষানল জ্বলিলেও বাইরে সহাস্যমুখে ও প্রফুল্লভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা সরস কথোপকথনাদির সাহায্যে অপরের মনোহরণ চেষ্টায় অভ্যস্থা বলিয়াই সে সাধারণত এরূপ করিতে সমর্থ হয়। গেইসা হইলেই সে হীনচরিত্রা হইবে, এমন কোনো কথা নাই। অনেক গেইসা শেষে বড় বড় বংশে বিবাহিতা হইয়াছে। এবিষয়ে মৃচ্ছটিক যুগের বসন্তসেনা ভারতীয় গেইসার একটা নমুনারূপে উল্লিখিত হইতে পারে (তারকনাথ, ১৩১৩ : ১১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত না হলেও জাপানি চরিত্রের একটা দুর্বলতা অনেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম। বলা হয় যে, ইউরোপীয়দের সংসর্গে এসে জাপানিদের উন্নতি হয়নি। 'গেইসা' তো আবাহমানকাল থেকেই আছে, কিন্তু হোটেল ও মোটেল এখন সেবিকাকুলেই পূর্ণ থাকে। সেবকের তেমন আদর নেই। এর জন্য পাশ্চাত্যের সভ্যতা কতটুকু দায়ী বলা কঠিন। মিইয়ানমারে যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি আর কোথাও দেখা যায় না। এটাও কতটা পাশ্চাত্যের সভ্যতার জন্য তা-ও বলা সুকঠিন। ব্যারিস্টার ও ভূ-পর্যটক চন্দ্রশেখর সেন (১৮৫১-১৯২০) তাঁর f-c‘wÿY গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> ইয়াকোহমা নগরে বিস্তর 'চায়া' বা চা পানের আড্ডা আছে, ঐ সকল দোকান স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা রক্ষিত; সে গুলির নীতি বড় বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ব্যাপার 'জনকিনো' নৃত্য। একটী স্ত্রীলোক বসিয়া সেতারের ন্যায় যন্ত্র বাজান, তিন জন নৃত্য করেন; নটীরা নৃত্যকালে ক্রমে বস্ত্রটি বিরহিত হইয়া সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় উপস্থিত হন।
>
> জাপান সম্রাটের নির্দেশে টোকিও-এর 'বারাঙ্গানদের জন্য গাঙ্কিরো নামক একটী স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট; উহাদের কাছে রাজকর আদায় করিয়া অনুমতি পত্র (উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা লিখিত 'ফন্ডা' বা টিকেট) প্রদত্ত হইয়া থাকে। উক্ত চতুস্কোণ পল্লী পরিখা দ্বারা বেষ্টিত, তাহার এপারে ব্যবসা চালাইলে রাজদ্বারে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয় (চন্দ্রশেখর, ১৯০৭ : ৭৪২)।'

জাপানের নারী

জাপানের নারী সম্পর্কে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় লিখিত বই হলো ১৮৯৯ সালে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা bvbv †‘‡ki bvix-wPÎ। এই গ্রন্থের কোনো স্থানে লেখক বা লেখিকার নাম নেই। এটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জাপান দেশের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক সুশ্রী, ইহারা গৌরবর্ণা, গণ্ডদেশ রক্তাক্ত এবং মুখের হা সুগঠিত। ইহাদিগের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশরচনা প্রণালীও বড় সুন্দর। ইহাদের ধরণ ধারণ মনোরঞ্জন, এবং স্বর মিষ্ট (নানা দেশের, ১৮৯৯ : ৫৬)।' উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপানি নর-নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ প্রায় একই রকম ছিল। জাপানের গ্রামের নারীরা গরমের দিনে এক প্রকার লুঙ্গি পড়ে এবং এই লুঙ্গি পিছন থেকে ঘুরিয়ে বক্ষ-বন্ধনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শীতকালে নারী-পুরুষ উভয়েই ধানের খড় দিয়ে তৈরি জুতা পরিধান করেন। বর্ষাকালে সকলেই খড়ম পায়ে দেয়। তাঁদের পোষাকের আস্তিনের মধ্যে বেশ কয়েকটা থলে থাকে, যেখানে নরম কাগজ রাখা হয় এবং এই নরম কাগজ রুমালের কাজে ব্যবহৃত হয়। জাপান

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে বাংলাভাষার লেখকদের অনেকেই জাপানি নারীর কেশবিন্যাস ও পরিচর্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জাপানি মহিলা চুল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাদের খোঁপা খুবই সুন্দর। bvbv †'‡ki bvix-wPÎ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> স্ত্রীলোক কেশবিন্যাসে বিশেষ মনোযোগিনী। আর এমন দীর্ঘ কেশ আর কোনো দেশের স্ত্রীলোকের নাই। ইহাদের বাস্তবিক 'পদমূল বিলুণ্ঠিত' কেশরাশি। ইহারা সিঁতি কাটে না। চুলগুলি উল্টাইয়া মাথার উপরে খোঁপা বাঁধে। বড় বড় কাঁটা দিয়া তাহা আট্‌কাইয়া রাখে। অনেকে মাথায় ফুল দিয়া থাকে। মাথার কাঁটাগুলি অনেক দামি বটে, কিন্তু জাপানী স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষীয় রমনীগণের ন্যায় গা-ভরা গহনা পরে না। স্ত্রীলোকে ঘোমটা দিয়াও মুখ ঢাকিয়া রাখে না। ইহারাও মাথায় তেল মাখে, কিন্তু একদিন চুল বাঁধিলে এক সপ্তাহ থাকে। ইহাদের বালিস কাষ্ঠের, তাহাতে কেবল ঘাড়টি রাখিয়া ঘুমায়, সুতরাং চুল নষ্ট হয় না (নানা দেশের, ১৮৯৯ : ৫৬-৫৭)।

ইংরেজেরা জাপানি মহিলাদের সুরুচিসঙ্গত হাব-ভাব দেখে বিস্মিত হন। একটা কথা আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম নেপালে হলেও ভারত ছিল তাঁর কার্যক্রমের প্রধান স্থান। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষণীয় যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘকালীন সহাবস্থানের ফলে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, প্রথা ও রীতি-নীতি সঞ্চারিত হয়। ভারতে সনাতন তথা হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘকালীন সহাবস্থানের ফলে তাঁদের বিশ্বাস, প্রথা ও রীতিনীতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই জাপানের সমাজ, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যেও হিন্দুধর্মের অনেক কিছু সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে জাপানে রয়েছেন সরস্বতী (বেনজাইতেন), লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবী। জাপানিদের সামাজিক বিশ্বাস, আচার ও আচরণ সব কিছুতেই রয়েছে হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব। জাপানের ছেলে মেয়েরা দূরে যেতে হলে মাকে প্রণাম করে এবং তাদের মাতাও সন্তানের বাড়িতে নিরাপদে আসার জন্য আশীর্বাদ করেন।

মন্মথনাথ ঘোষ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে জাপানের বিবাহ পদ্ধতি ভারতীয় হিন্দুদের মতো ছিল। বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পুত্র সন্তান প্রাপ্তি। কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল যে পুত্র সন্তান পিতৃকুলকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার করে। জাপানের আইনানুযায়ী পুরুষের ১৬ বছর ও মেয়েদের ১৩ বছর বয়স না হলে বিয়ে হতে পারে না। মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে পিতামাতা সুপাত্রের সন্ধান করেন। জাপানে বাল্যবিবাহের কোনো প্রচলন ছিল না। সেখানে বিয়ের জন্য কোনো ঘটক নেই, তাই কন্যার পিতা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সুপাত্রের সন্ধান করেন। এই ব্যক্তি পরবর্তীকালে বর ও কন্যার ঘটক-আত্মিয় হিসেবে গণ্য হন এবং সকল সাংসারিক বিবাদের

Dhaka University Institutional Repository

মিমাংসা করেন। ঘটক সুপাত্রের সন্ধান পেলে পিতামাতার মতানুযায়ী বর ও কন্যার সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা 'শুভদর্শন' নামে পরিচিত। বর ও কন্যা তখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারে। কিন্তু তারা ঐকমত্য না হলে বিয়ে সম্পন্ন হয় না। বর ও কন্যা সচরাচর পিতামাতার অমতে কোনো কিছু করতে পারে না(মন্মথনাথ, ১৯১০: ৯৫)।

মন্মথনাথ ঘোষ আরও লিখেছেন যে, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ রাজি হলে উভয়পক্ষ থেকে উপহার আদান প্রদান করা হয়। একে 'বাগদান' বলা হয়। বাগদান হলে বিয়ে অবশ্যম্ভাবী। তখন বিয়ের জন্য শুভদিন ধার্য করা হয়। জাপানে সাদা পোষাক শোকচিহ্নব্যঞ্জক। জাপানের বিয়ের প্রথা কিছুটা অদ্ভুত। বিয়ের দিন কন্যাকে সাদা পোষাক পরানো হয়। এর অর্থ হলো যে পিতামাতার পক্ষে কন্যার বিয়ে একপ্রকার মৃত্যু, কেননা বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে গেলে দেহে প্রাণ থাকতে কন্যা আর পিত্রালয়ে ফিরবে না। বিয়ে সম্পন্ন হবার পর ঘটক-আত্মীয় ও তাঁর স্ত্রী বর ও কন্যাকে যত্ন করে বরের বাড়িতে নিয়ে যায়। কন্যা পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল বাড়ি ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। কেননা তখন থেকেই কন্যা তাঁদের মতে মৃত। সুতরাং মৃতদেহ বাড়ি থেকে নিয়ে গেলে বাড়ি শোধন করার যে প্রক্রিয়া হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাপানিরাও তাই করে। এরপর বরপক্ষের বাড়িতে 'বৌভাতের' অনুষ্ঠান করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বর ও কন্যাকে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয় এবং কন্যা বরের পেছনে আসে। বাসর ঘরে প্রবেশের আগে ও পরে বর ও কন্যাকে কয়েকবার সুরা পান করতে হয়। সাধারণত বাসর ঘরে স্বামীকে আগে সুরা পান করতে হয়। কিন্তু যেহেতু প্রথমবার কন্যা অতিথিস্বরূপ, তাই প্রথমে কন্যাকে সুরা পান করতে দেওয়া হয়। এভাবে বিয়ে সম্পন্ন হলে রেজিস্টারি করা হয় (মন্মথনাথ, ১৯১০: ৯৬)।

মন্মথনাথ ঘোষের তথ্য অনুযায়ী জাপানে যাদের পুত্রসন্তান নেই, তারা কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তার স্বামীকে ঘর-জামাই রাখে এবং জামাতা শ্বশুরের একপ্রকার পোষ্যপুত্র হয়। তখন জামাতা পিতৃকুলের পদবি ত্যাগ করে শ্বশুরকুলের পদবি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। জামাতাকে সন্তানের মর্যাদা দেওয়া হয়, কেননা মনে করা হয় যে জামাতাই শ্বশুরকুলের পরলোকের আচার-আচরণ পালন করবে। শ্বশুরকুলের পরলোকের আচার-আচরণ পালন করার জন্য জাপানিদের পোষ্যপুত্র অতি আবশ্যক।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো জাপানেও স্ত্রীলোকদের তিন প্রকার বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। শৈশবে পিতার কাছে, যৌবনে স্বামীর কাছে ও বার্ধক্যে পুত্রের কাছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের কোনো প্রকার স্বাধীনতা নেই। এমনকি ধনাঢ্য স্ত্রীকেও স্বামীর অনুগত থাকতে হয়। ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতো স্বামীর ফরমায়েশ অনুযায়ী জাপানি স্ত্রী চলতে বাধ্য। জাপানি স্ত্রীর কোনো স্থানে বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হলে স্বামীর অনুমতি নিতে হয় এবং যাওয়ার পূর্বে স্বামীর চরণে প্রণাম করতে হয়। স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

আহারের সময় নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বামী যে কোনো সময় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে।

Rvcvb-gwnjvi mvgwRK Ae¯'v শীর্ষক একটি প্রবন্ধে স্ত্রীলোকদের অবশ্য ও অবধারিত করণীয় কর্তব্যসমূহ নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। সাতটি কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে যে কোনো সময় পরিত্যাগ করতে পারে। এই কারণগুলো হলো—(১) শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হলে; (২) বন্ধ্যা হলে; (৩) দুশ্চরিত্রা হলে; (৪) ঈর্ষাপরায়ণ হলে; (৫) কুষ্ঠ রোগ হলে; (৬) মুখরা হলে এবং (৭) চুরি করলে।

বিবাহিত হলে শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মান এবং স্বামীকে প্রভুর মতো মান্য করা স্ত্রীলোকদের প্রধান ও অবধারিত কর্তব্য। উপর্যুক্ত গ্রন্থে স্ত্রীলোকদের পাঁচটি প্রধান ও মারাত্মক রোগের উল্লেখ রয়েছে। এই পাঁচটি রোগ হলো— (১) অসন্তোষভাব (২) পরনিন্দা (৩) ঈর্ষা (৪) আলস্য ও (৫) অমনোযোগিতা। বলা হয়ে থাকে যে, জাপানে প্রতি দশজন স্ত্রীলোকের মধ্যে ৭/৮ জনকে এই সকল রোগে ধরে। এসব রোগের জন্য জাপানের নারী পুরুষ অপেক্ষা অধম। জাপানের স্ত্রীলোকেরা সব সময় স্বামীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য। জাপানের নিম্ন শ্রেণির লোকেরা কথায় কথায় স্ত্রী-ত্যাগ করে; কিন্তু ভদ্র সমাজে স্ত্রী-ত্যাগের ঘটনা বিরল। ১৮৮৮ সালে সেখানে যত বিয়ে হয়েছিল তার ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে পুরুষেরা স্ত্রী-ত্যাগ করেছিল (জাপান, ১৩১৫: ২৭২)।

জাপানে স্ত্রী বাড়ির প্রধান গৃহপরিচারিকা, তবু সকলেই তাকে 'ঠাকুরাণী' বলে সম্বোধন করে। খ্রিষ্টান সমাজের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য শিক্ষিত পুরুষেরা নারী জাতির সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করে। অনেক পূর্বে জাপানের সমাজে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৭৩ সালে সরকার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সে নিয়মের অবসান ঘটায়। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এখন জাপানে স্বামী ব্যভিচারী বা অত্যাচারী হলে স্ত্রী আদালতে উপস্থিত হয়ে স্বামীকে পরিত্যাগের আবেদন জানাতে পারেন (মন্মথনাথ, ১৯১০: ১৩৭)।

বিশ্বের অনেক সভ্যতায় শিশু ও নারী 'অবোধ্য' ও 'রহস্যপূর্ণ' হিসেবে অভিহিত। জাপানের চিত্রশিল্পে আদর্শ স্ত্রী হিসেবে নারীর হাতে সম্মার্জনী অঙ্কিত। তবে এই সম্মার্জনী স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত হবার জন্য নয়। এর অর্থ 'গৃহপরিষ্কারকারিনী'। বিশ্বের সকল সভ্যতায় নারীকে কোমলতার প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়; অন্যদিকে সকল নারী পুরুষের বীরত্ব পছন্দ করে। জাপানের নারীর মধ্যে দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব বিরাজমান—গার্হস্থ্য ও সামরিকভাব (Inazo, 1969: 73)।

'বুশিদো' নীতি নারীকে আদর্শ গৃহিনী হিসেবে সমাজে উপস্থাপন করতো। একই সঙ্গে নারীরা কোমলতা ছেড়ে দিয়ে পুরুষোচিত শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করতে পারতেন। বালিকারা অল্প বয়স

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই মনের ভাব সংযত করে ও মাংশপেশীগুলো সুদৃঢ় করে অস্ত্র চালনা করতে শিক্ষা লাভ করতো। তারা শৈশব থেকেই আত্মরক্ষার জন্য ‘নাগিনাতা’ নামে এক প্রকার তরবারি চালনা পদ্ধতি শিখতো। নারীর অস্ত্র চালনা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা ও সতীত্বরক্ষা। বালিকারা যৌবনে পদার্পণ করলেই পরিবার থেকে তাদের ‘কেইকেন’ নামে ক্ষুদ্র তরবারি উপহার দেওয়া হতো আত্মরক্ষা ও সতীত্বরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষার ও আত্মবিনাশের প্রকৃষ্ট প্রণালি না জানা জাপানি নারীর জন্য ছিল অপমানজনক। শরীরের কোনো অংশ ক্ষত করলে আত্মহত্যা সহজ হয়, কীভাবে পদযুগল শক্ত করে বেঁধে আত্মহত্যা করা যায় তা নারীর জন্য জানা বাধ্যতামূলক ছিল। মৃত্যুযন্ত্রণা যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন, জাপানি নারী কখনো তার শ্লীলতাহানি হতে দেবে না।

জাপানি নারীরা গীত-বাদ্যে সুনিপুণা ও নৃত্যকলায় সুদক্ষ। জাপানি সাহিত্য নারীবিষয়ক রচনায় পূর্ণ। জাপানের নারীর কাছে পরিবারই ছিল প্রধান বিষয়। পরিবারের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা দাসীর ন্যায় পরিশ্রম করতেন, প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিতেন। কন্যারূপে পিতার জন্য, পত্নী রূপে স্বামীর জন্য এবং মাতা রূপে পুত্রের জন্য জাপানি নারী তার প্রাণ উৎসর্গ করতেন। আত্মত্যাগের জন্য নিবেদিত নারীর জীবন। জাপানি নারীর আত্মত্যাগ ছিল স্বপ্রণোদিত। জাপানে সামুরাইদের সময় সেদেশের নারীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ছিল, সামুরাইরা পত্নীর নিন্দা করে। তবে শিক্ষিত সমাজে নারী প্রায় সমান অধিকার পেতেন। তবে পরবর্তীকালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানে শতকরা ৮০ ভাগ রমণী শিক্ষিত ছিলেন (জাপান, ১৩১৫ : ২৭৩-৭৬)।কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জাপানি মহিলাদের যে রূপ কবিতায় পরিবেশন করেছেন তা হলো—

ফুল-পাপড়ির জড়িমা-জড়িত আধ বিকশিত আঁখি,

উজ্জ্বল যেন ছুড়ির মতন, শান্ত যেন গো পাখী!

সুন্দরকিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,

বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পানি পাদ তার;

পান্ডু বদন, পান্ডু বরণ, মাথায় কেশের রাশি,

অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯১৮ : ৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের নারী-বিশ্ববিদ্যালয়

সমগ্র প্রাচ্যদেশের মধ্যে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জাপানেই আছে। টকিয়ো শহর থেকে তিন মাইল দূরে 'উষিগোম' নামক স্থানে 'নিপ্পন জোসী দাই গাক্কো' বা জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। ভূমিকম্প জাপানের নিত্যদিনের সাথি। তাই বিশ শতকের প্রারম্ভে জাপানের প্রথম মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ইট নির্মিত অনেক ছোট লাল বাড়ি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানিরা ফুল খুব ভালোবাসে, তাই এই মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ফলে-ফুলে সুশোভিত। এর মধ্যে আছে সুন্দর উদ্যান, অদূরে শস্য-শ্যামল ধানের ক্ষেত। এখানে বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রীদের আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ হাস্যধ্বনি, সুমধুর বাদ্যধ্বনি ও নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সংগীত শোনা যায়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে f\iZ g\n j\ নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়ঃ

> সিংহদ্বার হইতে যতই ভিতরে প্রবেশ করা যায় ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া ততই মুগ্ধ হইতে হয়। শান্ত, লজ্জাশীলা, ক্ষুদ্রকায়া জাপানী মহিলারা সেখানে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সঙ্গত—মুখে মধুর হাসি। তাহাদের কেশরচনার পরিপাট্য, পরিচ্ছদ পরিধানের প্রণালী এক একজনের এক প্রকার। কাহারো কেশ খাস জাপানী ধরনের, তাহারা 'কিমনো' পরিধান করিয়াছে। কাহারো কেশ বেণীর আকারে দোলায়িত, কাহারো বা চা'য়ের পেয়ালার মত, কাহারো বা তীর ধনুকের ন্যায়—এক একজনের এক আকারে রচিত। তাহারা মাথায় টুপী পরিধান করে না, নানাপ্রকার রঙ্গীন ফিতায় কেশ সজ্জিত করে। আর এক শ্রেণীর মহিলার পোষাক কতকাংশে জাপানী, কতকাংশে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। উপরার্দ্ধে জাপানী কিমনো—হাতগুলি খুব মোটা। নিম্নার্দ্ধে পাশ্চাত্য স্কার্টের মতন একরূপ নবোদ্ভাবিত 'হাকামা'। জাপানের শিক্ষিতা মহিলারা এখন এইরূপ পোষাকই পরিধান করেন। এই অর্দ্ধপ্রাচ্য অর্দ্ধপাশ্চাত্য পোষাক পরিহিতা বিভিন্ন বয়সের মহিলারা এখন জাপানের সর্বত্র; তাহারা দলে দলে পার্কে ভ্রমণ করিতেছে, দেবমন্দিরে গমন করিতেছে, অফিসে, ব্যাংকে, স্কুলে কাজ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী এইরূপ পোষাক পরিধান করে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের পোষাকও পরিধান করে। মুখের আকৃতি না দেখিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় বলিয়াই ভ্রম হয় (জাপানের, ১৩১৫ : ১৫)।

জিজো নারুসের অদম্য প্রচেষ্টা ও উৎসাহে জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বছর আমেরিকায় অবস্থান করে তিনি নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেন। অবশেষে স্ত্রীশিক্ষা অনুরাগীদের অর্থ সাহায্যে ১৯০০ সালে জিজো নারুসে জাপানের মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আরাধ্য বিষয় সত্য, শিব ও সুন্দর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন সোজো আশো নারীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

ছাত্রীদের সৌন্দর্যানুরাগের অনুশীলন বিষয়ে জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি। যে প্রকৃতই সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে এবং সেই অনুরাগ বিকশিত করতে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সচেষ্ট। এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু কেবল ছাত্রীদের সৌন্দর্য্যানুরাগের অনুশীলনই ছাত্রীদের প্রধান কাজ নয়। জাপানের ও জগতের সভ্যতার উন্নয়নের গতির সঙ্গে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়—যার ফলে নারীরা পত্নীরূপে, মায়ের রূপে নিজ নিজ দক্ষতায় যাতে আপন কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন—তা শিক্ষা দানই জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ লক্ষ্য।

এই প্রবন্ধে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, জাপানি সাহিত্য, শিক্ষাদান প্রণালি, সংগীত, শিল্প ও বিজ্ঞান অতি সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি এবং সেই লক্ষ্যে শারিরিক সৌন্দর্য্য ও বল বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামাগার, ধোপাখানা ও সঞ্চয়-ভান্ডার, গবেষণার জন্য পশু-পাখি রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিভাষিক gwnjv Mvn¯'-cwÎKv জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ আর্কষণ। অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীরাই প্রবন্ধ রচনা, মুদ্রণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-সহ সুসজ্জিত নাট্যশালা, দেশীয় ও ইউরোপীয় রান্নাঘর—যেখানে ছাত্রীরা নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক হলো নীতি বিজ্ঞান, পারিবারিক শিক্ষা, শিশু চরিত্র, উপকথা তত্ত্ব, পদ্য, গদ্য, সাহিত্যের ইতিহাস, ইংরেজি ভাষা, ইউরোপের কারুশিল্পের ইতিহাস, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ইতিহাস। অন্যদিকে ইচ্ছাধীন বিষয়ের মধ্যে রয়েছে দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাচীন চীন সাহিত্য, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দেওয়ানি কার্য্যবিধি, শিক্ষাদান প্রণালি, সংগীতবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা। জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'হাজারেরও বেশি ছাত্রী অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপক এবং আবাসিক ভবনের তত্ত্বাবধায়কদের সংখ্যা শতাধিক—তাঁদের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা। ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষক ও শিক্ষয়ত্রী রয়েছে। জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন খুবই কম। সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত না হলেও স্ত্রীশিক্ষানুরাগীদের অনুদান অনেক বেশি এবং রাজকর্মচারীদের স্বপ্রণোদিত সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি—সেজন্য জাপানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক উচ্চশিক্ষিত মহিলা বিয়ে করেন না। কিন্তু জাপানের

*Dhaka University Institutional Repository*

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রীদের হৃদয়ে আত্মনির্ভর ও স্বাধীনতা জন্মায়, কিন্তু বিয়েতে অবপ্রবৃত্তি জন্মায় না।

নাক, চোখ, মুখ ও দেহাবয়ব সকল বিষয় ধরলে সুন্দরী জাপানি মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তবে তাঁদের মুখের কমনীয়তা খুবই মনহরণকারী। জাপানি মহিলাদের সরল অন্তকরণ, সুশিক্ষা ও সুমার্জিত রুচির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি সুন্দর। তাঁদের প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন মার্জিত, সহজ, শান্ত ও সুন্দর। জাপানি মহিলাদের সাধারণত কোনো ব্যস্ততা নেই, নেই কোনো জড়তা(জাপানের, ১৩১৫ : ১৮)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৬১)-এর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, ত্যাগী ও রাজনীতিমনস্ক। তিনি দীর্ঘদিন জাপানে বাস করেন এবং জাপানি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। জাপান সম্পর্কে তাঁর ৪টি মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে। এসকল গ্রন্থের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত R¡c¡b শীর্ষক একটি গ্রন্থ রয়েছে। জাপান সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বিশ্বাসযোগ্য অবশ্য সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি বলেন যে, জাপানি মহিলাদের কেশ তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রগাঢ় বিশ্বাস বা প্রেমের তাড়নাতেই এই অমূল্য সম্পদ তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। জাপানের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রমণী বিধবা হলে তাঁর কেশের কিছু অংশ কেটে মৃত স্বামীর শয্যার পার্শে রাখেন এবং শবের সঙ্গে তা প্রোথিত হয়।[১৬] মৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে ধরে রাখার জন্যই তিনি স্বহস্তে তাঁর সুদীর্ঘ চিক্কন কেশরাশি কেটে ফেলেন। এই অতুলনীয় দান মৃত স্বামীর পায়ে রেখে দেন এবং তা আর বাড়তে দেন না (সুরেশচন্দ্র, ১৩১৭ : ৯২-৩)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আরো তথ্য লিখেছেন—

> কেশবিন্যাসকারিণী সঙ্গে ক্ষুর লইয়া আসে, কারণ জাপানী স্ত্রী-লোকেরা মুখের সর্ব্বত্র কামান! ইহার প্রয়োজনীয়তা কি তা বুঝতে পারি না। আজ কালকার মেয়েরা বিদেশি ধরণ ও জাপানী ধরণ মিশ্রিত করে চুল বাধ্‌বার এক নুতন ধরণ উদ্ভাবন করচেন। অল্পবয়স্কা বালিকারা অনেকটা আমাদের দেশের মতই বিনুনি বেঁধে ঝুলিয়ে দেন। ইঁহারা চুলে ফুল পরেন, সাধারণত কৃত্রিম। জাপান, রেশম বা মখমল দ্বারা কৃত্রিম ফুল তৈয়ারি বিষয়ে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করেচে। রিবন বা রঙিন ফিতাও কেশের সন্দৌর্য্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। ফিতা চুলের উপর জড়ান হয় না, ফুলের মত কেশের সঙ্গে কাঁটা দ্বারা সংযুক্ত করে রাখা হয়। যে চিরুণি ব্যবহৃত হয় তা রমণীর অবস্থা অনুসারে স্বর্ণমণ্ডিত বা মূল্যবান প্রস্তরে মণ্ডিত

১৬.সে সময় জাপানিদের শবদেহ দাহ না করে কবর দেওয়া হতো।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। অনেক সময়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পুস্প বা প্রজাপতি কেশের শোভাবর্দ্ধন করে। চুলের কাঁটাগুলিও স্বর্ণ, রৌপ্য, ঝিনুক বা 'ল্যাকার' নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য যে আজ কালকার শিক্ষিতা মেয়েদের সাজসজ্জা, চুলবাঁধা প্রভৃতি দেখে সেকেলে বৃদ্ধারা বড় দুঃখ প্রকাশ করেন। এ দুঃখ যে নিঃস্বার্থ তা বল্‌তে পারি না। নিজে যা করতে পারিনা বা করবার উপায় নাই, তা করছে দেখ্‌লে স্বভাবতই দুঃখ হয়। অনেকেই, যাঁরা পরের ভাল দেখ্‌তে পারেন না, আজ কালকার মেয়েদের 'হাইকারা' ব'লে থাকেন (সুরেশচন্দ্র, ১৩১৭ : ৯৪-৯৫)।

জাপানি নারীর গার্হস্থ্য জীবন

সুরেশচন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী জাপানি মহিলাদের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। এশিয়ার অন্য কোনো দেশের সঙ্গে জাপানি মহিলাদের পারিবারিক জীবন তুলনীয় নয়। রান্নার কাজ করতে তাঁদের সমস্ত সময় কেটে যায় না, তাঁরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম করার সময় পান। বাড়ির বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের কিছুটা যোগসুত্র ঘটে। জাপানি রমণী ভোর প্রায় ৫টার সময় ঘুম থেকে জেগে প্রাতকৃত্যাদি সম্পন্ন করে তাঁর স্বামীর জন্য প্রাতরাশ তৈরি করতে গৃহপরিচারিকাকে সহায়তা করেন।[১৭] গৃহপরিচারিকা ঘরের সকলের ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই রান্নাঘরে উনানে আগুন দেয় ও ঘরের জানালা খুলে দেয়। জানালা খোলার শব্দে ও ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশের ফলে সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জাপানের সংসারে গৃহিনী ও চাকরানি উভয়কেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। যে সকল কাজ তাঁদের করতে হয় তার মধ্যে 'ওবেন্তো'[১৮] বানানো, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে সাহায্য করা প্রধান। জাপানে ভারতীয় হিন্দুদের মতো গৃহ-দেবীর তথা লক্ষ্মী আসনের মতো বুদ্ধদেবের আসন রয়েছে। জাপানি নারী সেখানে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে দেন এবং জল ও চালের নৈবেদ্য দিয়ে কিছুক্ষণ আরাধনা করেন। এরপর গৃহিণী স্বামীর সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ করে স্বামীর অফিসে যাবার প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন।

স্বামী কুরুমা বা গাড়িতে চলে যাবার সময় হাঁটু গেঁড়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বলেনঃ 'ইত্তে ইরাষ্‌ষাই মাষি' বা গিয়ে আসুন (সুরেশচন্দ্র, ১৩১৭ : ১০০)। স্বামী আফিসে চলে যাবার পরে দু'ঘণ্টা ধরে ঘর-দুয়ার ঝাড় দেওয়া, বিছানা রোদে দেওয়া ইত্যাদি কাজ স্ত্রীকে করতে হয়। তবে 'তামামি' বা 'মাদুর' অনেক সময় সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায় না এবং এক বছরে একদিন পুলিশের তত্ত্বাবধানে পাড়ার সকল বাড়ি পরিষ্কার করা হয়, যাকে 'ওসোজি' বলা হয়। যাহোক, এরপর দুপুর

১৭. সে সময় কোনো কোনো বাড়িতে কাজের লোক ছিল। কিন্তু বর্তমানে জাপানের সম্রাট ও বড় বড় শিল্পপতি ব্যতীত কারও বাড়িতে কাজের লোক নেই।

১৮. বাঁশের তৈরি দুপুরের খাদ্য সরবরাহের পাত্র।

*Dhaka University Institutional Repository*

পর্যন্ত স্ত্রীর অবকাশ। সে সময় তিনি খবরের কাগজ পড়েন, সংসারের হিসাব লেখেন, সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য দোকানদারকে বলে দেন।

জাপানিদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, দুপুরের খাবার সকলেই নির্দিষ্ট সময় খাবে। ছুটির দিনে এই দুপুরের খাবার বাড়িতে খুব সাধারণ গোছের হয়, কেননা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সকলেই বাইরে ভোজন করেন। গরমের দিনে স্ত্রী ও বাড়ির সকল মহিলা একটু ঘুমিয়ে নেন এবং পরে তাঁরা একটু বেড়িয়ে আসেন। কখনো সংসারের জিনিষপত্র কেনেন, কখনো বা বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যান। তবে অবশ্যই স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসার আগেই স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরতে হয়। এই প্রথাটি খুব সুন্দর, কেননা সারাদিন পরিশ্রম করে স্বামী যখন বাড়িতে ক্লান্ত হয়ে ফেরেন, তখন দরজার কাছে বসে স্বামীকে অভ্যর্থনা করা জাপানি স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য (সুরেশচন্দ্র, ১৩১৭ : ১০১-১০২)।

বেলা ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে জাপানি ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসে, তখন নিস্তব্ধ বাড়ি আবার তাদের হর্ষ ও কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। ঐ সময় কেশবিন্যাসকারী এসে বাড়ির মেয়েদের চুল বেঁধে দেয়। ছেলেরা বাড়ির উঠানে খেলাধুলা করে এবং মা এসময় মেয়েদের 'কোতো'[১৯] ও 'সামিসেন'[২০] বাজাতে এবং ধৈর্য্য সহকারে মেয়েদের আদব-কায়দা শেখান। স্বামী এসময় বাড়িতে ফিরে এলে তাঁকে অফিসের পোষাক ছেড়ে আরামদায়ক 'কিমনো' পড়তে সহায়তা করেন। জাপানিরা সকলেই কাজের শেষে সন্ধ্যায় বা রাতে খাবার আগে স্নান করে থাকেন। তারপর সন্ধ্যার সময় নৈশ খাবার। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সুন্দর তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, গরমের দিনে সন্ধ্যাভোজনের পরে প্রায় সকলে মিলে বেড়াতে যায়। তবে এক্ষেত্রে অদ্ভুত হলো যে জাপানি স্বামী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ালেও স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বেশ কিছু আগে চলেন, যেন ভদ্রমহিলাকে চেনেনই না। স্বামী ও স্ত্রী পাশাপাশি হাটতে কুণ্ঠা বোধ করেন। কিন্তু জাপানিরা আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণের পর এই বিষয়টির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের হাত ধরে পাশাপাশি চলেন (সুরেশচন্দ্র, ১৯১৭ : ১০৪)।

প্রসিদ্ধ ফরাসি পর্যটক এবং ঔপন্যাসিক পিয়ের লোটি জাপানি সুন্দরীদের চন্দ্রমল্লিকা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য তখন থেকে জাপানের সময় ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৩৮ সালে সরোজ নাথ ঘোষ ‡ek-b¨vix cÖ‡Z শীর্ষক গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। লেখক হিসেবে সরোজ নাথ ঘোষের কোনো পরিচয় কোনো অভিধানে পাওয়া যায়নি। তাই কীভাবে সরোজ নাথ

---

১৯. এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

২০. এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

*Dhaka University Institutional Repository*

ঘোষ জাপান ও ত্রিশ শতকের বিশ্ব সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করলেন তা পরিষ্কার নয়। যাহোক, সরোজ নাথ ঘোষ দেখাতে চেয়েছেন যে, জাপান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বর্ণশিখরে উন্নীত হলেও জাপানি নারী তখনও অবহেলিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবন ধারার সঙ্গে নারীর পরিচয় ঘটলেও জাপানে নারীর কোনো স্বাধীন সত্ত্বা নেই। তবে যাঁরা ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে বিদ্যার্জ্জন করেছেন, সেসব জাপানি রমণী বশ্যতা স্বীকার করতে চান না (সরোজ: ১৩৪৫: ১১৫)।

প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী পিতামাতা তাঁদের মনোনীত পাত্রে কন্যার বিয়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো জাপানি নারী এরূপ ব্যবস্থায় ইদানিং সম্মত হচ্ছেন না। পাশ্চাত শিক্ষায় শিক্ষিত জাপানি নারী আরো এক ধাপ এগিয়ে আছেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পিতামাতার মনোনীত পাত্রকে জাপানি নারী বিয়ে করতে আদৌ রাজি নন। সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় যে, আমেরিকা থেকে বিদ্যার্জ্জন করে জাপানি নারী স্বদেশে ফেরার সময় জানতে পেলেন যে তাঁর পিতামাতা তাঁর বিয়ে ঠিক করেছেন। তরুণীর মনে তখন পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান এবং এই অবস্থায় জাহাজ থেকে পিতা-মাতাকে তিনি জানাতে বাধ্য হলেন যে যাকে কোনোদিন দেখেননি, যার সঙ্গে কোনো আলাপ-পরিচয় নেই, তাকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব। জাপানি নারীর প্রধান কর্তব্য হলো পিতামাতার বাধ্য থাকা। এরূপ পরিস্থিতির তথা এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় মৃত্যু। জাহাজ থেকে চিঠি লিখে ইয়োকোহামা পৌঁছার আগেই জাপানি তরুণী জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জাপানি নারী কখনো পিতামাতার অবাধ্য হন না। বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেম তাঁদের স্বভাবধর্ম। জাপানি নারীরা সাধারণত ধর্মবিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম জাপানের প্রচলিত ধর্ম। প্রত্যেক জাপানি নারী একান্ত বিশ্বাসে বৌদ্ধধর্ম পালন করেন এবং স্বদেশ প্রেম তাঁদের অস্থি-মজ্জাগত (সরোজ: ১৩৪৫: ১১৬)।

আগেই একথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সভ্যতায় সময় পরিবর্তন আনে। জাপানি সভ্যতায়ও পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন সময়। রক্ষণশীল জাপানি সমাজে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে কমোডর পেরির জাপান অভিযানের পর পরই। নর ও নারীর বন্ধুত্ব জাপানে স্বাভাবিক না হলেও একেবারে বিরল ঘটনা নয়। ত্রিশের দশকে জাপানের বড় বড় শহরে যেমন টোকিও শহরে গভীর রাত পর্যন্ত নাচের আসর পূর্ণোদ্দ্যমে চলতো। সরোজ নাথ ঘোষ লিখেছেন—

> জাজ-নৃত্য ও বাদ্য সেই মজলিশের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু জাপানীরা এরূপ ব্যাপারের ঘোর বিরোধী। তাহারা এইরূপ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। একবার কিছুদিন পূর্ব্বে টোকিওর কোনও হোটেলে কয়েকজন প্রগতি বাদিনী জাপানী নারী ও প্রগতিশীল পুরুষ নৃত্যগীত করিতেছিল। একদল জাপানী ছাত্র হোটেলে প্রবেশ করিয়া নৃত্যরত নারী ও

Dhaka University Institutional Repository

> পুরুষদিগকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেয়। তাহারা ঐ সকল তরুণ তরুণীকে বলে যে, তাহারা দেশের কুলাঙ্গার। কিন্তু যে সকল বিদেশি সেই আসরে ছিলেন, তাহাদিগকে যুবক ছাত্রদল কোনো কথাই বলে নাই (সরোজ, ১৩৪৫ : ১১৫)।

টোকিও শহরে প্রতীচ্য রীতিতে হোটেল বা চায়ের দোকান নেই। কোথাও জাপানি তরুণ-তরুণীদের কোনো স্থানে একত্র বসে আমোদ-প্রমোদ ও পানাহার করতে দেখা যাবে না। তারা এসকল ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়, কেননা এই অবস্থা অনাচার হিসেবে জাপানে নিন্দিত। অবাধে প্রেম করা জাপানের রীতি-নীতির বিরোধী। প্রকাশ্যে চুম্বন জাপানের সর্বত্র নিষিদ্ধ। সেখানে নারী পবিত্র ও সংযত জীবন পছন্দ করে। সংসার ধর্মের প্রতি জাপানি নারীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সন্তান পালন ও গৃহের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থায় নারী সুগৃহিনী।

বাইরের জীবন যাত্রায় জাপান ইউরোপীয় রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করলেও, নিজ নিজ গৃহে সে বিলাস জাপানিরা আদৌ পছন্দ করে না। জাপানি নারী কিমোনো ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। জাপানি নারীর লজ্জা নিরাভরণ থাকলেও তা নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু তাদের স্কন্ধের পশ্চাৎদেশ নিরাভরণ থাকলে অবশ্যই নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়।

ত্রিশের দশকে জাপানে ৮৫ হাজার কারখানা ছিল এবং এসব কারখানায় স্ত্রী ও পুরুষ কাজ করতো। কিন্তু জাপানি নারীরা পুরুষের মত নিষ্ঠার সঙ্গে সমান কাজ করলেও তারা অতি অল্প পায় মজুরি। রাজভক্তি জাপানি নারীর মধ্যেও প্রবল। তারা রাজাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। রাজার জন্য প্রাণদান শুধু পুরুষেদেরই নয়, জাপানি নারীদেরও কাম্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাপানে গেইশা নামে একপ্রকার বারবনিতা রয়েছে—যারা স্কুলে লেখাপড়া, নৃত্যগীত শিক্ষা করে থাকে। তাদের আচরণ যেমন ভদ্র, তেমনি বিনয়ী ও নম্র। জাপানি নারীর বিনয় নম্র ব্যবহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় প্রভাব জাপানে প্রবল হলেও নারীরা প্রতীচ্য প্রভাবে আত্মহত্যা করেনি। তারা স্বদেশের, স্বজাতির বৈশিষ্ট্য, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম বজায়ও অক্ষুণ্ন রেখেছেন (মন্মথনাথ, ১৯১০: ১৩৭)।

জাপানি নারীরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন। স্বাস্থ্যরক্ষা যে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ একথা কোনো জাপানি নারীকে শিখাতে হয় না। স্বাভাবিক কারণে জাপানে অশিক্ষিত নারীর সংখ্যা অতি অল্প, অন্যদিকে শিক্ষার জন্য আগ্রহ সকলের। ললিতকলায় শহর ও গ্রামের নারীর আগ্রহ প্রচুর। নৃত্যগীত ইত্যাদি ললিত কলায় শহর ও গ্রামের নারীরা প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীন এ্যাসেরিয়া সভ্যতার মতো জাপানে সামরিক প্রথার প্রচুর সমাদর এবং সেজন্য নারীরাও সামরিক চর্চার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক জাপানি নারীর কাম্য যে, তার পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ও সন্তান সকলেই বীর হিসেবে সমাজে পরিচিত হোক।

অতিথিপরায়ণতাও জাপানি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হরিপ্রভা তাকেদা তাঁর e½gwnjvi Rvcvb hvÎv শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তার জাপানি শ্বাশুড়ি তার জন্য নিজ হাতে খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ থেকে আরও তথ্য পাওয়া যায় যে, হরিপ্রভার গল্প শোনার জন্য সন্ধ্যাকালে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা দিবসের কাজ শেষ করে এসে জড়ো হতো (হরিপ্রভা, ১৯১৫: ৩৬-৩৭)। জাপানি নারীরা অতিথির সমাদর করতে জানেন। অতিথির সম্ভ্রম রক্ষায় পুরুষের ন্যায় নারী উদাসীন নন। ত্রিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিয়ে সম্বন্ধে চীন ও জাপানের নিয়ম অনেকটা অভিন্ন ছিল। ত্রিশের দশকের পরে জাপানের বিয়ের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। ধর্মের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ এবং একথা জাপানিরা ভালো করে বুঝে—এজন্য সেখানে ব্যভিচার নিন্দিত। এই সময় জাপানে বিয়ে বিচ্ছেদ ছিল প্রায় অপ্রচলিত। স্বামীপরায়ণ জাপানি নারী বিয়ে বিচ্ছেদ কামনা করেন না।

অবশ্য পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে—প্রতীচ্য-শিক্ষিত জাপানি নারীদের মধ্যে ক্ষোভের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলেও সাধারণভাবে প্রতিবাদ প্রবল হবার সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ মনে করেন জাপানি নারীর কোনও বিষয়ে সত্তাধিকার না থাকলেও, জাপানি পুরুষ নারীকে কোনো প্রকার অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না—বরং শ্রদ্ধার অঞ্জলীই তাকে প্রদান করে। অন্যদিকে জাপানি নারীরা নিজেদের অবস্থায় আদৌ অসন্তুষ্ট নন (Isle, 2006: 59)।

আনোয়ার হোসেন নামে একজন বাঙালি লেখক AvaybK Rvcvb শিরোনামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Rvcvb ও কিছু ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্যে নিজের বইটি প্রণয়ন করেছেন। আনোয়ার হোসেন উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ এম.এ. বি.টি.। সুতরাং আনোয়ার হোসেনের পক্ষে সমকালীন ইংরেজি গ্রন্থ ও দেশ বিদেশের প্রবন্ধ পত্রিকা পাঠ করা সহজ ছিল। আনোয়ার হোসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তিনি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৯৩)-এর জাপানি যুদ্ধের ডায়েরিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা দেননি। তিনি চল্লিশের দশকে জাপানি নারীর অবস্থা আলোচনা করেছেন অনেকটা নিখুঁতভাবে। জাপানের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেছেন নির্ভরযোগ্য ইংরেজি গ্রন্থের সহায়তায়। প্রথমেই তিনি জাপানি নারীর অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> জাপানী নারী এই প্রগতির যুগে ঘরের কোণে বসিয়া নাই। জিবিকার্জ্জনের চাপে পড়িয়া তাহারা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বাস্ চালনা, এরোপ্লেনের মধ্যে খাদ্য পরিবেশনের কাজ এবং যাত্রীগণের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন, দোকানের কাজ, রেস্তরাতে পরিবেশন এবং চাকরাণীর কাজ, ষ্টীমারে যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা, টাইপ করা,—guide এর কাজ ইত্যাদি নানা কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 'অন্ন চিন্তা চমৎকার', তাই জাপানী নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে (আনোয়ার, ১৯৪১ : ৫৬)।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাহায্যে জাপান সম্পর্কে আনোয়ার হোসেন নতুন তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। এই নতুন তথ্য হলো জাপানে সুন্দরী প্রতিযোগিতা বা 'মিস্ নিপ্পন' আবিষ্কারের প্রয়াস। এখানে জাপান ইউরোপকে অনুকরণ করেছে। ১৯৩১ সালে Avmvnx পত্রিকার পঞ্চাশ বর্ষ উদ্ যাপনের সময় জাপানে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে জাপানি নারীদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। জাপানের Avmvnx[২১] আয়োজিত এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় বিষয় ছিল বহুসংখ্যক উচ্চবিত্ত জাপানি যুবতীর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়ম ছিল বয়স ও পেশা। যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং যারা থিয়েটার ও নৃত্য অনুষ্ঠানের যোগদান করে না, কেবল তারাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যই এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

প্রতিযোগীদের প্রেরিত ছবির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রায় ১ হাজার জাপানি যুবতী প্রতিযোগিতায় ২ হাজার ৮ শত ছবি পাঠিয়েছিল। ছবিগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সাধারণ জনগণের ভোটে 'মিস্ নিপ্পন' নির্বাচিত হন। ভোটার ছিলেন ৫৬,২৬৪ জন মিস তাওয়ারী ৬৩৭৫ ভোট পেয়ে 'মিস্ নিপ্পন' নির্বাচিত হন। 'মিস্ নিপ্পন' নির্বাচিত হলে উপহার হিসেবে তাঁকে তাঁর নিজের একখানা তৈলচিত্র, ফুজিওয়ারা যুগের ফ্যাশনের একটি সুন্দর আয়না, একটি সুন্দর কিমোনো এবং একটি মিস্ নিপ্পনের ছবি প্রদান করা হয়েছিল (আনোয়ার, ১৯৪১ : ৫৯-৬০)।

আনোয়ার হোসেন জাপানি নারীর পোষাকের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন। ১৫০০ বছর পূর্বে যখন জাপানে কোরীয় ও চীনা সংস্কৃতি প্রবেশ করে, তখন থেকে কবরের ভিতরে যে সকল মৃন্ময় মূর্তি আবিষ্কার করা হয় তা থেকে মনে করা হয় যে, জাপানে সেই যুগে 'কোট' ও 'হাকামার' (ঢিলা পায়জামা) প্রচলন ছিল। আধুনিক ফ্যাশানের কিমোনো থেকে ঐ যুগের কোট একটু বিভিন্ন ধরনের ছিল—পাশ্চাত্য কোট সরু ও হাতওয়ালা এবং আজানুলম্বিত।

---

২১. জাপানের 'Avmvnx© পত্রিকার পুরোনাম 'আসহী সিমবুম'।

*Dhaka University Institutional Repository*

নারা যুগে অর্থাৎ ৭১০-৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে অভিজাত বংশের জাপানি নারীরা চীনাদের অনুকরণে খুব জমকালো পোষাক পরতেন। নারীরা এই পোষাকের মধ্যে দেবতার প্রতিক খুঁজে পান। এই পোষাকের মধ্যে নানা রং এবং কারুকার্যের বাহার ছিল। পুরুষেরা পায়জামা আর কোট এবং মেয়েরা স্কার্টস্ ও কোট পরতেন। মাথায় মুকুট ধারণ করা ছিল অভিজাত পুরষদের লক্ষণ। মেয়েরা মাথার চুল বেনীর মতো করে বাঁধতো—পুরুষের মাথার মুকুটের সঙ্গে যার সাযুজ্য ছিল। সে যুগে পোষাকের ভিন্ন ভিন্ন রং সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচায়ক ছিল। প্রতীক ও রূপকধর্মী এই ধারণার উৎপত্তি চীন থেকে। জাপানি সমাজের সর্বোচ্চ আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল হলদে রং, তারপর বেগুণে, লাল, সবুজ ও গাঢ় নীল বর্ণের স্থান। জাপানিদের মধ্যে যে কোনো লোক ইচ্ছা করলেই যে কোনো পোষাক পরতে পারতো না, কেননা আইনের মাধ্যমে রং-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হতো(আনোয়ার, ১৯৪১ : ৬১)।

হেইয়ান যুগে তথা ৭১৪-১০৮৩ সালে যখন জাপান চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে, তখন জাপানি জনগণ রুচিসম্মত পোষাক ব্যবহারের চেষ্টা করে। চীনাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার এই ছিল প্রথম প্রয়াস। এই যুগে প্রচলন হয় ঢিলা পোষাকের। অভিজাত বংশের লোকজন নিজেদের বাড়িতে মাদুরের উপর পা গুটিয়ে উপবেশন করতো। মাদুরের উপর বসতে সুবিধা হয় এবং গ্রীষ্মকালের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ রেখে উপযোগী পোষাক তৈরি করা হতো।

জাপানে চারটি প্রধান ঋতু। জাপানিরা বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পোষাক পরতো। বসন্তের ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাল পোষাক, গ্রীষ্মের ফুলের সঙ্গে মিল রেখে বেগুণী রং-এর পোষাক তারা ব্যবহার করতো। প্রকৃতির সঙ্গে মনের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনই এ ধরনের পোষাক পরার উদ্দেশ্য। নববর্ষ উৎসবের বিষয়ে হরিপ্রভা তাকেদার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, নববর্ষের পূর্ব দিন সকল জাপানিরা ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে, বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে, নতুন কাপড় পরিধান করে, বাড়ি-ঘরকে সু-সজ্জিত করে। নববর্ষ উপলক্ষে জাপানে বহু আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হয় এবং মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়ার রীতি প্রলচিত রয়েছে (হরিপ্রভা, ১৯১৫: ৩৯)।

কামাকুরা ও মুরোকাচা যুগে অর্থাৎ ১১৯৪-১৫৭২ সালে সামুরাইরা ছিলেন দেশের শাসনকর্তা। ফলে আগের যুগের ফ্যাশন ও পোষাকাদির পরিবর্তন হয়। জমকালো পোষাক অপ্রচলিত হয়ে যায়। আগের যুগের সাধারণ পোষাকই তখন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ সাজসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সাদাসিধে জীবনযাপন ও ফ্যাশনের বাহাদুরি প্রত্যাখ্যান। জাপানি নারী তখন ‘হাকামা’ বা জাপানি পায়জামা পরা ছেড়ে দেন এবং পরিবর্তিত আকারে ‘কিমোনো’ ধারণ করেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

ইয়েদো যুগের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির স্থান পরবর্তীকালে অধিকার করে মেইজি যুগের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি। পাশ্চাত্য যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে জাপান তখন নানাদিক থেকে এক আমূল পরিবর্তনের সন্মুখীন হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি জাপানকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে এই আমূল সংস্কার ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে জাপানিদের মনে এক গোপন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং উন্নত ও খাঁটি জাপানি পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের জন্য সকলের মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ জাপানিদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। কিন্তু জাপানিদের এই স্বদেশীভাবও দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর জাপানিদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার পরিবর্তনের সূচনা হয়। আনোয়ার হোসেন লিখেছেন—

> নূতন ধরনের দালান-কোঠা, ঘরবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ রীতিনীতি সবই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফল। পাশ্চাত্য পোষাকে সজ্জিত হইয়া চলাফেরা এবং কাজকর্ম্ম করা সুবিধাজনক এই জন্যই হয়তো জাপানীরা এই পোষাকের এতো ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভক্তের সংখ্যা এখনও খুব বেশি নয়, শতকরা মাত্র ৩ জন। তবে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে জাপানী নরনারী সৌন্দর্য ও সুরুচিজ্ঞাপক জমকালো পোষাকের পরিবর্তে পশ্চিমের কারাছাঁটা, কর্ম্মোপযোগী, সংক্ষিপ্ত ধরনের পোষাকই পরিতে শিখিবে (আনোয়ার, ১৯৪১ : ৬৫)।

অকিঞ্চন দাস নামে একজন বাঙালি 'জাপানি জাতির বিশেষত্ব' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন be¨fviZ পত্রিকায় ১৯১৫ সালে। অকিঞ্চন দাসের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে জাপান আপন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ভুলে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এসময় বিচক্ষণ-বুদ্ধি সম্পন্ন কাউন্ট ওকুমা জাপানের নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশনে বলেন যে, জাপানের সামাজিক ভিত্তি হলো পরিবার এবং একে কোনোভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। জাপানি স্ত্রীলোকের পক্ষে পাশ্চাতের মতো স্বাধীনতা লাভ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, এমন কি জাপানি পুরুষেরাও জাপানি রাজ-সরকারের অনুমতি ব্যতীত পাশ্চাতের অনুকরণপ্রিয়তার চর্চা করতে পারে না। জাপানে পারিবারিক বন্ধন এমন সুদৃঢ় এবং সন্নিবদ্ধ যে, ব্যক্তিত্বের খামখেয়ালি সেখানে গ্রাহ্য হয় না। জাপানের রাজা ঐক্যের প্রতীক এবং জনতা অবিশ্বাস্যভাবে রাজভক্ত। কেননা মেইজি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাদের সকল উন্নয়নের মূল ভিত্তি রচনা করে। অকিঞ্চন দাস মন্তব্য করেছেন—

> জাপান এই রহস্যটী বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে বলিয়াই ব্যক্তিত্বের ভূমিতে ইউরোপের সঙ্গে তাহার কোনো রূপ যোগ নাই। তাই জাপানকে কেহ কেহ 'a family-nation' বলিয়া থাকেন। জাপানে পারিবারিক জীবনই জাতীয় জীবনের ভিত্তি এবং পিতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে

*Dhaka University Institutional Repository*

> লইয়াই পারিবারিক সংগঠন, স্বামী ও স্ত্রী লইয়া নহে। জেষ্ঠ্য পুত্র কোনো বিশেষ জীবনযাত্রার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত নহে, কিসে সে তাহার পারিবারিক কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। কনিষ্ঠ পুত্ররা, নির্ব্বিবাদে পিতার জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুশাসনে থাকিয়াই সুখী। কন্যাগণ, বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতার উদারতাবশত অনেক স্বাধীনতা ও সুবিধালাভ করিয়াও, পিতা ভ্রাতা ও স্বামীর কাছে সতত সন্নত থাকিতে বাধ্য। সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ বাধ্যবাধকতার ভিতরে থাকিয়াও জাপানী জীবন আজ সমধিক সমুন্নত। ইহার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে ভোগধর্ম্মা আত্মসুখ-পরায়ণ একদেশ-দর্শী ইউরোপীয় সভ্যতার এখনও অনেক বাকি (অকিঞ্চন দাস, ১৩২২ : ৬২৯)।

চারুচন্দ্র ঘোষ নামে একজন বাঙালি Rvcv‡bi Db¥Z nBj ¶Ki|‡c শিরোনামে ১৯১৭ সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। চারুচন্দ্র ঘোষ জাপান ভ্রমণ করেছিলেন এবং এই তথ্য তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পরিধেয় বস্ত্র ও স্নান

চারুচন্দ্র ঘোষ তাঁর Rvcv‡bi Db¥Z nBj ¶Ki|‡c গ্রন্থে তথ্য লিখেছেন যে, জাপানিরা পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে কিমোনো ব্যবহার করে। তবে অন্তর্বাস হিসেবে পুরষেরা জাঙ্গিয়া ও স্ত্রীলোকেরা পাতলা লুঙ্গি ব্যবহার করে। এই পোষাকেই গেটা বা খড়ম পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। তবে পুরুষেরা অফিস ও অন্যান্য কাজে পাশ্চাত্য পোষাক তথা বিলেতি টুপি, কোট, প্যান্ট ব্যবহার শুরু করেছে। স্ত্রীলোকেরা বিলেতি পোষাক ব্যবহার করে না। নিম্নশ্রেণির জাপানিরা পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষে আঁটা পায়জামা পরে। শীতকালে পুরুষ-স্ত্রী সকলে পায়ে মোটা কাপড়ের বা রাবার দেওয়া কাপড়ের মোজা ব্যবহার করে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অন্য আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ফাঁক থাকাতে এই মোজার উপর খড়ম পরা যায়। সাধারণভাবে জাপানিরা প্রত্যেক দিন স্নান করে। জাপানিদের স্নান প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন—

> অতি গরম জলে স্নান করে বলিয়া স্নানের জন্য খরচ আছে। সাধারণ গৃহস্তের বাড়িতে স্নানের বন্দোবস্ত নাই। সাধারণ স্নানাগরে গিয়া স্নান করিতে হয়। স্নানাগারে বড় বড় চৌবাচ্চায় জল থাকে। ইহাতে নামিয়া আভাঙ[22] করিয়া স্নান করা হয়। কাপড় পরিয়া ইহাতে নামিবার নিয়ম নাই। উপরে সাবান দিয়া ঘা ঘসিয়া ধুইয়া উলঙ্গবস্থায় চৌবাচ্চায় নামিতে হয়। পনরো-কুড়ি বৎসর পুর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই একই স্নানাগারে এক সঙ্গে স্নান করিত। এখন স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নানাগার পৃথক ((চারুচন্দ্র, ১৯১৭ : ১৬)।

---

২২. নগ্ন হয়ে স্নান করার পদ্ধতি।

*Dhaka University Institutional Repository*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ১৯১৬, ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও নগ্ন স্নান দেখেছেন এবং জাপানের নগ্ন স্নান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কবি নগ্ন স্নানের মধ্যে কুরুচিকর কোনো কিছু খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

> এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে; অন্যত্র মেয়ে পুরুষের মাঝখানে যে-একটা লজ্জা-সংকোচের আবিলতা আছে এখানে তা নেই। মনে হয়, এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে লেশমাত্র কলুষ নেই তার প্রমাণ এই- নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি ক'রে এখানে স্ত্রী-পুরুষের দেহ পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষ-দৃষ্টি দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ৮০৮১)।

জাপানি নারীর রূপ

বাঙালি রসিকলাল গুপ্ত ১৯০৯ সালে be\b R\c\b শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রসিকলাল গুপ্ত আইনজীবী, তিনি কীভাবে এই গ্রন্থ রচন করেছেন—তার কোনো উৎস উল্লেখ করেননি। সম্ভবত তিনি ইতোমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকার সাহায্যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। রসিকলাল গুপ্ত লিখেছেন যে, জাপানি নারীর সংসারই স্বর্গ। সেবা তাঁর অন্যতম মহান কাজ। গুরুজনদের ভক্তি ও অনুগত পরিচারিকার মত সেবা-শুশ্রূষা করে তাঁরা অপার তৃপ্তি লাভ করে। জাপানি নারীরা ছোট-বড় সকলের অনুবর্তি হয়ে সংসারের দায়িত্ব নির্বাহ করে। বাল্যকাল থেকেই জাপানি বালিকা রান্না ইত্যাদি আবশ্যক ঘরের কাজ শেখে এবং অতিথি বাড়িতে এলে সে পিতার আদেশে অতিথির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। পিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সে প্রয়োজন মতো সকল আহার্য পরিবেশন করে (রসিকলাল, ১৯০৭ : ১২০)।

তিনি জাপানি নারীর বর্ণর্না দিয়েছেন এভাবে—

> বাল্যে জাপান-রমণী অতি লাবণ্যবতী থাকে; কিন্তু তাহার লাবণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পয়ত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিলে প্রায় অধিকাংশ রমণীর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। জাপান-সমাজে কোনো রমণীকেই কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে দেখা যায় না। রমণীর পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

> বার্দ্ধক্য পাশ্চাত্য সমাজে অতি ভয়ানক অবস্থা। যৌবন কালে সমাজ-মধ্যে পাশ্চাত্য রমণীর যে প্রতিপত্তি থাকে, বার্দ্ধক্যে তাহা সমস্তই অন্তর্হিত হয়। এই কারণে পৌঢ়া পাশ্চাত্য রমণী বেশ ভূষার আড়ম্বর করিয়া, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে যুবতী জনোচিত সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। জাপান-সমাজে যুবতী অপেক্ষা বর্ষীয়সীর সম্মান অনেক অধিক। বর্ষীয়সীশ্বশ্রূ, যুবতী পুত্রবধূর প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করেন; পুত্র ও পুত্রবধূ সর্ব্বদা শুশ্রূষা করিয়া বৃদ্ধার মনোরঞ্জনে নিয়ত থাকে। ফলতঃ বার্দ্ধক্য জাপান-রমণীর পক্ষে ভয়ের কারণ নহে; বরং তাহারা আগ্রহের সহিত বার্দ্ধক্যের প্রতীক্ষা করে (রসিকলাল, ১৯০৭ : ১২১)।

রসিকলাল গুপ্তের তথ্য অনুযায়ী পাশ্চাত্যের প্রভাবে জাপানের সমাজে রমণীর এভাবে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বীর প্রসবিনী সেমুরি-মহিলা তখন জাপানের অন্যতম ভরসা স্থল ছিলেন। সে সময়ে তাঁরা নিজ নিজ সন্তানকে বীরজনোচিত শিক্ষা প্রদান ও আহত সেনাদের সেবাব্রত পালন করতেন। বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বীতায় সেমুরি-নারী জাপান সমাজে শ্রেষ্ঠ।[২৩]বিদেশিরা জাপানি নর্ত্তকীদের সম্পর্কে সুন্দর মনোভাব পোষণ করতেন না। এ সম্পর্কে রসিকলাল গুপ্ত লিখেছেন—

> পাশ্চাত্যেরা 'জেইসা' নামে নর্ত্তকী-সম্প্রদায় দেখিয়া জাপান-রমণী সম্বন্ধে অতি হীনভাব পোষণ করিতেছিলেন। ....'জেইসা' নামে যে নর্ত্তকী-সম্প্রদায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বারবনিতা নহে। এই সম্প্রদায় বিভিন্নদলপতির অধীন। সমাজের নিম্নস্তর হইতে তাহাদিগকে রীতিমত ব্যায়াম, নীতিসূত্র, কাব্য, অলঙ্কার, নৃত্য গীত শিক্ষা দেন। যাহারা এই সমস্ত আয়ত্ব করিতে পারে, তাহারাই 'জেইসা' নামে অভিহিত হয়। জেইসা প্রকাশ্য সভায় নৃত্য গীত করিয়া এবং বাক্‌পটুতা দেখাইয়া লোকের মনোরঞ্জন করে। পাশ্চাত্য অভিনেত্রীদিগের সহিত জাপান দেশীয় নর্ত্তকী সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কেরার নামে জনৈক পাশ্চাত্য পর্য্যটক বলেন জেইসার জীবন দুঃখময় হইলেও তাহারা ধৈর্য্য সহকারে আত্মগোপন করিয়া জীবন যাপন করে। কোনো জেইসার অন্তরেই শান্তি নাই সত্য; কিন্তু অভ্যাসবশে তাহারা এরূপ প্রফুল্লতার ভান করে যে, লোকে উহা কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহাদের সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয় জগতে এমন লোক আছে কিনা সন্দেহ। জেইসা কণ্ঠনিঃসৃত সমধুর হাস্যধ্বনি যাঁহার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিয়াছে, তিনি আর এজন্মে তাহা বিসমৃত হইতে পারিবেন না। জাপান ছাড়িয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তে জাও না কেন সেই অ-হাস্যধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত পার হইয়া সেই সুদূর

২৩. 'সেমুরী' হিসেবে যাদের বলা হয়েছে তারা আসলে 'সামুরাই'। সামুরাইরা জাপানের মধ্যযুগে সামরিক অভিজাত সম্প্রদায় ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

> দেশেও তোমার কর্ণকুহরে আজীবন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাহার সুকোমল স্বভাবে এমনই এক অব্যক্ত মাধুর্য্য আছে যে, লোকে সহজে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যে স্থলে জেইসার শুভাগমন হয়, সেই স্থলেই তাহার বিলোল কটাক্ষ নিরন্তর মাধূর্য্য বিকিরণ করিতে থাকে। পুরুষ ভ্রমরেরা তখন মনে করে, তাহারা জেইসা-পুষ্পের অন্তর্নিহিত মধু আহরণে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু এও কটাক্ষ জেইসা-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি নহে—তাহাদের অক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও স্থান হয় না (রসিকলাল, ১৯০৭ : ১২২-২৪)।

স্বদেশ প্রেম বিষয়ে শিশির মিত্র রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, জাপানি মহিলা নিজের পরিবারের চেয়েও দেশকে বেশি ভালোবাসে। ১৯০৪ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধে রাশিয়া বেশ সঙ্কটে পড়ে। শিশির মিত্র নামের একজন বাঙালির †'k ‖e‡'k নামে একটি গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি গল্পের আকারে জাপানি মহিলাদের দেশপ্রেমের তথ্য প্রদান করেছেন। জাপানে স্কুলের অনেক কাজ ছেলে মেয়েরাই করে থাকে। স্কুলেই তারা সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠের সঙ্গে তাদের জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও কর্তব্য প্রদর্শনের শিক্ষা পেয়ে থাকে। প্রত্যেক শিশু তার জন্মভূমিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। কাজেই স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি-মমতা তাদের মজ্জাগত। যাহোক, ১৯০৪ সালের  জাপান-রুশ যুদ্ধের সময় জাপানি মহিলারা তাদের স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[২৪] বিশ্বের সকল নারীর কাছে চুল অত্যন্ত প্রিয়। এ বিষয়ে শিশির মিত্র তাঁর †'k ‖e‡'k গ্রন্থে তথ্য প্রদান করেছেন—

> অর্থের অনটনে পড়িলে জাপানী মেয়েরা নিজেদের গাত্রাভরণ তুলিয়া দিয়াছে, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য ঐশ্বর্য্যের শেষ কণাটি পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন জাপানী মেয়েরা যাহা করিয়াছে তাহা সত্যই অদ্ভুত। জাপানী মেয়েরা তাহাদের বড় সাধের লম্বা বেণী কাটিয়া বিক্রয় করিয়াছে—যুদ্ধের খোরাকের জন্য। শেষে জাপানী নিষ্ঠা, ভক্তি ও সাধনার জয় হইল। রুশের বিপুল বাহিনী পরাজিত হইল ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় স্বদেশ-প্রমিক জাপানী সৈন্যের নিকট (শিশির, ১৯২২ : ২৩)।

জাপানের সমাজে নারীর অবস্থান

কমোডর পেরির আগমণের পর আধুনিক যুগে উত্তোরণের সূচনালগ্নে জাপান প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের দিকেই অধিক সচেষ্ট ছিল। এই সময় শিক্ষা বিস্তারে যতটা মনোযোগী ছিল

---

২৪. ১৯০৪ সালের রুশ-জাপানে যুদ্ধের জন্য দেখা যেতে পারে,I. H. Nish, *Japan's Foreign Policy, 1869-1942*, London, 1977

*Dhaka University Institutional Repository*

সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ততটা আগ্রহী ছিল না। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের স্বাভাবিক গতিতে জাপানে সামান্য পরিবর্তনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষিতিনাথ সুর তাঁর প্রবন্ধে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের লক্ষণসমূহ থেকে সমাজের সভ্যতা বিকাশের ধারাক্রম অনুধাবন করা যায়। জাপানি সমাজে নারীর স্বাধীনতা থাকলেও তা কখনো অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান ছিল না। সেখানে নারী চিরকালই পুরুষের মুখাপেক্ষী, তবে পুরুষ কখনো সেখানে নারীকে দাসীর ন্যায় গণ্য করেনি। বরং নারী-পুরুষের সহমর্মীতা ও সহযোগিতার আবহে সমাজ প্রবাহ অগ্রসর হয়েছে।  বিশ শতকের প্রথমার্ধেও জাপানে নারীর ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। অন্দরে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেও বাইরে তাদের অধিকার তখনো অধরাই রয়ে গিয়েছিল (ক্ষিতিনাথ, ১৩৩৮ : ৭৯০-৯৩)।

জাপানি নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় পারুল দেবী তাঁর ‘জাপানে কয়েক দিন’ শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন—

> জাপানের দুইটি জিনিষ আমাদের মুগ্ধ করেছে—তার সৌজন্য এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান।...কবিরা যে থাকেন নারীই জগতের সৌন্দর্যের আধার, জাপান সেই কথাটির সম্মান বজায় রেখেছে। জাপানী মেয়েদের উজ্জ্বল হাসিমুখ, তাদের নয়নমুগ্ধকর পোষাক, তাদের নম্রতা তাদের নারীসুলভ বিনয় জাপানকে যে সৌন্দর্য দান করেছে জাপানের আর কোনও জিনিষই তা পারেনি। জাপানী মেয়েরা সুন্দর ভঙ্গীতে কাজ করে- সুন্দর ভাবে কথা বলে- ইংরেজীতে যাকে বলে গ্রেস, জাপানী মেয়েরা সে জিনিষটা এমন ভাবে আয়ত্ত করেছে যে নাক্ মুখ চোখের সৌন্দর্য যার যেমনই থাক্, গ্রেস্ তাদের সকলেরই সমান আছে (পারুল, ১৩৪২ : ৪৯৭)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি জাপানের সমাজের গভীরের তথ্য অনুধাবন করেছেন। যদিও জাপানে তাঁর অবস্থানের স্থিতিকাল ছিল খুবই কম। কিন্তু সৌন্দর্যের পূজারি ও দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিষয়টি অনুভব করতে তেমন সময় লাগেনি। তিনি মন্তব্য করেছেন—

> অথচ আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করেনি ব’লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরো একটা জিনিস দেখতে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজকে স্ত্রীলোক বলে

> বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝা যায়, তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবি রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্র-দৌর্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বলছি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে-একটা কৃত্রিম মোহপরিবেষ্টন রচনা করেছে জাপানীর মধ্যে অন্তত তার আয়োজন কম ব'লে মনে হল, এবং অন্তত সেই পারিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ৮১)।

শিক্ষা

উনিশ ও বিশ শতকে জাপানে মেয়েদের আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নারীর কোমলতা ও সুশীল হওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯৩৫ সালে জাপান ভ্রমণকারী বাঙালি নারী পারুল দেবীর লেখায়। পারুল দেবী তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন—

> জাপানে মেয়েদের স্কুলে একটি বিভাগ আছে, তার নাম হ'ল Laboratory of Manners। কেমন ক'রে অতিথির উপস্থিতি কালে ঘরের দরজা যতবার খুলবে হাঁটু পেতে ব'সে তবে খুলতে হবে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গিয়ে আবার তেমনি ভাবে বসে তবে দরজাটি আবার বন্ধ করবে, কেমন ক'রে দুই হাতে সুন্দর ভঙ্গীতে খাবারের পাত্রটি ধরে অতিথির সম্মুখে রেখে সরে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে সম্মান দেখাতে হবে—এ সকল প্রথা ওদের প্রতি-মেয়ের শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ (পারুল, ১৩৪২ : ৪৯৭)।

শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে জাপানি পুরুষদের স্বাধীনতা থাকলেও মেয়েদের তা ছিল না। এটা তৎকালীন জাপানি নারীদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের পরিপন্থি ছিল।[২৫]

পেশা

---

২৫. J. Ingram Bryan-এরগ্রন্থে,'A Japanese Factory expert has affirmed that in some factories it is not uncommon that more than half the girls lose their virtue in a year. The long hours leave the workers so weary that any sort of excitement is welcome, and consequently vicious pleasures and pastimes are encouraged and common. The most usual amusements are drinking, gambling and sensuality'. J. Ingram Bryan, *Japan from Within*, p. 139

*Dhaka University Institutional Repository*

মন্মথনাথ ঘোষ জাপানি নারীর পেশাগত বিষয়ে আলোকপাত করে উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান প্রধানত একটি কৃষি প্রধান দেশ ছিল। তখন জাপানের শতকরা ৬০ জনের জীবিকা ছিল কৃষি। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা ব্যতীত অন্য মহিলারা পুরুষের এই কাজে সহযোগিতা করতেন। সে সময় জাপান বিশ্বের সবচেয়ে অধিক সিল্ক উৎপাদনকারী দেশ ছিল। আর এ কাজে মেয়েদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গৃহশিল্পের কাজেও মেয়েদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তখন জাপানে শ্রমিকদের শতকরা ৬০-৮০ জন ছিল নারী, আবার এদের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল কিশোরী। কল-কারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের অধিকাংশই ছিল নারী। এক শ্রেণির দালাল চক্রের মাধ্যমে কল-কারখানায় নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের সংগ্রহ করা হতো পল্লীগ্রাম থেকে। এসব কল-কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের দুর্বিসহ জীবনের চিত্র পাওয়া যায় (মন্মথনাথ, ১৯১০ : ১৬০)।জাপানি নারীদের কর্ম-দক্ষতা ও পেশাগত এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীদের পেশা জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯১০ সালের পূর্বে জাপান ভ্রমণকারী বাঙালি লেখক মন্মথনাথ ঘোষের বিবরণীতে। নারীদের কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা লেখককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ‘জাপানি উচ্চ বংশীয় মহিলারা কোনো জায়গায় পূর্ণকালীন কাজে যুক্ত না হলেও সংসারের কাজ শেষে সুতা উঠানো, রেশমের কারুকাজ, কৃত্রিম ফুল, কাপড় সেলাই ইত্যাদি কাজে যুক্ত থাকে। দারিদ্রের হিসাবে নিম্নশ্রেণীর মহিলারা কারখানায় কাজ করে’ (মন্মথনাথ, ১৯১০ : ৫২)।

নারী অধিকার অর্জনের পথ-পরিক্রমা

শান্তা দেবী তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এই প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করে বলেছেন যে, জাপানে নারা যুগে (৫৯২-৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ) ষোল জন শাসক রাজ্যশাসন করেছেন। এই শাসকদের মধ্যে ৮ জনই ছিলেন সম্রাজ্ঞী। তৎকালীন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার, শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের কীর্তি স্থাপনে এসব সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও সেকালে সামজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাপানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের আশ্চর্যজনক প্রসার ও উন্নতির পিছনে সম্রাজ্ঞী কোকেন বেন্নো ও তাঁর মাতা কোমিয়ো কোগো’-র ভূমিকা অনস্বীকার্য (শান্তা, ১৩৪৫ : ১০৮-১০৯)। প্রাচীন সম্রাজ্ঞীদের এরূপ প্রয়াস সত্ত্বেও জাপানি সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অপূর্ণই থেকে যায়।

মন্মথনাথ ঘোষের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে জাপান যান্ত্রিক সভ্যতায় অপ্রত্যাশিতরূপে অগ্রসর হলেও সমাজে নারীর পশ্চৎপদতার অবসান তখনো হয়নি। সমাজে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চনা তাদের এই পশ্চৎপদতার কারণ। অবশ্য নারীর অবমাননা ও পশ্চাৎপদতা নারী সমাজ আর দীর্ঘদিন সহ্য করেনি। ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

চীনের উপর জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন জাপানি নারীদের অগ্রযাত্রার পথ উন্মোচন করে। ব্যারনেস ইশিমোতো, কাউন্টেস ইসুগারু এবং মার্কিওনেস শে-র মতো অগ্রগামী নারী নেত্রীদের প্রচেষ্টায় জাপানের সমাজে নারী জাগরণের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁরা জাপানের পাশ্চাৎপদ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতি চা-চক্র এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবেত হয়ে নারী স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে (মন্মথনাথ, ১৯১০: ১৩৯)।

১৯২০ সালে ব্যারনেস ইশিমোতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে স্টেনোগ্রাফি'র ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেন। জাপানে ফিরে তিনি খ্রিষ্টান মহিলা সমিতির মাধ্যমে টোকিও শহরে একটি লেস্‌ফিতার দোকান চালু করেন। এই ঘটনা জাপানি সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভদ্র ঘরের কোনো নারীর এরূপ কাজ তৎকালীন সমাজে এক বিস্ময়কর ঘটনার জন্ম দেয়। পর্যায়ক্রমে সমাজের অভিজাত ঘরের নারীরাও এরূপ দোকান খোলায় এগিয়ে আসেন। এই ঘটনা জাপানে নারী স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটালেও কোনো বৃহৎ আন্দোলনের রূপদান করতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। চীন-জাপান যুদ্ধ জাপানে নারী জাগরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে (জাপানের, ১৩১৫: ২০)।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত জাপানে নারী জাগরণ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, চীনে জাপানের অভিযান শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দলে দলে পুরুষেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে বহু কর্মস্থলে পদ শূন্য হলে সেগুলো পূরণে জাপানের নারীরা এগিয়ে যান। অবশ্য নারীদের চাকরিতে যোগদান এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থনের জন্য ছিল না। তবে বন্ধন মুক্তির জন্য জাপানি নারীরা যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এই সময়ে এসে তারা সেটির সূচনা করেন। চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে জাপানে চাকরির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের এক হিসাব অনুযায়ী জাপানের ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ নারীর মধ্যে ৩০ লক্ষের অধিক বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন। মৎস ব্যবসায় ৪০ হাজার, খনির কাজে ১ লক্ষ, কল-কারখানায় ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার, ব্যাবসাবাণিজ্যে ১০ লক্ষ, যানবাহন বিভাগে ৬০ হাজার, সরকারি চাকরি ও স্বাধীন জীবিকার্জনে ৩ লক্ষ এবং অন্যান্য কাজে ১ লক্ষ ৯০ হাজার নারী নিযুক্ত হন (দিগিন্দ্রচন্দ্র, ১৩৪৬ : ১২২)। পেশাগত ক্ষেত্রে নারীদের এরূপ সক্ষমতা অর্জনের ফলে জাপানের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এটি নারী অধিকারের বিষয়ে জাপানিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন সত্ত্বেও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত জাপানে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। সে সময় রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সুযোগ এমন কি রাতে একাকী অবাধে চলাচলের ক্ষেত্রেও সামাজিক বিধি নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বাঙালি ভ্রমণকারী, সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীদের রচনা ও স্মৃতিকথায় জাপান সম্পর্কে এদেশের মানুষের যে জ্ঞান লাভ হয় তার মধ্যে একটি বিস্তৃত অংশ জাপানের নারী সম্পর্কে। তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চারিত্র বৈশিষ্ট্য, সমাজে তাদের অবস্থান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আধুনিক ধারায় উত্তরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র ফুটে ওঠে এসব রচনায়। উনিশ ও বিশ শতকের এসব রচনায় জাপানি নারীর যে চিত্র প্রকাশ পায় তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তথা বাঙালি নারীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আধুনিক শিক্ষায় অগ্রগতি ও চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ অন্তঃপুরবাসিনীর বৈশিষ্ট্য জাপানি নারীর ললাটলিখন ছিল তেমনি অবস্থা বাঙালি রমণীকূলেরও ছিল। পরিশেষে কিছুটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ও যুদ্ধের অমোঘ পরিণতি তাদের এই বন্ধনমুক্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করে। তবে চরম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি ও সমাজে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল সময়ের দাবি অবধারিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

অকিঞ্চন দাস (১৩২২), ‘জাপানী জাতির বিশেষত্ব’, be¨fviZ, মাঘ

আনোয়ার হোসেন (১৯৪১), AvawbK Rvcvb, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

আর. কিমুরা (১৩২৯), ‘জাপানের সামাজিক প্রথাঃ খাদ্যদ্রব্য’, e½evYx, ভদ্র

ক্ষিতিনাথ সুর (১৩৩৮), ‘আধুনিক জাপানের সমাজ’, wewPÎv, জৈষ্ঠ্য

চন্দ্রশেখর সেন (১৯০৭), fc'wÿY, কলিকাতা

চারুচন্দ্র ঘোষ (১৯১৭), Rvcv‡bi DbwZ nBj wKi¦‡c, কলিকাতা

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩১৩), Rvcv‡bi Af¨'q, নব্য ভারত, ২৪ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, পৃ. ১০০-১২৩

মন্মথনাথ ঘোষ (১৯১০), Rvcvb cevm, দি এম্পায়ার লাইব্রেরী, কলকাতা

শান্তা দেবী (১৩৪৫), ‘জাপান ভ্রমণ’, cevmx, বৈশাখ

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪৬), ‘জাপানে নারী জাগরণ’, Rqkx, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক

যদুনাথ সরকার(১৩১৪), ‘নীপনীসমাজ’, fviZx, আষাঢ়

শিশির মিত্র সম্পাদিত (১৯২২), †'k we‡'kwP‡Î I M‡í, ৪র্থ সংস্করণ, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

ÔRvcvb-gwnjvi mvgwRK Ae¯'vÕ(১৩১৫), fviZ gwnjv, চৈত্র

bvbv †'‡ki bvix-wPÎ (১৮৯৯), কলিকাতা, ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস

পারুল দেবী (১৩৪২), ‘জাপানে কয়েক দিন’, cevmx, শ্রাবণ

যদুনাথ সরকার (১৩১৭), ‘জাপানে ভিক্ষুক’, fviZx, ৩৪ বর্ষ, বৈশাখ

যদুনাথ সরকার (১৩২০), ‘দাইতোকোরো’, ভারতী, মাঘ

সরোজনলিনী দত্ত (১৯২৮), Rvcv‡b e½bvix, এম. সি, সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

মন্মথনাথ সিংহ (১৮৯৮), 'জাপান কাহিনী: জাপানীদের কয়েকটি দেশাচার', evgv‡ewabx cwÎKv, সেপ্টেম্বর

যদুনাথ সরকার (১৩১৮), 'জাপানের আকৃতি ও প্রকৃতি, fviZx, বৈশাখ

'জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়'( ১৩১৫), ভারত মহিলা, ভাদ্র

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তীর্থ-সলিল (১৯১৮), কলিকাতা

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৭), Rvcvb, কলিকাতা

সরোজ নাথ ঘোষ (১৩৪৫), wek-bvix cMwZ, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১০), Rvcvb-hvÎx, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রসিকলাল গুপ্ত (১৯০৭), bexb Rvcvb, কলিকাতা

হরিপ্রভা তাকেদা (১৯১৫), বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা, ঢাকা।

Awazuhara Atsushi (2001), 'Perceptions of Ambiguous Reality—Life, Death and Beauty in Sakura', *Japanese Religions,* Vol. 32 (1 & 2)

I.H. Nish (1977), *Japan's Foreign Policy, 1869-1942,* London

Ilse Lenz (2006), 'From Mothers of the Nation to Global Civil Society: The Changing Role of the Japanese Women's Movement in Globalization'. *Social Science Japan,* Vol. 9No.1

Inazo Nitobe (1969), *Bushido: The Soul of Japan*, Charles E. Tuttle Company, Rutland, Vermont

J. Ingram Bryan (1924), *Japan from Within* : An inquiry into the Political, industrial, Commercial, financial, agricultural, arnamental and educational Conditions of modern Japan, London : T. F. Unwin Ltd.

J. Frost Dennis (2010), *Seeing Stars: Sports Celebrity, Identity, and Body Culture in Modern Japan,* Harvard University Press

James Huffman (2010), *Japan and Imperialism, 1853-1945,* An Arbor: Association for Asian Studies Ins

Jason Ananda Josephson (2012), *The Invention of Religion in Japan*. Chicago, University of Chicago Press

*Dhaka University Institutional Repository*

M. Ashikari (2003), 'The Memory of the Women's White Faces: Japanese and the Ideal Image of Women'. *Japan Forum*, Vol. 15, No. 1

*Dhaka University Institutional Repository*

## পঞ্চম অধ্যায়

# জাপানি সাহিত্য

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে জাপানিদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। কিংবদন্তি, লোকগীতি ও পৌরাণিক কাহিনি বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে প্রবহমান থাকতো—যাদের সরকারি ভাষ্যে বলা হতো 'কাতারিবি'। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে চীনের কাছ থেকে জাপানিদের বর্ণমালায় হাতেখড়ি হয়। ওয়াগিন বা ওয়ানি নামে একজন কোরিয়ান চীনাভাষী শিক্ষক নিয়োজিত হন জাপানি রাজকুমারের শিক্ষার জন্য। তিনি সর্বপ্রথম জাপানে চৈনিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন করেন। জাপানি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সময় ৫৫২ খ্রিষ্টাব্দ, যখন বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানমার্গের সংস্পর্শে এসে সাহিত্য ও শিল্পকলায় জাপান সমধিক প্রসারতা লাভ করে।

৪০৫ থেকে ৭৯৪ সাল পর্যন্ত জাপানি সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কাব্যচর্চা। আট শতকে পদ্য ছন্দে রচিত gwb|m জাপানের শ্রেষ্ঠ আদি কাব্যের সংগ্রহ গ্রন্থ। জাপানি সাহিত্যে গদ্যের তখনো সূচনা হয়নি। কাকিনোমতো নো হিতোমারো, ইয়ামাবে নো আকিহিতো প্রমুখ প্রায় সাড়ে চারশো কবির চার হাজারের উপর শ্লোক ও কবিতা নিয়ে সংকলিত হয় gwb|m গ্রন্থটি(আনোয়ার ১৯৪১ : ৩৬)।

৭৯৪ থেকে ১১৯২ সালকে জাপানি সাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী যুগ বলা হয়। নিখিল সেন মন্তব্য করেছেন—

> ময়ূরপুচ্ছ-পরা চীন ভাষা আর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জাপানী বিদগ্ধ সমাজ রুখে দাঁড়াল। সুগাওয়ারা মিচিজান নামে এক সুপণ্ডিত আন্দোলন শুরু করলেন। চীনের রাজ-দরবারে সাংস্কৃতিক দূতের জন্য আর ধরনা দেওয়া চলবে না নিপ্পনের। তাঁর এ আন্দোলনের ফলেই জাপানে নতুন ঢঙের এক সাহিত্যের উদ্ভব হলো। জাপানী 'বেলে লের্টাস' বা রম্য-রচনার উন্মেষ হয় এ সময় (নিখিল, ১৯৬০ : ৭৯)।

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানের যথার্থ প্রথম উপন্যাসের নাম †MwÄ। চীনের সিয়ান রাজ-দরবারের হুবহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস পৃথিবীর সেরা উপন্যাসের একটি বলে সাহিত্য সমাজে বিবেচিত হয়। এই আখ্যায়িকায় যে অতি সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অতি আধুনিক বহু গল্প উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয়। আট শতকের একজন শক্তিশালী নারী লেখক হলেন সিই শোনাগন।

†MwÄ g‡bvMvZwi-র বা গেঞ্জি কাহিনির লেখক একজন নারী, নাম মুরাসাকি সিকিবু (৯৭৫-১০২৫)। সুবৃহৎ এই উপন্যাসে রাজকুমার গেঞ্জি ও তাঁর পুত্র ও পৌত্রের প্রণয় কাহিনি সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। জাপানি সাহিত্যে এই 'গেঞ্জি' কাহিনিকেই প্রথম বস্তুনিষ্ঠ আখ্যায়িকা বলা যেতে পারে।[২৬] উল্লেখ্য, হেইয়ান যুগের (৭৯৪-১১৯২) দরবারি জীবনযাত্রার যথাযথ খুঁটিনাটি চিত্র-সহ এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হয়েছে। জাপানি রাজদরবারের ঐশ্বর্যময় ও জাঁকজমক ও পারিপাট্যময় জীবনযাত্রার সঙ্গে করুণ, হাস্য ও বিষাদের বিচিত্র সমাবেশ এই সুবিশাল উপন্যাসে লক্ষণীয়। ভাষা শৈলী ও রচনা-রীতিতে এটি আধুনিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত না হলেও এই উপন্যাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। সুবৃহৎ এই উপন্যাস ব্যতীত মুরাসাকি আরো দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। givmwK wmwKe wbw° ও givmwK wmwKe Iq শীর্ষক এই দুই বইয়ে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে মুরাসাকির ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

†MwÄ g‡bvMvZwi-র মূল বিষয় হলো জাপানের রাজ পরিবারে প্রেম ও মিলন, চক্রান্ত, ঈর্ষা ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা এবং পরিণতিতে মৃত্যু। আবার এতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজ পরিবারের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠেছে। এই উপন্যাসের শিল্পরূপ অসাধারণ। গেঞ্জি কাহিনির অনুরূপ একটি উপন্যাস হলো BmB। ইসি কিকুজুরো (১৮৬৬-১৯৪৫) নামক জাপানের মেইজি যুগের একজন রাজনীতিবিদ এই উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসের পেক্ষাপট গ্রামীণজীবন। প্রেম ও বিপরীত প্রেম নিয়ে BmB একটি বিয়োগান্তক উপন্যাস। (Ishii, 1936: 53)

'নো' ও 'তনকা'

১৪ শতকে জাপানি সাহিত্যে নাটক পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এর পূর্বে পালা ও পার্বণে আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীত ছিল জাপানি নাট্য-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। ১৪ শতকে প্রথম গীতধর্মী 'নো' নাটক বিকাশ লাভ করে। জাপানের কাব্য জগতে এ সময় 'তনকা' নামে 'হাইকু' কবিতার প্রচলন হয়। কবি

---

[২৬]আর্থার ওয়েলি ৬ খণ্ডে ইংরেজিতে এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখা যেতে পারে: Murasaki Shikibu (Translated by Kencho Suematsu) (2000), The Tale of Genji, Tokyo : Tuttle Publishing; Isako Hirose (Translated by Susan Tyler) (1989), An Introduction to The Tale of Genji, Tokyo: University of Tokyo Press.

*Dhaka University Institutional Repository*

মাৎসুও বাসো (১৬৪৪-১৬৯৪) ছিলেন হাইকু বা হোক্কু কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি মাৎসুও বাসোর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন তাঁর Rvcvb-hvÎx-তে। রবীন্দ্রনাথ অনুদিত একটি জাপানি কবিতা—

স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল,

দেবতা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল-

মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

ক্ষুদ্রাকার এই কবিতাকে বলা হয় তনকা বা 'ওয়াকা'। তনকা হলো পাঁচ চরণের (৫+৭+৫+৭+৭=৩১) ৩১ অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট কবিতা। মিল বা ছন্দের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই কেননা জাপানি কবিতামাত্রই ছন্দপ্রাণ। এই শ্রেণির কবিতাকে ব্যঞ্জনাত্মক, গীতধর্মী ও আবেগময় হতে হয়। এখানে বাগাড়ম্বরের কোনো অবকাশ নেই। মানুষ, প্রকৃতি অথবা মানবীয় প্রেম তনকা'- প্রধান বিষয়। gwbqm-র শতকরা ৯০টি কবিতা তনকা জাতীয়। নিম্নে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনুদিত কিছু জাপানি কবিতার উল্লেখ করা হলোঃ

বাতুলতা

('ম-ন্যো-স্যু' হইতে)

নদীর জলে লেখার চেয়ে বড় একটা মাত্র আছে বাতুলতা,–

সেটা কেবল তারি কথাই ভাবা, ভাবে না যে জন্মে তোমার কথা

জ্যোৎস্নার কুহক

('ৎসিমাতু' হইতে)

ভঙ্গুর ভাবনা কত শত, কত শত অস্ফুট বেদনা,–

মর্ম্মরিয়া প্রাণে উঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা।

চেয়ে থাকি লাবণ্যতরল শরতের চাঁদে আত্মহারা;

তবু সে রূপালি কুহেলিকা একা আমি পড়ি নাই ধরা!

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসের শাস্তি

('শো-সী' হইতে)

বসন্তের ফুলদল যে বায়ু ঝরায়–

কোনঅন্ধকূপে থাকে সেই লক্ষ্মীছাড়া?

লুকায়ো না, ব'লে দাও জান যদি, তায়

এমনি শোনাব যে, সে হবে দেশছাড়া।

সৌন্দর্য্য ও সাধুতা

('হেঙ্জু' হইতে)

ভাবিতাম পদ্মপর্ণ! এ বিশ্ব সংসারে

নাহি কিছু তোমা সম পূণ্য সুবিমল,

তবে কেন কুক্ষিগত শিশিরকণারে

এুক্তা বলি' লোক মাঝে প্রচার কেবল?

পুষ্পজন্ম

('উকি কাজী' হইতে)

এবার বসন্তে, মরি, এ তনু আমার,

সুলঘু কুহেলি যবে ফণা তুলি ধায়,

ধরিতে পারে গো যদি ফুলের আকার,

হে নির্ম্মম! তুমি তারে নেবে নাকি হায়?

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশ

('ইসী' হইতে)

বসন্তের লঘু হিম অগ্রাহ্য করিয়া

উত্তরে ছুটিয়া কেন চলে হংসকুল?

সে কি নিজ দেশ চিরসুন্দর বলিয়া

যদিও সেথায় হেন নাহি ফুটে ফুল?

কংফুশিওর কথা

(জাপানী হইতে)

শিষ্য সহ কংফুশিও লঙ্ঘিছেন যবে

টাই নামে পর্ব্বতের শ্রেণী,–

শুনিলেন আচম্বিতে হাহাকার রবে

কাঁদে এক নারী অভাগিনী।

আজ্ঞায় চলিল শিষ্য নারীর উদ্দেশে,

দেখা পেয়ে কহিল তাহারে,–

''হেন শোক হয় শুধু মহা সর্ব্বনাশে,–

হাঁগো মাতা! হারায়েছ কারে?''

নারী কহে, ''যা কহিলে সত্য সে সকলি;

বাঘের কবলে গেছে স্বামী,

শ্বশুর গেছেন, গেছে নয়নপুত্তলি

একই মরণে, আছি আমি।"

"তবু তুমি দেশ ছেড়ে যাও নাই চলে?"

জিজ্ঞাসিল কংফুশিও মুনি;

"সে কেবল সু-রাজার রাজ্যে আছি ব'লে।"

উল্টরিল নারী। তাহা শুনি'

শিষ্যদলে ডাকি' মুনি কহিলেন শেষ,–

"বাঘ হইতে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ।"

অক্ষয় প্রেম

('ম-ন্যো-স্যু' হইতে)

বলেছি ত ভালবাসা ফুরাবে না মোর,–

যতদিন পর্ব্বতেরে চলোর্ম্মি না গ্রাসে;

সে গিরির উচ্চ চূড়া ঘিরিয়া বিভোর

নৃত্য করি মেঘমালা অনন্ত উল্লাসে!

কোকিল

('ম-ন্যো-স্যু' হইতে)

আর এক পাখী বেঁধেছিল বাসা,

অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,

বাসার সকলে হ'ল কোণঠাসা

কোকিল, ও রে কোকিল!

Dhaka University Institutional Repository

অচেনা জনক-বিহগের কাছে

অজানা জননী-বিহগীর কাছে

কণ্ঠে না জানি কি যে তোর আছে

পাগল যাহে নিখিল।

ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস

যেথায় রূপালি কুসুমের হাস

সুরে ভ'রে দিয়ে ফাল্গুনী বাতাস

এস তুমি হেথা এস;

কমলালেবুর সাথে নেমে পড়–

ফুলগুলি যার ঝরে ঝর-ঝর,

ফুল ঝর-ঝর গান নিরন্তর,

এস এস কাননেশ!

সারাটি সকাল সকল দুপুর

সারা দিনমান শুনি ওই সুর,

লাগে না যেন গো কভূ অমধূর

ও সুর আমার কানে,

প্রাণ দিব দান, এস লয়ে যাও,

দূর দেশে আর হয়ো না উধাও,

কমলালেবুর শাখে গান গাও,

Dhaka University Institutional Repository

থাক থাক এইখানে!

ঘুমপাড়ানিয়া গান

ঘুমো আমার সোনার খোকা! ঘুমো মায়ের বুকে;

আকাশ জুড়ে উঠলো তারা, ঘুমো রে তুই সুখে!

হাত পা নেড়ে কান্না কেন, কান্না কেন এত?

চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই ঘুমো!

ঘুমো আমার সোনার পাখী! মায়েরবুকের প'রে!

ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠিস অমন ক'রে?

ও কিছু নয়, শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের ঝাড়ে;

(আর) চকা-চকী ডাকাডাকি করছে পুকুরপাড়ে;

ঘুমো রে তুই ঘুমো–দিয়ে একটি চুমো!

ঘুমো আমার সোনার যাদু! কিসের তোমার ভয়?

কে কি করে তোমার কাছে মা যে তোমার রয়;

আমার খোকায় ছুঁতে নারে ঘাসের বনের সাপ;

বাজ পড়ে না যতই খুসী হোক না মেঘের দাপ;

ঘুমো মাণিক ঘুমো–একটি দিয়ে চুমো!

ঘুমো মনের সাধে, শুধু স্বপন দেখিস নারে!

ভয় পাছে পাস জেগে, হুতোম ডাক্‌ছে যে আঁধারে;

গুটি শুটি মাথাটি রাখ আমার বুকের পরে;

*Dhaka University Institutional Repository*

হাস্ রে শুধু সারাটি রাত হাস্ রে ঘুমের ঘোরে;

ঘুমো মাণিক ঘুমো–ঘুমো রে তুই ঘুমো!

ঘুমো আমার সোনার খোকা, ঘুমো আমার কোলে,

ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ী নে' দোলে;

পাপের কর্ম্ম যে করেছে, দেবতা তারেই মারে;

নির্দ্দোষ মোর সোনার খোকা, কেউ না ছুঁতে পারে!

ঘুমো মাণিক ঘুমো–একটি দিয়ে চুমো!

(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩১৫: ৮৬-৯০)

তনকা কবিতার কিছু নমুনা নিচে দেখানো হলো। অষ্টম শতকে ইয়ামাবো নো আকিহিতো লিখেছিলেন—

বসন্ত কাল সবুজ মাঠ

এসেছিলাম ভায়লেট ফুল তুলতে,

সারা রাত কিন্তু ঘুমিয়েই কাটালুম -

এমনি মুগ্ধ করে তুলেছিল সবুজ মাঠ।

নবম শতকে ওনো নো কোমাচি লিখেন—

আমি তখন মগ্ন ছিলাম দিবা নিদ্রায়

প্রিয়া এসে দেখা দিল নিমিষের জন্য

দিবা স্বপ্নেই হবে বুঝি

অটুট হলো বিশ্বাস।

(সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ৫৬৮-৭২)।

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার অনুরূপ কবিতা হাইকু বা হোক্কু। এই ক্ষুদ্র কবিতার অক্ষরমাত্রা ৫+৭+৫ = ১৭, আর চরণ মাত্র তিনটি। মানুষ, প্রেম আর প্রকৃতি এই কবিতার প্রধান বিষয়—যা তনকা-রও বিষয়। হাইকু বা হোক্কু প্রতীকধর্মী, ইঙ্গিতময় এবং সংক্ষিপ্ত। তনকার জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ম্রিয়মান হয়ে যায়, যখন হাইকু বা হোক্কুর ব্যাপক প্রচলণ ঘটে।

মাৎসুও বাসো শিক্ষা লাভ করেন কিয়োটোতে। তিনি ছিলেন এদো যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি। কবিতা রচনার গতানুগতিক প্রথা ত্যাগ করে মাৎসু বাসো নিজস্ব 'শফু' রীতিতে ও সহজ সাবলিল ভঙ্গিতে যে হাইকু রচনা করেন তা প্রকাশধর্মীতা ও প্রতীকে অনন্যসাধারণ। হাইকু কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করে নতুন মর্যাদা দান করে মাৎসু বাসোর এই উদ্ভাবনী শক্তি। তাঁর এই কাব্য-রীতি পরবর্তীকালে বহু কবি অনুসরণ করেন। হাইকু কবিদের মধ্যে মাৎসু বাসোর উত্তরসাধক ছিলেন ইনমোতো কিকাকু (১৬৬১-১৭০৭), কাগা নো চিয়ু (১৭০৩-১৭৭৫), ইওসা বুসন (১৭১৬-১৭৮৩), কোবায়েসি ইস্‌সা (১৭৬৩-১৮২৮), মাসাওকা শিকি (১৮৬৬-১৯০২), নাৎসুমে সোসেকি (১৮৬৭-১৯১৬), মুরাকামি কিজো (১৮৭০-?), তাকাহামা কিওসি (১৮৭৪-?), ওনো বুসি (১৮৮৮-?) প্রমুখ হাইকু কবি(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩১৫ : ৮৬-৯০)।

জাপানের প্রখ্যাত কবি ইয়নে নগুচি যখন কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছিলেন তখন কবিতা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র পঞ্চাশজন জাপানি কবির হাইকু ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাবানুবাদ করেন।

কয়েকজন জাপানি কবির হাইকু এ রকম—

তুষারাবৃত

মেরুপ্রদেশের শীতের প্রকোপ জানি।

আসেনা ত কেহ, শূন্য এ ঘরখানি।

তৃণহীন মাঠ, শবকঙ্কাল শবকঙ্কাল শাখী,

তুষারাবরণে তাদেরে রেখেছে ঢাকি।

গেছি মরে ঝরে আমিও তাদেরি মত,

তুষারের ভার বহিতেছি অবিরত।

*Dhaka University Institutional Repository*

কবি: মিনামাটো আসোন্

জিজীবিষা

তোমারে যখন দেখেনি তখন মমতা ছিল না জীবনে

পেয়েছে তোমারে দীর্ঘায়ু তাই চাই দেবতার চরণে।

কবি: ফিউজিওয়ারা নো ইয়োশিতাকা

গোপন প্রেম

দুর্ব্বিসহ এ জীবনের গুরুভার

আমি কোন মতে বহিতে পারি না আর!

একটি দিনের স্মৃতির সুরভি ঢালা

কণ্ঠে আমার দোলেসেই বরমালা।

যতদিন যায় হয় সে বহ্নিময়,

আমি পুড়ে মরি এ দাহ নাহি যে সয়!

ছিঁড়ুক এ মালা, নতুবা যে হাহাকারে

বুঝিবে সবাই, কী আছে কণ্ঠহারে!

কবি: শিকিশি নেইশিন্নো

'ভাল করি পেখন না ভেল'

জোছনা যামিনী ফিরিতেছি পথে একা,

মোর পাশ দিয়া চলি' গেল চকিতে কে?

দেখি দেখি করি না যে তারে দেখা,

Dhaka University Institutional Repository

সহসা চাঁদের কালো মেঘ দিল ঢেকে।

কবি: মিউয়া নাকি সিকিবু

অপেক্ষা

কোষের মাঝারে বন্দী রয়েছ অসি,

ফুঁসে কাল-ফণী যেন গহ্বরে বসি!

আমি সারা নিশি জাগিয়া বসিয়া রই,

তার গুমরণে রণোদীপ্ত হই।

কৃপাণ আমার, রহ ধৈরজ ধরি,

হয়নি সময়, থাক তুমি চুপ করি।

মাহেন্দ্রক্ষণ আসিবে অচিরে যবে,

এই হাতে তুমি কোষবিমুক্ত হবে।

কবি: অঞ্জাত

নিশান্তে

তিমির কলাপী গুটাল’ পক্ষভার;

তারকা খচিত বিপুল পুচ্ছ তার

লুটায়ে গগনে ধীরে ধীরে চলে যায়,

কাঁদি নিশি ভোর অসহ প্রতীক্ষায়।

কবি: কাকি-নো-যোতো-নো-হিতোমারো

উৎসবান্তে

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তের হল অঙ্ক, আসিল নিদাঘ

প্রক্ষালিয়া উৎসবের পুষ্পল পরাগ,

রাশি রাশি আর্দ্রবাস যত দিক্‌বালা

মেলি’ দিল গিরিশিরে। রবিরশ্মি ঢালা

সেই আতপে শুস্ক হয় অমল দুকুল,

গন্ধবহ সমীরণ সৌরভে আকুল।

কবিঃ জি-তো তেন্নো

পরিবেদনা

শশীকলা হ’ল বিকলা রাত্রি শেষে,

পান্‌সীটি তার লাগে গিরি-শিরে এসে।

বুদ্ধ দ সম অন্তিম বায়

বক্ষে আমার ফুটে ফেটে যায়,

নয়নে অশ্রু ঝরে,

রহিল এ ক্ষোভ, জানিলেনা তুমি, কাঁদি যে

তোমারি তরে!

কবিঃ ওয়াঙ,-সেভ্‌-জু

অপেক্ষা

কোষের মাঝারে বন্দী রয়েছে অসি,

ফুঁসে কাল-ফণী যেন গহ্‌বরে বসি!

Dhaka University Institutional Repository

আমি সারা নিশি জাগিয়া বসিয়া রই,

তার গুমরণে রনোদ্দীপ্ত হই।

কৃপণ আমার, রহ ধৈরজ ধরি,

হয়নি সময়, থাক তুমি চুপ করি।

কবিঃ অজ্ঞাত

'যথারণ্যং তথা গৃহম্'

জানিনা কথায় যাব,

কোথা গেলে শান্তি পাব?

ভাবিলাম বনে গিয়া

বিজনে জুড়াব হিয়া।

শুনি সেথা কম্প্র গাত্রে

কাঁদে মৃগী অর্দ্ধেরাত্রে!

কবিঃ তোসিনারী

ধরা-বন্দিনী

সুরবালিকারা চড়ি পুষ্পক রথে

এই ধরণীতে নেমেছিলে পথ ভুলি'।

আন মেঘমালা হে পবন, সুর পথে

দিওনা তাদের ফিরিবার পথ খুলি।

কবিঃ সোজো-হেনজো

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

রটনা

ঢাক্ ঢোল্ পিটে সবাই রটনা করে

প্রেম-ফাঁদে ধরা পড়েছি তোমার তরে!

কভু আঁখি মেলি' চাইনি তোমার পানে,

আমি যাঞ্চ জানিনা, পড়শীরা তাহা জানে!

কবি: মিবু নো তাদানি

(সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৪২: ৫৬৮-৭২)

জাপানিরা বড় কবিতা পছন্দ করে না। ছোট ছোট কবিতায় তারা তৃপ্তি পায়। এজন্য রচিত হয় 'হাইকু' বা ছোট কবিতা। লক্ষ করা যায় যে ছোট কবিতা বা হাইকু-তেও সাহিত্যের রস, ছন্দ, বোধ ও উপমা সমানভাবে বিদ্যমান। তাই, হাইকু-কে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না।প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব কাব্য, কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্য রয়েছে।রয়েছে তার নিজস্ব সৃজনী শক্তি ও প্রতিভা। জাপানের তেমনি হয়েছে নিজস্ব কাব্য, কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্য। জাপানের রয়েছে তার নিজস্ব সৃজনী শক্তি ও প্রতিভা। জাপানি কবিতা সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> জাপানি কাব্যলোক এক অপূর্ব স্বপ্নরাজ্য। নানারঙে রঙ্গীন্ রামধনুর দেশ। বিচিত্র বর্ণ, চঞ্চল, ফুলে ফুলে-ওড়া প্রজাপতির মত ছোট, সুন্দর কবিতাগুলি; সাগরের বিশালতা বা পর্ব্বতের তুঙ্গতা নেই এতে; শিশির-বিন্দুর মত স্নিগ্ধোজ্জল, আকাশের আলো হাসে তার বুকে; তেম্নি শিথিল ও সংক্ষিপ্ত, যেন ছুঁলেই ঝরে' যাবে, অথচ দূর থেকে দেখ্লে জুড়িয়ে যাবে চোখ (ধীরেন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ : ১১৯)।

জাপানের কথাসাহিত্য

জাপানে গদ্য-সাহিত্য রচনার প্রচলন হয় দশ শতকে। এ প্রসঙ্গে যে অক্ষয় কীর্তির ইতিহাস জানা যায়, তা অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে ঘটেনি। ৭১২ সালে জাপানের সম্রাজ্ঞী গেমিয়ো †KwRwK অনুলিখনের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে জাপানের অপর এক সম্রাজ্ঞীর তত্ত্বাবধানে wbnbRx নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জাপানের কথা-শিল্পী ও কথা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে,জাপানে কথাসাহিত্যের সূচনা হয় এগারো শতকে। রচয়িতা ছিলেন মুরসকি নো শিখিবু, যিনি ছিলেন জাপানের রাজসভার এক বিদুষী মহিলা। মুরসকি নো শিখিবু জাপানের কথাসাহিত্যের প্রবর্তক। মুরসকি নো শিখিবু রচিত †MwÄ-†gv‡bv‡MvZwi জাপানের সুবৃহৎ উপন্যাস। জাপানের তৎকালীন নর-নারীর পারস্পরিক জীবনধারা †MwÄ-†gv‡bv‡MvZwi-†ত বিধৃত। ১০০৪ সালে প্রণীত †MwÄ-†gv‡bv‡MvZwi পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন কথাসাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যেও এই গ্রন্থ একটি বিশেষ উদাহরণ। মুরসকি নো শিখিবুর পরে সি-ই-সোনা নামে জাপানের একজন নারী লেখক gK‡iv †bv †mvkx নামক এক ব্যঙ্গ কাহিনি রচনা করেন।এতে জাপানের অভিজাত ও রাজন্যবর্গের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গোপনীয় বিষয় অতি সরসভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে জাপানের ধ্রুপদী সাহিত্য যুগের অবসান হয়। এরপর দেশ কিছুদিন উপন্যাস রচনা অবহেলিত ছিল(জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭: ২৬০)।

ধ্রুপদী সাহিত্য যুগের অবসানের পর লক্ষ্য করা যায় টোকোগাওয়া যুগ (১৬০৩-১৮৬৭)। এই সময় জাপানের নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এসময় জাপানের শিক্ষিত সমাজের অভ্যন্তরে জ্ঞানলাভের জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এরই ফলে জাপানে চীন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ জাপানি ফুজিওয়ারা ও সিকোওয়া প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত 'কঙ্কুশ' তথা চীন-তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণামণ্ডলির সাহায্যে চীনের শব্দকোষ, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জাপানের শব্দকোষ, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ১৮৬৮ সালে জাপানে মেজি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রবর্তনে তথাকার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের নব-প্রবর্তন অনেকটা সাহায্য করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মেজি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রবর্তনের পর জাপানের যুব সম্প্রদায় প্রাচীনতার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করতে শুরু করে। জাপানিদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারতার জন্য নবীনেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ইতোমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এ সম্পর্কে জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—প্রাচীন সভ্যতার-প্রতীচ্য স্বাধীনতার—প্রতীচ্য চিন্তাধারার আলোকে তখন নিখিল ভুবন উদ্ভাসিত। নবজাগ্রত জাপানও সেই আলোর রসে মাতাল হয়ে উঠল। যে সকল জাতির প্রাচীন জ্ঞান-ভান্ডারে কিছু রত্ন সঞ্চিত ছিল তারা প্রতীচ্য সভ্যতার এই আলোর আস্বাদ উপভোগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল সত্য, কিন্তু বিশ্বসভ্যতার নবজাত শিশু জাপানের মতো সে-আলোর রসে মাতাল হয়ে ওঠবার প্রয়োজন মনে করেনি। পূর্বে যেমন জ্ঞানবৃদ্ধ চীন ছিল জাপানের জ্ঞান-সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থল, এখন তেমনি নব-জ্ঞান-বিমন্ডিত ইউরোপ ও আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নবীন জাপানের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ। যা'তে সাধারণের প্রাণে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা প্রবেশ করতে পারে তার জন্যে জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্যের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচুর অনুবাদকার্য্য সম্পাদিত হতে আরম্ভ হলো। রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট', মিলের 'প্রতিনিধিত্ব-

মূলক শাসনতন্ত্র', গিজো ও বাকলের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, লিটন ও ডিজরেলি; বাইরন, শেলি সেক্সপিয়র, মিল্টন, হার্বাট স্পেন্সর, তুরগেনিভ্, কার্লাইল, ইমার্শন, বেকন, ভিক্টর হুগো, মোপাশাঁ, কিটস্, হেইন এবং দাঁতে প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য মনীষীর মূল্যবান গ্রন্থাদির অনূদিত সংস্করণ সমগ্র জাপানে নবযুগের বিপ্লবের বার্তা প্রচার করে দিয়েছিল। এমন কি ঐ সময় জাপানে ইংরেজি জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার জন্য বিশেষ আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। মেজি যুগের শেষ ভাগে জাপানের নবীন সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষার ও বৈদেশিক জ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে 'নিউ রোমানাইজেশন সোসাইটি' (সিন রোমানজাই কাই), 'বিদেশি ভাষা অনুশীলন-সমিতি' এবং 'জাপানি বর্ণমালা প্রবর্ত্তন সমিতি' প্রভৃতি বহুবিধ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মেজি যুগের গোড়ার দিককার অনুবাদ-সাহিত্যে যতখানি উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতা পরিস্ফুটিত হয়েছিল শেষের দিককার রচনায় তা দেখা যায়নি। (জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭: ২৬১)

মেজি সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপানে কথাসাহিত্য রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সর্বপ্রথম শুরু হয় অনুবাদ। ১৮৭৯ সালে ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বুলওয়ার লিটনের *Ernest Maltravers*উপন্যাসdv¸Y-w'‡bi jZvcvZvi Mvb শিরোনামে অনূদিত হয়। এই সময় ইওয়ো মো তো কর্তৃক অনূদিত 'লিট্ল লর্ড ফউন্টলিয়র' গল্পটি জাপানে খুব জনপ্রিয় হয়। পরে ইওয়ো মো তো কর্তৃক অনূদিত আরও কিছু সাহিত্য কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৮৫ সালে সুবৌচি নামক একজন জাপানি লেখক *The Essentials of Novel Writing*নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি কথাসাহিত্য রচনায় পূর্বতন ধারা পরিবর্তনে সাহায্য করে। এরপর জাপানের কথাসাহিত্য রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন সুবৌচির প্রিয় শিষ্য ফুতাবতী, শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মোরি ওগাই প্রমুখ লেখক। তবে তখনও অনুবাদ ছিল প্রধান মাধ্যম। এসময় যযোয় নোগমি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

পরবর্তীকালে জাপানের সাহিত্যিকদের চেষ্টায় কথাসাহিত্য আপন রূপ ফিরে পায়। জাপানের এসব সাহিত্যসেবীর মধ্যে ন্যাতসিউম সোসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যাতসিউম সোসের দুটি শ্রেষ্ঠ গল্প হলো 'ওয়াগায়াই ওয়ানিকো দি অরু' এবং 'বচাউ'। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ন্যাতসিউম সোসের দুটি কথাসাহিত্য wKKPvB Kvbও wKZPvB q‡nv। এই দুই উপন্যাসে জাপানের নারী সমস্যা ও নারী প্রগতি সম্পর্কে সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে। কুরাতা হয়কুজু জাপানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর অন্যতম নাটক *The Priest and His Disciple*নামে অনুবাদ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে জাপানে পরবর্তীকালের সাহিত্যে বলশেভিক ধারার প্রকাশ ঘটে (জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭ : ২৫৯-৬৪)।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

অনেকেই স্বীকার করেন যে, বাণিজ্যে নিপুণ ও রণকুশল এবং সাম্রাজ্যগর্বী জাপান বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যাসঙ্কুল হলেও সাহিত্যে রূঢ়ভাব তেমন প্রকট হয়নি। জাপানি কবিতার যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো কবিতার মধ্যে বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করার প্রবণতা। জাপানি কবিরা মনে করেন যে, বাক্যের ফেনিল উচ্ছাসে হারিয়ে না গিয়ে আভাস ইঙ্গিতে সাহিত্য হয় সুন্দর ও শ্রুতিমধুর। জাপানের বিখ্যাত কবি ইয়োনে নোগুচি তাঁর Rvcwb KwveZvi g¤§K_v *(The Spirit of Japanese Poetry)*গ্রন্থে বলেছেন—'আমার বরাবরই মনে হয়, ইংরেজ কবিরা বহু পরিশ্রম অপব্যয় করে ফেলেছেন কথার পিছনে। কেবল কথা আর কথা। অনিচ্ছায় হলেও, বাক্যজালে তাঁরা যে বক্তব্য বিষয়কে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই' (জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭ : ২৬৪)।

কথার কোনো অত্যাচার নেই জাপানি কবিতায়, সেখানে আছে ইঙ্গিত ও মনের গভীর আলোড়ন, যা মানুষের মনের অন্তর্নিহিত মৌলিক আবেদন। না-বলার বিশাল জগৎ অসীম মাধুরী নিয়ে ধরা পড়ে কবিতায়। জাপানি কবিতার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিত্যদিনের জীবন ও জগতের মধ্যে সুনিবির সম্পর্ক ও সহজবোধ্য পথচলার গান—জীবনের গান। সৌন্দর্যের সর্বজনীন উপাসনা জাপানি কাব্য-রীতির এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ। জাপানিদের এই সৌন্দর্যবোধ এবং জীবনে তাকে স্বার্থক রূপ দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিমুগ্ধ করেছিল। জাপানিদের কাব্যপ্রীতি লক্ষ করে লাফ্‌কেডিয়ো হার্ন মন্তব্য করেছেন—'বাতাসের মতই কবিতা জাপানে সর্বজনীন। সবাই এখানে অনুভব করে কবিত্ব, পড়ে এবং লেখে কবিতা। এ বিষয়ে ধনী-দরিদ্র বা বড় ছোটর কোনো পার্থক্য এ-দেশে নেই।' (জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭ : ১২০)। লাফ্‌কেডিয়ো হার্ন্-এর মন্তব্য কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও অনেকাংশে সত্য।

জাপানি কবিতার সর্বপ্রধান উৎস দেশের প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য। যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানে ঋতুর সংখ্যা কম, তবু জাপানি কবিরা প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্য, প্রকৃতি ও বৈচিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আঠারো শতকের কবি ইয়োসা বুশন বর্ষার গান লিখেছেন এভাবে—

বরষা রিম্‌ঝিম্ ঝরে অঝোর!

ফুরানো বাঁশী শোনো বাজিছে জলধারার,

প্রাচীন বয়সের শ্রবণ মোর (জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭ : ১২০)।

*Dhaka University Institutional Repository*

জীবন-সন্ধ্যায় সব-হারানোর, সব ফুরানোর গান কবি শুনেছেন বর্ষার জলধারায়। যেমন উজার করে দিচ্ছে আকাশ আজ নিজেকে, তেমনি আপনাকে উজার করে দেবার দিন এলো। প্রাচীনকালের নারী কবি কোমাচি বেদনা বিধূর বর্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

ফুলেরা ঝরিল বরষায়,

প্রিয় মোর হারালো কোথায়?

আলসে চাহিয়া রহিলাম,

পরিয় মোর গেল সে কোথায়?

দূর-দিগন্তে বরষায় নারী কবি কোমাচি তাঁর হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করেছেন, যেখানে প্রকাশ পেয়েছে তার হৃদয়ের আকুতি।

জাপানের আগ্নেয়গিরি ফুজি জাপানিদের নিকট চির রহস্যময়। প্রাচীনকালে ছিল অগ্নিশিখার ধুম্রচ্ছাসে ভয়ঙ্কর, পরবর্তীকালে শান্ত-স্থির ও তুষার শুভ্র। ইয়ামাবে নো আকিহিতো 'ফুজি'র শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ দেখে বিমোহিতো হয়ে লিখেছেন—

তাগোর তীরে তীরে

করেছি বিচরণ;

ফুজি-র গিরিশিরে

তুষার আবরণ।

অন্যদিকে অজ্ঞাতনামা আর একজন কবি 'ফুজিসান' নিয়ে লিখেছেন যে—

সুরুগা আর কাই জুড়ে' দাঁড়িয়ে আছে

উত্তুঙ্গ ফুজি পর্ব্বত;

আকাশের মেঘেরা থমুকে থাকে দাঁড়িয়ে,

পার হ'তে সাহস করে না এর উন্নত শিখর।

Dhaka University Institutional Repository

পাখিরা উড়তে পারে না এর চূড়োর উপর।

তুষারের অশ্রান্ত বর্ষণ

চাইছে এর জলন্ত আগুন নেবাতে,

আর, জলন্ত আগুন এর বুকের

চাইছে এর পড়ন্ত তুষার গলাতে।

এ যেন কোন্ অনাম দেবতা,

চিরকালের বিসময় মানুষের,

রূপ যার আঁকা যাবে না কোনদিন।

সে-নো-উমি নামে বিশাল হ্রদ

লুকিয়ে আছে এই পাহারের বুকে;

ফুজি-গাওয়া নামে বিশাল নদী,

নাবিকেরা যা ভয়ে ভয়ে পার হয়,

-বেরিয়ে এসেছে তারই জল থেকে।

এ যেন সেই বিধাতৃপুরুষ,

অনন্ত কাল চেয়ে আছেন

সূর্য্যোদয়ের দেশ এই ইয়ামাতোর,

আমাদের এই জাপানের পানে।

এ পাহার তার পবিত্র সম্পদ,

তার চিরন্তন গৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

যুগ যুগান্ত ধরে’ও দেখে দেখে

ক্লান্ত হয় না চোখ,

সুরুগায় এই ফুজি পাহারের চূড়া। (পূর্বোক্ত)

পর্বত ফুজি জাপানের জাপানের সম্রাট মেইজি (১৮৫২-১৯১২)-কেও আকৃষ্ট করেছিল। বসন্তে ফুজি পর্বতের অপরূপ শোভামুগ্ধ সম্রাট মেইজি লিখেছিলেন—

বসন্ত এলো,

আজ পাহাড় সবুজ,

শুধু ফুজির চূড়ায়

আজো শুভ্র তুষার।

(জগদ্ধাত্রীকুমার, ১৩৩৭ : ১২০)।

বসন্ত অনাবিল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ নিয়ে আসে জাপানে। বসন্ত আসে জাপানে, কুয়াশায় ঢাকা আকাশ, তুষার গলেনি তখনো, মাঝে মাঝে ঝরে বৃষ্টি, চাঁদ দেখা যায় অস্পষ্ট আকাশে। স্বপ্ন রাজ্যের ছবির মতন ভোরের বেলায় বাগানে প্রজাপতির মেলা, বুনো হাসের দল চলে যায় উত্তর দিকে নতুন ঠিকানায়। চেরিফুল ফোটে, বনে বনান্তে সুরের মাধুরী ছড়ায়—পাখির সুমিষ্ট গান আর আসে উৎসবের দিন। নবম শতাব্দীর কবি মিৎসুনে জাপানের বসন্ত ও চেরি ফুল সম্পর্কে লিখেছেন—

বসন্তরাত, বৃথা এ আঁধার চারিধার।

পামের (পামের?) মুকুল দৃষ্টি আড়াল,

গন্ধ ঢাকিবে কে তাহার?

বসন্তে জাপানিদের সবচেয়ে প্রিয় চেরিফুল। অনুষ্ঠিত হয় চেরি উৎসব। এগারো ও বারো শতকে সেই চেরিফুলের প্রশস্তি রচনা করেছেন কবি কোরোমিচি (১০৯৩-১১৬৫)—

পাহার চূড়ায় চেরীফুল ফোটে

মেঘের মতো

ঝরে’ যায়, যেন গিরিপদমূলে

*Dhaka University Institutional Repository*

তুষার শত।

শীতের দিনে গাছের পাতা ঝরে যায়, তুষার বর্ষিত হয় চারদিকে। সুতীব্র শীতল বায়ু, রিক্ত প্রান্তর আর পাণ্ডুর চাঁদ। কবি ভিক্ষু সাইগিয়োর (১১১৮-১১৯০) কণ্ঠে বাজে বর্ষ শেষের সুর—

বসন্তকবে হেসেছিল হায়,

'নানিবা' সায়র-তীরে

'সোৎসু'তে, সে যে স্বপন দূর-সুদূর।

উত্তর-বায়ু আজি শিহরায়

ঝরা পাতা ঘিরে' ঘিরে'

শরবনে তার বাজিছে তীব্র সুর।

জাপানি কবির এই ঋতু সম্পর্কিত কবিতায় কিছু শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এমনিভাবে জাপানের কাব্যলোকে চলছে পরম প্রকৃতির সীমাহীন সুর ছোট ছোট কবিতায় ফুটে উঠেছে জলছবির মতো অন্তহীন বর্ণ-বিলাস। আকাশে আঁকা ছায়াপথ শরৎ সন্ধ্যায়, বনে বনে পাতায় পাতায় বর্ণাঢ্য শোভা, শিশিরের শিহরন ও হরিণদলের সানন্দ বিচরণ। আবার গ্রীষেমর প্রভাতে অরুণ আলো, পুকুরে পুকুরে পদ্ম-কুমুদের সৌন্দর্য এবং গ্রীষ্মশেষে সুমধুর বৃষ্টি ও দিনের শেষে সান্ধ্য বায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শ।

কেবল প্রকৃতির লীলা নয়, জীবন, জগতের ও নিত্য দিনের সুখ দুঃখও ফুটে উঠেছে অপূর্ব রেখার মধুর টানে। সন্তানহারা দশম শতাব্দীর নারী কবি নাকাৎসুকাসা রচনা করেছেন—

পাহাড়ের বুকে চেরীফুল ফোটে,

চেরীফুল ঝরে' যায়,

হেরিয়া পরাণ ভরে মোর বেদনায়।

সরল ছোট কবিতাগুলিতে জীবনবোধ সঞ্চারিত। নিত্যদিনের ভালোবাসা ও হাসি-কান্নায় প্রোজ্জ্বল।

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানি সাহিত্যে জোনাকি

জাপানিরা জোনাকি ভক্ত। তাদের ভাষায় জোনাকির নাম ‘হোতারু’। জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে জোনাকি নিয়ে মেলা হয়। শুধু মেলাই নয়; ‘জোনাকি উৎসবের’ আয়োজনও হয়ে থাকে। জোনাকি নিয়ে জাপানে রচিত হয়েছে সুখশ্রাব্য সাহিত্য, কবিতা ও গান।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মন্তব্য করেছেন—

> গ্রীষ্মের সময় জোনাকির পঙ্গপালের আবির্ভাব হয়, তখন সেই দিপ্তী-জটলা দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক ছোটে সেই আলোর হাটে। প্রতি বৎসর স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত হয় জোনাকি-মেলার যাত্রীদের জন্যে। সারারাত্রি স্ত্রী-পুরুষেরা নদীর তীরে ব’সে অথবা নৌকারোহণে জোনাকির ঝামেলা দেখে। জোনাকি ধরা জাপানে একটি প্রাচীন উৎসবের ব্যাপার। বিলেতে যেমন Fox hunting, তেমনই জাপানে অভিজাতবংশীয়েরা মাঝে মাঝে খদ্যোত শিকারের নিমন্ত্রণ পাঠান বন্ধুদের। অন্ধকার রাত্রে বাগানের তরু-বীথিতে লম্বা লম্বা ঝুলিতে জোনাকি শিকার চলে। স্ত্রী=পুরুষ-ছেলে-মেয়ে সকলেই এই মৃগয়ায় যোগদান করে (সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৪৫ : ১৪৩)।

বহু যুগ ধরে জাপানি কবিরা জোনাকির উপর কবিতা লিখেছেন। কবিতাগুলো ছোটো হলেও জোনাকির মতো জ্যোতির্ময়। দশম শতকের †MwÄ-g‡bvMwi উপন্যাসের নায়ক তার ঝুলিতে বন্দি জোনাকির ঝাঁক উড়িয়ে অন্ধকার রাতে নায়িকার মুখশ্রী দেখে নিল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে জাপানের বাজারে কারুশিল্প রচিত বাঁশের খাঁচায় হাজার হাজার জোনাকি বিক্রি করা হতো। ঘরের ভিতর যখন উৎসব সভার ভোজ বসে, তখন গৃহস্বামী জোনাকির পঙ্গপাল ছেড়ে দেন তাঁর সামনের বাগানে। তৃণে আর গুল্মে গাছে গাছে জ্বলে ওঠে জঙ্গম দীপের দীপালি।

আলো আর প্রেম স্বপ্রকাশ—স্বপ্রকাশের মহিমায় মহিমান্বিত। তাই জাপানের আঠারো শতকের নারী কবি মুরাসাকি শিকিবু লিখেছেন—

ভালবাসা মোর যেন জোনাকির মত,

অঞ্চলে ঝাঁপি রাখি তারে আমি যত,

কিছুতেই তবু পারি না যে লুকাবারে,

আপন আলোতে ধরা দেয় আপনারে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার—

গোধূলির আলো এখনো নিভেনি বটে,

জোনাকিরা তবু এসেছে সুমিদা তটে।

সেতুর তলায় আঁধারের কোণে কোণে

আনাচে কানাচে যেন সব বরক'নে

মারে উঁকিঝুঁকি নয়নে ঝিলিক হানি

পরাণে পরাণে চোখে চোখে কানাকানি।

জলার ঘাসে নামল সাঝের আঁধার। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল জোনাকির দল। অন্তরে বাহিরে অন্ধকারের হয় অবসান, ফোটে দীপিকার ঔজ্জ্বল্য। নিশিথে নিঃশব্দে যে আলো ফোটে আর নিভে যায়, তার নাম জোনাকি। রুদ্ধ কক্ষ, বাতায়নে প্রবেশ-ভিক্ষু জোনাকি। একটি জোনাকি উড়ে এসে বসল জনশূন্য মাঠে। ফলে বেদনা বিধুর নৈঃসঙ্গে এল ক্ষণিকের অতিথি—সে জোনাকি। সঙ্গে সঙ্গে কবির মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কবি লিখলেন—

একটি জোনাকি উড়ে এল শাদ্বলে,

হেরি তৃণে তৃণে শিশিরে হীরক জ্বলে।

আমি পোড়ো জমি, আঁখিজল ঘাসে ঘাসে,

অশ্রু আমার তোমার কিরণে হাসে।

কৌতুকময়ীর লুকোচুরি খেলার ছবি।

মোর ঘরে আসি জোনাকি নিভালে আলো,

ধরা দিয়া তবু কৌতুকে সে লুকালো।

ধীরে ঘরে আসি জোনাকি নিভালো আলো,

Dhaka University Institutional Repository

ভীরুর মিলন আঁধারে জমিবে ভালো।

জোনাকি উড়িয়া এল মোর করতলে,

আপন কিরণ নিঙাড়ি ‘নিঙাড়ি’ চলে। (সুরেন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ১৪৩-৪৬)

জাপানের কাব্যের ইতিহাসে রয়েছে আটটি যুগ। অতি-বিস্মৃত আদিকাল থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ‘আদিযুগ’। তারপর একে একে ‘নারাযুগ’ (৭১০-৭৯৩), ‘হেইহান্-যুগ’ (৭৯৩-১১৮৫), ‘কামাকুরা-যুগ’ (১১৮৬-১৩৩২), ‘মুরোমাচি-যুগ’ (১৩৩৩-১৫৬৫), ‘মোনোয়ামা-যুগ’ (১৫৬৬-১৬০২), ‘ইয়োদো-যুগ’ (১৬০৩-১৮৬৭) এবং পরে ‘টোকিয়ো যুগ (১৮৬৮ থেকে)। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত যুগগুলোর নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন যুগের রাজধানীর নাম থেকে। যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতার ধারা, যা জাপানকে উদ্ভাসিত করেছে।

প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সম্রাট নিন্‌তোকু। নিন্‌তোকু ছিলেন প্রজাবাৎসল, সরল, উদার ও মহাপ্রাণ। প্রজাদের অভাব অনটন দেখে তিনি তিন বছরের জন্য সকল কর মওকুফ করে দিয়েছিলেন। সম্রাট নিজে রাজপ্রাসাদের কোনো সংস্কার করেননি, যদিও এই তিন বছরের মধ্যে ভেঙ্গেছে দেয়াল ও ফাটল ধরেছে ছাদে। একদিন ছাদে উঠে সম্রাট নিন্‌তোকু দেখলেন সকল বাড়ির রান্নাঘর থেকে ধোয়া বেরুচ্ছে। আনন্দে নিন্‌তোকু বলে উঠলেন—

উচ্চ চূড়া হতে চাহিনু নিচে,

আকাশ-পানে ধূম কুণ্ডলিছে,

প্রজার ঘরে ঘরে সচ্ছলতা,

অন্ন-উৎসব বহে বারতা।

দ্বিতীয় যুগের প্রধান কবি হিতোমারো। এই সময় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় শিগা হতে নারায়। ‘শিগার’ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও হৃত রাজধানীর গৌরব কবির মনকে ব্যথাতুর করেছিল। কবি হিতোমারো লিখেছেন—

ওমি-সায়রের সন্ধ্যা ঢেউয়ের পরে

উড়িয়া চলিছে মুখর পাখির দল,

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের হেরি অতীতের স্মৃতিমালা

ভরিয়া তুলিছে আমার হৃদয়তল।

আবার—

অতীত দিনের রাজধানী হায়,

শিগার তীরে

পড়ি' আছে জনহীন,

তেমনি আজিও চেরীফুল ফোটে

দু'কুল ঘিরে'

আসে বসন্তদিন।

'ৎসুরায়ুকি' তৃতীয় যুগের কবি। রাজকার্য উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রায়ই বিদেশে থাকতে হতো। অবসর পেলে গৃহে ফিরে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দয্য উপভোগ করতেন। সুদীর্ঘকাল বিদেশে থেকে পরিত্যক্ত কুটিরে ফিরে 'ৎসুরায়ুকি' লিখেছেন—

কেহ নাহি আসে কুটিরে আমার

বসন্ত তবু হাসে,

আগাছায় ভরা আমার দুয়ার-পাশে।

এই যুগের একজন চিত্র-নিপুণা নারী-কবি 'কুনাই-কায়ো' ঝরা চেরিফুলের সৌন্দর্য্য তুলে ধরেছেন একটি কবিতায়—

হীরাপাহাড়ের বায়ু বহে' আসে,

সায়রের বুকে ঝড়ায়ে ফুল,

সেই ফুল-পথে জলরেখা আঁকি,

Dhaka University Institutional Repository

তরী বহে' যায় সুদূর-কুল।

'ইয়েদো' যুগে জাপানি কাব্যসাহিত্যে দু'টি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় পৌরাণিক সংস্কৃতি ও রচনারীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। অন্য ধারাটিতে সহজ-সরলভাবে লৌকিক ভাষা-ভঙ্গীকে কাব্যে অবতারণার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। 'টকিয়ো' অর্থাৎ বর্তমান যুগে জাপানি সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্যের রোমান্টিক এবং প্রকৃতিপন্থি কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু জাপানি কাব্য ও সাহিত্য অনুকরণের মত্ততায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলী দেয়নি।

আধুনিক যুগ

১৮৬৮ থেকে ১৯৪১ সাল তথা পার্ল হারবারে জাপানি সমর শক্তির চাঞ্চল্যকর সাফল্যের সময়কে জাপানি সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা চলে। তারপর আসে সমকালীন যুগ। কিন্তু বর্তমান গবেষণার কালকে বিবেচনা করলে আধুনিক যুগ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত জাপানি সাহিত্য আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সালে জাপানে তকুগাওয়া সামন্তপ্রথার অবসান হয় এবং মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে 'মিকাডো' বা জাপান সম্রাট পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। এর আগে আমেরিকা এক নৌ-আক্রমণের মাধ্যমে জাপানে যে পরিবর্তন সাধন করে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জাপান বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হয়; ফলে জাপানের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময় বিদেশি সাহিত্য ও অনুবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনুবাদের মাধ্যমে জাপানি জনগণ পরিচিত ও প্রভাবিত হয় রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেগু, মিল ও বেন্থামের ভাবাদর্শে। জাপানি লেখকরাও নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাহিত্য সৃষ্টিতে আগ্রহী হন। য়্যানফুমিও, ফুকুজাওয়া ইউকিচি (১৮৩৪-১৯০১)। তুবাউচি শোয়া (১৮৫৯-১৯৩৫) প্রমুখ প্রতিভাবান লেখক নতুন করে নিয়োজিত হন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যায়। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যকার ও সমালোচক তুবাউচি-র প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-গ্রন্থ G‡mÝ Ad ‖' b‡fj (১৮৮৬) বা উপন্যাসের সারমর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুবাউচি তাঁর গ্রন্থে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপন্যাস রচনার উপাদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে তাঁর বিরোধী মতের লেখকদের মুখোশ উন্মোচন করেন। তাঁর রচনায়, বিশেষভাবে, নাটকে শেক্সপিয়রের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি জাপানি নাট্যশালারও প্রভূত সংস্কার সাধন করেন—নাটকের উন্নতির প্রত্যাশা নিয়ে। সমকালীন অনেক শক্তিশালী লেখক তুবাউচি শোয়ার পথ অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ফুতাবাতিয়াই সিমাই, য়্যামাদা বিমিও এবং ওজাকি কোয়াও সে সময়ের বিখ্যাত লেখক। ওজাকি কোয়াও-এর 'প্রেমের কাহিনি', 'ভগ্ন হৃদয়' ও 'সোনালী দানব' জাপানি পাঠকদের ছিল আগ্রহের বিষয়। এ সময়কার সেরা নারী লেখক হিগুচি ইচিয়ো এবং

Dhaka University Institutional Repository

Zv‡KKiv‡e তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই যুগে তোকুতোমি রোকা ঔপন্যাসিক হিসেবে যত পরিচিত হন, তার চেয়ে বেশি পরিচিতি পান আত্ম-চরিতকার হিসেবে। তাঁর প্রসিদ্ধ আত্মজীবনী cKwZ I gvbl।

জাপানি সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে মেইজি যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে। এই সময় তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় রোমান্টিক রচনার বিরুদ্ধে। জাপানি লেখকেরা এ সময় 'শিল্পের জন্য শিল্প' সৃষ্টিতে আগ্রহ পোষণ না করে টলস্টয়, জোলা, হাক্সলি, ইবসেন, ডারউইন প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকের রচনায় ও ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। জাপানি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি কেবল সুনীল আকাশ, ফেনীল সমুদ্র, চেরি ফুল আর কিমোনোর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদ একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলো এবং এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলেন শিমারো হোগেৎসু প্রমুখ সমালোচক। পাশ্চাত্য ঘরানার কবিতা 'শিনতাই'-এর প্রবর্তক কবি শিমাজাকি। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাস nviæ (১৯০৮) তরুণ লেখকগোষ্ঠীর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। কবি শিমাজাকির বিখ্যাত উপন্যাস (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) Iqv‡K gvB রচনার জন্য ছয় বছর সময় দরকার হয়। এই বৃহৎ উপন্যাস ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়—যার পৃষ্ঠা সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি। এই উপন্যাসের নায়ক হানজু হলেন একজন গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। Iqv‡K gvB উপন্যাসে মেইজি পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমকালীন জাপানের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক অনবদ্য আলেখ্য সহজ, সরল ও সাবলীল ভঙ্গিতে রচনা করেছেন কবি শিমাজাকি। তাঁর এই উপন্যাস জাপানি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জাপানি সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদ প্রতিবাদহীন নয়; বরং এ সকল সাহিত্যের বিরুদ্ধধর্মী সাহিত্যও রচিত হয়েছে। প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদ-এর বিরুদ্ধে নাৎসুমির সুতীব্র লেখনি প্রশংসা লাভ করেছে।

মেইজি যুগের শেষেরদিকে জাপানি কথাসাহিত্যে যে প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদের প্রসার লক্ষ করা যায়, তার উৎসভূমি জাপান নয়। এই ধারাটির উৎসভূমি সুদূর ফ্রান্স। এই ঘরানার অনুসারী মতোসমোয়া, তসু শিমোজাকি প্রমুখ শক্তিধর কথাশিল্পী সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তিবিশেষের সংগ্রাম, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পুর্ণাঙ্গ প্রকৃতচিত্র আঁকতে মশগুল থাকতেন। কাব্যের কাঁচের মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন জীবনকে। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো আদর্শের ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের কাছে জীবন নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দময়। প্রাচীন গ্রিসের মহাকবি সফোক্লিস (৪৯৬-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)-এর অয়েডিপাশ বা ইডিপাশের মতো জীবন অসহায় ও নিয়তির দাসমাত্র।

অন্যদিকে একদল রোমান্টিক লেখকের আবির্ভাব হয়—যাঁদের সমর্থক ছিলেন সুজুকি, ওগাওয়া, মরিতা। এই লেখকবৃন্দ হলেন মানুষের অন্তরের সহজ ধর্মে বিশ্বাসী। সাহিত্যের আয়নায় সুন্দর

*Dhaka University Institutional Repository*

পরিবেশে জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ছিল তাঁদের সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তীকালে সুজুকি এবং ওগাওয়া পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শিশু-সাহিত্য রচনায়।

উপরোক্ত রোমান্টিক দলের পুরোধা ও নেতা ছিলেন কিকুচি কান (১৮৮৮-১৯৪৮), যিনি একজন বড় মাপের লেখক ও নাট্যকার ছিলেন। সাধারণ পাঠকের জন্য কিকুচি কান সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় উপন্যাস রচনার অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেন। কিকুচি কানকে কথাসাহিত্যে জনপ্রিয় করে তোলে mvb KvbvB (তিন পরিবার), mvbvB (জয়-পরাজয়), gv‘vi cvj প্রভৃতি উপন্যাস। আকুতাগাওয়া রাইনোসুকি (১৮৯২-১৯২৭) ছিলেন জাপানের একজন সেরা কথাসাহিত্যিক, তাঁর রচিত i‡mvgb আর nvbv (নাসিকা) প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্য। আকুতাগাওয়া রাইনোসুকির i‡mvgb চলচ্চিত্র হয় এবং তা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। দেশ ও বিদেশে আকুতাগাওয়া রাইনোসুকির i‡mvgb চলচ্চিত্র অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে একদল পণ্ডিত ও লেখক প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই দলে ছিলেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি সাহিত্যের অধ্যাপক বিন উহদা, ড. ওগাই মোরি (১৮৬৭-১৯১৬)—নাৎসুমে কিনোসুকে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সোসেকি নাৎসুমে প্রমুখ। এই সাহিত্য আন্দোলনের সময় তরুণ জাপানি লেখকদের উপর অধ্যাপক সোসেকি নাৎসুমের আদর্শের তীব্র প্রভাব ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সাহিত্যে অন্য একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়—যা সম্পূর্ণভাবে ধর্মাবলম্বী। জাপানি উপন্যাসেও ধর্মের প্রতি বিশেষ ঝোঁক লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কাগাওয়া তাওহিকো (১৮৮৮-১৯৬০) ও কুরতা মমজোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাইসো যুগ : তাইসো যুগের সময় ১৯১২-১৯২৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। ১৯১০ সালে টোকিও-র একটি বিখ্যাত বিদ্যালয়ে একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয় এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় হোয়াইট বার্চ সমিতি (White Birch Society) এই সমিতির সদস্যরা জাপানের ঐতিহ্যিক সাহিত্য ও কনফুসিয়াসের মতাদর্শের প্রতি প্রতিবাদ জানান। হোয়াইট বার্চ সমিতির মুখপাত্র ছিল wkivKvevnv, এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মুশানোকোজি সেনিয়াৎসু (১৮৮৮-১৯৭৬)। হোয়াইট বার্চ সমিতির সদস্যরা আদর্শবাদ, মানবতাবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদকে সমর্থন করেন—যা তাঁদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই দল ক্রমশ পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। তাঁদের প্রবন্ধ পত্রিকা wkKvivnvev কেবল সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা জাপানি সাহিত্য ও লোক শিল্পের উপর গুরুত্বারোপ করে, যা ইতিপূর্বে ছিল অবহেলিত। wkKvivnvev পত্রিকার অধিকাংশ লেখক ছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

*Dhaka University Institutional Repository*

তাঁরা সকলে মুশানোকোজি সেনিয়াৎসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও সাহিত্যিক জীবনে নিজ নিজ রচনাশৈলীর পরিপোষক ছিলেন। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মুশানোকোজি সেনিয়াৎসু ব্যতীত ছিলেন শিগা নায়োয়া (১৮৮৩-১৯৭১), ইয়ানাগি সোয়েৎসু (১৮৮৯-১৯৬১), সাতমি তন (১৮৮৮-১৯৮৩), আরিশিমা তাকেও (১৮৭৮-১৯২৩) ও ইশিহিরো নাগাও (১৮৮৮-১৯৬১) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবার হতে এসেছিলেন, তাঁরা টলস্টয়কে সমর্থন করতেন।

wkKvivnvev পত্রিকা ১৯১০ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু জাপানের কান্তো এলাকায় ভূমিকম্পে wkKvivnvev-র কার্যালয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই পত্রিকার প্রকাশ চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন একটি বিপ্লবী দল। তাঁদের কথা ‘কাগুজে বাঘ’ ছিল না। অরিসিমা কেবল মানুষের আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি সম্পূর্ণভাবে আস্থাবান ছিলেন মানুষের আত্মশক্তিতে। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি এক ঘোষণার মাধ্যমে জানান যে, ধনী ও বুর্জোয়া সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব সমাজ কল্যাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বিত্তহীনদের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টন করা। এই ঘোষণা অনুযায়ী অরিসিমা তাঁর হোক্কাইদোর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি নিজের প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, নিজের আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও তিনি সর্বহারাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারলেন না। তাই শেষপর্যন্ত নিজের জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যার চরম পথ সানন্দে বেছে নিতে বাধ্য হলেন। এই wkKvivnvev গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক নাওয়াশিগা সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা, অভূতপূর্ব রচনাশৈলী, অভিনব রচনাভঙ্গি, শব্দ-চয়ন ও রুচিবান লিপি কুশলতার মাধ্যমে আধুনিক জাপানি গদ্য-সাহিত্যের সেরা নিদর্শন সৃষ্টি রেখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর Rvcvb-hvÎx (১৯২৩) গ্রন্থে জাপানের অনেক বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন। জাপানের সাহিত্যচর্চাকে তিনি একেবারেই অনাড়ম্বর ও খুব উপভোগ্য হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে লিখেছেন—

> এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যই এখানে এসে অবধি রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনিনি। ওদের হৃদয় ঝরনার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ। এ পর্য্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্চে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিষটা স্বার্থ নিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটি নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্য-ভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনের কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই ওদের কুলায়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না। ...

পুরোনো পুকুর

ব্যাঙের লাফ,

জলের শব্দ।

ব্যাস্। আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যাক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কি রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কিভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে—তার বেশী একেবারে অনাবশ্যক (রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৩ : ৮২-৮৩)।

আদর্শবাদী অরিসীমার অত্যন্ত শোচনীয় পরিণাম ও পরিণতি থেকে প্রমাণিত হয় যে বিদেশের নতুন নতুন পণ্য বাণিজ্যের বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি দেশের অভ্যন্তরে কি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেশের দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে শোষিত শ্রমিকদের সংগ্রাম।

এই পরিস্থিতিতে জাপানের যুব লেখক সম্প্রদায়ের অনেকেই এই শ্রেণি-সংগ্রামকে বরণ করে নেন। সর্বহারা ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তাঁরা ক্ষুরধার লেখনী পরিচালা করেন। এ প্রসঙ্গে Zv‡bgvKwn‡Uv (বীজ-বপনী) পত্রিকা তাঁদের প্রধান হাতিয়ার ছিল। কইচিরো মেইডুকো, সুইকিচি ওনো, হাতসুনোসুকি, হিরাবায়াসি, উজাকু আকিতা প্রমুখ বামপন্থি ছিলেন Zv‡bgvKwn‡Uv-র নিয়মিত লেখক। ebwRAvB †mb‡mb (সাহিত্য রণভূমি) পত্রিকা প্রকাশিত হয় Zv‡bgvKwn‡Uv-র পরে। এ সময় 'জাপানি নির্বিত্ত সাহিত্যিক সঙ্ঘ' নামে আরো একটি প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

তাইসো যুগের শেষ পর্যায়ে সু-রিয়ালিস্ট নামে আর এক সম্প্রদায়ের কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়। রিচি ইকোমিট্সু, কাওয়বাটা, কাতাওকা ও নাগাগাওয়া প্রমুখ সু-রিয়ালিস্ট লেখকের প্রচেষ্টায় জাপানি কথাসাহিত্য অনবদ্য উপমা, সার্থক প্রকাশভঙ্গি ও নিত্য নতুন বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সোয়া যুগ (১৯২৬-১৯৮৯) : সোয়া যুগের প্রারম্ভে সোসেকি, বিন উইদা ও অরিশিমা-সহ সমসাময়িক প্রায় সকল লেখক জীবিত ছিলেন এবং প্রায় সকলেই সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। এসময় জাপানের আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয় এবং সঙ্গতকারণেই জাপানি পাঠকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রন্থ প্রকাশকরা এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কাইঝোসা নামে একটি সমকালীন সাহিত্য প্রকাশনা ৬৩ খণ্ডে জাপানি সাহিত্য প্রকাশ করে। অন্যদিকে ৫৯ খণ্ডে শিন্চোসার বিশ্বসাহিত্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ৪৮ খণ্ডে সুনিওডোর মেইজি ও তাইশো যুগের লেখক-গ্রন্থাবলি, ১৫৪ খণ্ডে সুনজোসা-র 'বিশ্বের মহামনিষী' ও ৪৪ খণ্ডে 'আইওয়ানামি'র সস্তা পকেট সংস্করণগুলির লক্ষ লক্ষ কপি জাপানি পাঠকমহলকে আগ্রন্বিত করে তোলে।

তৎকালীন পরিস্থিতি ছিল প্রগতিশীল বামপন্থিদের অনুকূলে। জাপানি নির্বিত্ত লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কইচিরো মেইডকো, কানেকা, হিরাবায়াসি প্রমুখের লেখনী গণসাহিত্যকে নতুন ধারা ধরিয়ে দেয়। জাপানি নির্বিত্ত লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের মুখপত্র †mb‖K-র ছায়াতলে প্রগতিশীল বিভিন্ন লেখক, কবি, নাট্যকার ও শিল্পীকে সমবেত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ১৯৩১ সালে 'জাপানি নির্বিত্ত তনকা-কবি সঙ্ঘ' প্রাচীন তনকা-কবিতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ‖eËn¨b-ms¯‖Z পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রসঙ্গ কবি কোবায়সির K¨i¨ Aš@i¨‡ji dj ও কিসি সান্জির Kg‡iW j0 ইত্যাদি রচনা ছিল খুবই উৎসাহপ্রদ।

ত্রয়োদশ সমিতি বা তেরজনের ক্লাব

উপর্যুক্ত গণসাহিত্য আন্দোলনের ধারা সুদীর্ঘকাল অব্যাহত গতিতে চলতে পারেনি। তাই প্রয়োজন হয়ে পরে নতুন সংগঠন ও নতুন চিন্তাধারার। ফলে ত্রয়োদশ সমিতি বা তেরজনের ক্লাব নামে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক যেমন তাকিও, কাটো, শিরোওজাকি, সুরাও নাকামুরা, কাওয়াবাতা এই সংগঠনে যোগদান করেন। ত্রয়োদশ সমিতি পূর্ববর্তী সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী লেখনী ধারণ করে। ১৯৩১ সালে ওয়াশিংটন

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্মেলনের শিকল ভেঙ্গে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে।[২৭] এই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান পৌঁছান। টোকিওতে বক্তৃতার সময় কবি জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের সমালোচনা করেন। তার পরদিন জাপানের ইংরেজি পত্রিকায় লেখা হয় 'The Hindu saint of India advises our Emperor'.এরপর কবির সকল অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর শুরু হয় ফ্যাসিস্ট জাপান সরকারের সকল রকমের কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি। সকল প্রকার স্বাধীন মত ও ভাব প্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এসময় চীনের মূল ভূখণ্ডে জাপানি সমর শক্তির ব্যাপক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের গণআন্দোলন ও গণসাহিত্যের কন্ঠরোধ করা হয়। এমন কি মৃত লেখকেরাও বাদ গেলেন না। অপসাহিত্য ও প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলে এগারো শতকের বিখ্যাত রচনা †MwÄ-Kvwnwb ও সতের শতকের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সাইকাজুর রচনাবলি নিষিদ্ধ করা হলো। একই সঙ্গে সমসাময়িক কালের রোকা তকুতোমির cKwZ I Rxeb মুসাকোজির Pvi †evb ইত্যাদি বহু সার্থক উপন্যাস ও পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়।

আনোয়ার হোসেন নামে একজন লেখকের নাম পাওয়া যায়, যদিও বাংলা চরিতাভিধানে তাঁর নাম নেই। তিনি এম এ., বি টি. এবং AvawbK Rvcvb শীর্ষক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন—যা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৯৩৭ সালে সংঘটিত চীন-জাপান যুদ্ধ, সাহিত্য ও সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আনোয়ার হোসেন চীন ও জাপানের যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে লিখতে পারেননি, কেননা এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই এবং শেষ হয় ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, দিগীন্দ্রচন্দ্র ১৯৪৬)। আনোয়ার হোসেন চীন-জাপান যুদ্ধ ১৯৪০ সাল সময় পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে সক্ষম হন। তবে তিনি জাপানি সাহিত্যের একটি মূল্যবান সময়ের দিক উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে জাপানের সাহিত্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯২৩ সালের ভূমিকম্প জাপানের যেরূপ ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধন করেছে, পুরানোকে ভেঙ্গে নতুন করার সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি জাপান পুরনো সাহিত্যের ধারাকে বিদায় দিয়ে নতুন পথে চলতে শুরু করেছে। আগের নামজাদা সাহিত্যিকরা তাঁদের পূর্বের সম্মানজনক আসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন। খুব কমসংখ্যক পাঠক তাঁদের লেখাকে সমাদর করে। আনোয়ার হোসেন মন্তব্য করেছেন—

২৭. এই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান পৌঁছান। টোকিওতে বক্তৃতার সময় কবি জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের সমালোচনা করেন। তার পরদিন জাপানের ইংরেজি পত্রিকায় লেখা হয় 'The Hindu saint of India advises our Emperor'.এরপর কবির সকল অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

> পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক সাহিত্য বিশেষ করিয়া রুশ সাহিত্য যেরূপ সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদের জীবনের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছে - জাপানী সাহিত্যেও সেরূপ একটা চেষ্টা চলিয়াছে। সমাজের যারা ব্যথিত, বঞ্চিত, হতাদর তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা জাপানে জোরে সুরু হইয়াছে। সাহিত্যে আভিজাত্যের যুগ আর নাই। নিছক ভাব-বিলাসিতা, কল্পনা-প্রবণতা, রাজা রাজরার জীবনের কাহিনি, ঐশ্বর্য্য এবং সমাজের ফেনায়িত বৃহদাকারের ছবি এ যুগে হয়ত আর চলিতে চায়না। অনেকেই আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে নিঃস্ব, অনাদৃত ব্যক্তিই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। ফলে তাহাদের সাহিত্যও যে এক গৌরবান্বিত আসন দখল করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? (আনোয়ার ১৯৪১ : ৫১-৫২)।

প্রকৃতপক্ষে, এ সময় অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো জাপানে যে সাহিত্যের স্রোত প্রবাহিত হয় তা প্রধানত হৃত-দরিদ্র মানুষের জীবনের বাস্তব রূপ। জাপানের এই সময়ের নব্য সাহিত্যিকরা দরিদ্র পীড়িত জনগণের জীবনকে তাঁদের সাহিত্যের মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। আনোয়ার হোসেন লিখেছেন যে, মার্কস্-এর মতবাদ কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্বন্ধে জার্মানিতে যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে জাপানে। সময় হিসেবে ধরতে গেলে রাশিয়ায় ১৯১৯ সালের বলশেভিক আন্দোলনের ঢেউ অনেক দেশকেই আচ্ছন্ন করে। জাপানে এই আন্দোলনের প্রারম্ভকাল ১৯২১ সালে হলেও তথায় 'নিপ্পন প্রোলেটারিয়ান আর্টিস্টস্ ফেডারেশন' গঠিত হয় ১৯২৫ সালে এবং পরে এই সমিতির আরো সংগঠিত হয়। 'শ্রমিক, কৃষক ও শিল্পী ফেডারেশন' নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই সমিতির বহু শাখা ও প্রশাখা ছিল। মূল উদ্দেশ্য প্রায় সকলেরই এক, যদিও কোনো কোনো বিষয়ে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। চকু টকুনাগা ও টাকিজা কবায়িশি প্রমুখ লেখক নিপ্পন প্রোলেটারিয়ান আর্টিস্টস্ ফেডারেশন-এর পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত লিখতেন। ইউরিকো চুজো একজন শক্তিশালী নারী লেখক, যিনি রাশিয়া থেকে ফিরে এসে রাশিয়ার উন্নয়ন সম্পর্কে খুব সহজ, সঠিক ও দৃঢ়ভাবে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেন। চকু টকুনাগার লিখিত *The Street without the Sun*গ্রন্থটি*Die Strasse Ohne Sone* নামে জার্মান ভাষায় মুদ্রিত হয়। টমিকি হসোডা লিখিত *Spring of the Truth* ধনী সম্প্রদায়ের জীবনযাপন সম্পর্কে এক অতি উপাদেয় ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। সম্প্রতি শ্রমিক শ্রেণির সমর্থক লেখকরা কৃষক সমাজ ও ধর্ম-বিরোধী আন্দোলনকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন।

এই সময়ে শ্রমিক স্বার্থের বাইরে যাঁরা সাহিত্য সাধনায় মগ্ন, তাঁদের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন—বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী। *Before the Break of Day*গ্রন্থটি টসন সিমাজাকি প্রাচীন জাপানের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। জুলিকরো টানিজাকি *A Fylfot*নামে একটি গ্রন্থ

*Dhaka University Institutional Repository*

রচনা করেছেন, যেখানে অস্বাভাবিক যৌনবোধ-সম্পন্ন মানব ও মানবীয় জীবন প্রধান বিষয়বস্তু। এছাড়া *A Cafe Girl, The Brothers Aujo*ও *Tramps of the Street*ইত্যাদি গ্রন্থ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনধারার বাস্তব ছবি। ইউরিন গেঞ্জি, টয়োহিকোকুনু ও মাসাটসুনে নাকামোরা প্রমুখ কবি সাহিত্যের জন্য সাহিত্য—এই  জাতীয় লেখক। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রূপ ও মেজাজের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তবজীবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাপানে সাংবাদিক-সাহিত্যের দিকে জাপানি লেখক ও পাঠকদের খুব ঝোঁক লক্ষ করা যায়। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গল্পের আদর খুব বেশি। কেননা সকলেই মনে করেন যে বাস্তব কল্পনার চেয়েও ভয়াবহ। ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পের পর জাপানে ‘জনপ্রিয় সাহিত্য’ নামক এক শ্রেণির সাহিত্য খুবই প্রসার লাভ করে। অনেকে মনে করেন, এই সাহিত্য আমোদজনক ও তরল। ইতিহাসের গল্পের উপর কল্পনার রং দিয়ে খুব সহজ ও লোকপ্রিয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করা হয়। পরিশেষে আনোয়ার হোসেন মন্তব্য করেছেন—

> চন্দ্র মল্লিকা, চেরীর দেশ জাপান। সৌন্দর্য্যের ঢেউ উঠিয়াছে চারিদিকে। জাপানী মন স্বতঃই কবিতানুরাগী। জাপানীরা অনেকেই কবিতা লেখে ও ছবি আঁকে। তাহাদের কবিতায় শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের নৃত্য, ষ্টাইলের বাহাদুরী নাই—আছে ইঙ্গিত। দু’এক কথায়, নিতান্ত সহজ ও সোজাভাবে অতি সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায় এই সব কবিতায়, যথা—
>
> ব্যাঙ নড়ে
>
> পাতা পড়ে
>
> অথবা
>
> পচা পুকুর
>
> ব্যাঙের লাফ
>
> ব্যাস্! হইয়া গেল কবিতা। কবিতা নয় যেন ছবির মধ্যে তুলির আঁচড়। এই সব কবিতা চোখ দিয়া পড়িতে হয় না, মন দিয়া দেখিতে হয়। কতগুলি অক্ষর পাশাপাশি সাজাইলেই জাপানী কবিতা হয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ কবি ইয়নো নগোচি। তিনি দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। আমেরিকার কবি মিলারের সংস্পর্শে আসিয়া কবি

*Dhaka University Institutional Repository*

> নগোচি প্রথম ইংরেজী শিখেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'Seen Unseen' আমেরিকাবাসীগণকে তাক লাগাইয়া দেয় (আনোয়ার ১৯৪১ : ৫৪-৫৫)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি লেখকদের নিজস্ব সত্তার অস্তিত্ব রইলো না বরং যাঁরা শারীরিকভাবে বলবান, তাদের বলপূর্বক রণক্ষেত্রে পাঠানো হলো। কাউকে কাউকে পাঠানো হলো জাপানের অধিকৃত দেশে ও নতুন জাপানি উপনিবেশগুলোতে আত্মগর্বী জাপানি সাংস্কৃতিকধারা প্রচার করতে। ফলে এই সময়ের জাপানি সাহিত্য ছিল উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী—যা কোনোভাবেই সৃজনশীল ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সময়ে রচিত আসিহিআই হিনোর উপন্যাস Mg I ˆmwbK, gwU I ˆmwbK, Kmg I ˆmwbK; তাৎসুজো ইসিকাওয়া এবং ফনিও নিওয়া-র KvBivb PZvB (যাঁরা আর ফিরল না), KvB‡mb (নৌ-যুদ্ধ, ১৯৪২) ইত্যাদি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার 'মানিওয়াবুসি' নামে লোক-সাহিত্য রচনার দিকেও জাপানি সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করে। জাপানি নাট্যকারদের মধ্যে কাওয়াতাকে মোফয়ামি, কুকুচি ওচি, তুবাউচি শোয়ো, ওকামতো কিডো, য়্যামামতো ইউজো, কুরাতা মমজো প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হয় যে, জাপানি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তার কাব্য-সম্পদ। ওসানো হিরোসি, কুজো তাকেকো, মাসাওকা তাকাহামা কিয়োসি, মুরাকামি কিজো, য়োনে নগুচি, ওনো বুসি, কিতাহারা হাকুস প্রমুখ বিশিষ্ট কবির কাব্যসাধনা তখনও অক্ষুণ্ন ছিল। মৌলিক রচনা ও বিবিধ অনুশীলনের পাশাপাশি ফরাসি, জার্মান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সাহিত্যের একচেটিয়া অনুবাদ হতে থাকে। আমেরিকার সেরা কাটতি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানি ভাষায় তার অনুবাদ হয়ে যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের MxZvÄjx ও কবির আরো কয়েকটি গ্রন্থ জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন সুবুরো মাসিনো। শিশুসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আইওয়া সাজানমি।

যুদ্ধোত্তর জাপানি সাহিত্য

হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপের যে সাহিতার্চ্চা চলে তাকে যুদ্ধোত্তর জাপানি সাহিত্য বলা চলে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট দুপুর বেলায় জাপান সম্রাট এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। সম্রাটের এই ঘোষণা জাপানের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছেছিল। ২রা সেপ্টেম্বর 'মিসৌরি' নামক এক জাহাজে আমেরিকার সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থারের সামনে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। ফলে এক ভয়াবহ, রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধের অবসান হয়।

এই যুদ্ধের অবসানের ফলে জাপানের জনগণ যেন প্রাণ ফিরে পায়। যুদ্ধের শুরু, জাপানি সমরনায়কদের চণ্ডনীতি, সমগ্র দেশের বিধ্বস্ত অবস্থা, সমাজ-জীবনের দৈন্য ও হতাশা ইত্যাদির জাপানি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই অধ্যায়টিকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করলেন সকুনোসুকি ওদা, ওসামু দাজাই তাঁদের শানিত, বিদ্রূপ, প্রহসন আর আত্ম-সমালোচনামূলক রচনার মাধ্যমে। কিন্তু তাঁদের রচনা সমকালীন সমাজকে আদৌ প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। কেননা তার আগে বুদ্ধিজীবীদের জীবনে ঘটে নানা পরিবর্তন।

আকস্মিকভাবে সকুনোসুকির ওদা-র মৃত্যু ঘটে। অনদিকে আত্মহত্যা করেন ওসামু দাজাই। জাপানি পাঠকরা এঁদের ব্যঙ্গ রচনা নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করলেও—পাঠকসমাজ তখনও একেবারে তাদের রুচি কৌলিন্য হারায়নি। এর প্রমাণ হলো জুনিচিরো তানিজাকি-র ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন রুচির রচনা mvRwg-DwK (তূষার কণা) যখন ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়, তখন বিপুল সাড়া পড়ে পাঠকদের মধ্যে । এই গ্রন্থ বাজারে দ্রুত বিক্রয় হতে থাকে। জুনিচিরো তানিজাকি-র এই গ্রন্থ বিভিন্ন দিক থেকে অনবদ্য। উল্লেখ্য, এগারো শতকের বিখ্যাত রোমান্স কাহিনি †MwÄ অনুকরণে এই উপন্যাস রচিত হয়। এটি লেখা হয়েছিল কোবে ও ওসাকা এলাকার এক ধন্যাঢ্য পরিবারের চারজন নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে। সমাজের উপর তলার মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি নিচের তলার মানুষের জীবনধারার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। মধ্যযুগীয় রাজদরবারের রোমান্সের পটভূমিতে রচিত তানিজাকি-র mvRwg-DwK-তে কোথাও জাপানি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য ও রসবোধের অভাব হয়নি। তানিজাকি-র mvRwg-DwK যখন ১৯৪২ সালে সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই এই রচনা কর্তৃপক্ষের রোষে পড়ে। ফলে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসটি সমাপ্ত হয় যুদ্ধের পরে। আলোচকদের মতে mvRwg-DwK সমকালীন জাপানি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা—যার আকর্ষণীয় চাহিদা রয়েছে।

এই সময়কার কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম করা যায়, যাঁরা তদানীন্তন সরকারের রোষের সম্মুখে নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেননি। তানাজাকির ন্যায় বৃদ্ধ কাফু নাগাই (১৮৭৯-.?) যিনি জাপানি সাহিত্যের ‘এমিল জোলা’ হিসেবে পরিচিত, আর হাকুচো মাসামুনিও এই সময়ের শক্তিশালী লেখক যাঁরা শাসকবর্গের রোষানলে পড়লেও নিজেদের লেখনী বন্ধ করেননি। তাঁদের রচনা সে সময় প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও নিজেদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার শিখা অনির্বাণ রেখেছেন বহুদিন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানের পর তাদের বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হলো, এবং তা পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলো। এঁদের রচনায় সমসাময়িক জাপানের সমাজ ব্যবস্থা ও মধ্যযুগে জাপানি মেয়েদের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

একজন প্রথিতযশা জাপানি কবি

ইওনে নোগুচি (১৮৭৫-১৯৪৭) : জাপানের প্রথিতযশা কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি টোকিওর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বীরতত্ত্বের প্রণেতা, প্রাবন্ধিক ও

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক স্কটল্যান্ডের টমাস কারলাইল এবং হার্বাট স্পেনসারের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি মুক্তি ও জনগণের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় পড়াশুনা করে ইওনে নোগুচি ১৯০০-১৯০৪ সালের মধ্যে তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম *The American Diary of a Japanese Girl* ও *The American Letters of a Japanese Maid*প্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি ইংল্যান্ডে যান। এসময় তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ *From the Eastern Seas* প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, তখন তিনি ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা সাহিত্যিক উইলিয়াম মাইকেল রোসেট্টি, লরেন্স বিনিয়ন, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, টমাস হার্ডি ও লরেন্স হাউজম্যান প্রমুখের সঙ্গে সাহিত্যিক হিসেবে যোগাযোগ করেন।

১৯০৪ সালে রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে ইওনে নগুচি জাপানিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি আমেরিকাবাসীদের ‘হাইকু’ অনুশীলনের উপদেশ দেন। নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু ও রাসবিহারী বসুর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মতাদর্শের কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নোগুচির সম্পর্ক তিক্ত হয়। ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ রচিত ‘আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ’’ শীর্ষক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও জাপানি কবি ইওনে নোগুচির সম্পর্কের আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তাদের মধ্যকার আদর্শগত দ্বন্দও দৃশ্যমান হয় তাদের পত্রালাপের মাধ্যমে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন বিশ্বমানবতার পক্ষ হয়ে, আর নোগুচির বক্তব্য ছিল স্বদেশ প্রেমে আপ্লুত। নোগুচি তার মতাদর্শ ও এর যৌক্তিকতার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র দিলে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে জানান চীনের প্রতি জাপানের নিষ্ঠুর আচরণ এবং আগ্রাসননীতিকে কোনো যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। নোগুচিকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ‘‘আপনি এমন এক এশিয়া কল্পনা করিতেছেন যাহা নরমুন্ডের অট্টালিকার উপর স্থাপিত হবে (বিশ্বজিৎ, ২০১২: ৪১-৪৬)।

১৯১০ সালে অনুবাদ সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত ছন্দ-সরস্বতী কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত কবি নোগুচির বিন্দু কবিতা অনুবাদ করেন।

নববর্ষে কবি ইওনে নোগুচি দেখেছেন নতুন মাধুরী ও নতুন উল্লাস যা প্রাচীন ধরার জীবনে সমবেত যেন শুভক্ষণ, নব উৎসবে মাতোয়ারা নরনারী। তিনি বলছেন যে সূর্যের দিকে মুখোমুখি হয়ে একযোগে দাঁড়িয়ে সকলে প্রতিজ্ঞা করবে যে—

অন্যায় আজি হাস্যের তোড়ে

*Dhaka University Institutional Repository*

করিব বিসর্জ্জন,

তাজা এ হাওয়ায় শিস্ দিয়ে শুধু

ফিরিব অনুক্ষণ।

এবার মোদের যাত্রার পথে

হসি আর আলো সাথী;

জয় জয় জয় নুতন সূর্য্য!

জয় সূর্য্যের ভাতি

(কালীচরণ, ১৩৪২ : ৬৭৫-৭৬)।

এরপর কবি ইওনে নোগুচি শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য পরীর শরণাপন্ন হন। শিশুরা পরীকে জিজ্ঞেস করলো : 'হে অপ্সরী, আমাদের নিজের তাল কি? পরী বললো : ভয় নাই তোমাদের, না ভাবনা। শূন্যে বুনিয়া চলিয়াছ স্বপ্নজাল, হাওয়ার মতো অব্যাহত তোমরা, হাওয়ার তালেই নৃত্য কর নগ্ন পদে টাটকা রোদে পারুল গাছ হাসে সেখানে।'

তখন আকাশের শিশুরা বলে উঠলো—

সুর শিখেছি তাল শিখেছি

এখন মোরা করবো কি?

আলোর ধারা পড়ছে ঝরে

মুঠায় কণ্ঠরে ধরব কি?

শুনে মৃদু হেসে পরী বললো:

লক্ষ্মী মেয়ে! লক্ষ্মী ছেলে!

ঘুমাও এখন মার কোলে;

Dhaka University Institutional Repository

হাওয়ায় খোকা! হাওয়ায় খুকী!

দুলছে তারার হিন্দোলে!

'বাসন্তিকায়' পরীকে সম্বোধন করে কবি গাইলেন—

বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!

দুখানি তোর রঙীন পাখা

দুলিয়ে দে!

হাস্নুহানার গন্ধেতে ভোর

প্রাণের পরে স্বপ্নেরি ঘোর

বুলিয়ে রে।

উঁকি দিয়ে লুকিয়ে ফেরা,

এই খেলা কি খেলার সেরা?

মর্ত্তে আয়।

ধরতে তোরে হারিয়ে ফেলি,

চোখের জলে চক্ষু মেলি,

হায়রে হায়!

তখন সিদ্ধান্ত হোল যে পরীকে ছেড়ে দেয়া হবে না, যেন-তেন-প্রকারে ধরে রাখতেই হবে।

এবার ফাগুন ফিরলে পড়ে-

ছারব নারে—রাখব ধরে;

ভাবছি তাই।

Dhaka University Institutional Repository

হায় গরবী! হায় সোহাগী!

আমরা যে তোর পরশ মাগি

ধরতে চাই।

গোলাপ সে ভাষা বলিতে এখন গিয়েছে ভুলি

সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মুগ্ধখানি তুলি-

‘প্রিয় মোর! প্রিয়তম’!

সচেত গোলাপ সম;

পুরুষ বিভোল তাহারে কেবল কহিল ‘প্রিয়া’!

সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোন সাগর দিয়া।

তারপর মখ্‌মল্ জোছনা যেমন ধরায় নামে, চুপি চুপি নারী তার প্রতিধ্বনি করে, পুরুষ উত্তর দেয়। কবি অনুভব করেন যে সে শব্দ এখনও গিরিবক্ষে লুক্কায়িত।

এভাবে কবি ইয়নে নোগুচি মানব, প্রকৃতি ও প্রেমের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন নিজের ব্যক্তিগত কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কবি ইয়নে নোগুচি এই কাজ করতে গিয়ে সবসময় মানবতাকে অগ্রণী ভূমিকা প্রদান করেছেন। কবি মানব, প্রকৃতি ও প্রেমের মধ্যে যোগ স্থাপন করতে অবাস্তব পরীকে আহ্বান করেছেন সঙ্গতকারণে। এভাবে জাপানের প্রখ্যাত কবি ইয়নে নোগুচি তাঁর কাব্যজাল প্রসারিত করেছেন নিজস্ব মনোজগতের বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে।

তথ্যনির্দেশ


আনোয়ারহোসেন (১৯৪১), AvawbK Rvcvb, জেনারেলপ্রিন্টার্সএন্ডপাবলিশার্সলিমিটেড, কলিকাতা

কালীচরণ (১৩৪২), ‘জাপানীকবিনোগুচি’, wewPÎv, অগ্রহায়ণ

দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬), wekmsMv‡giMwZ, বেঙ্গলপাবলিশার্স, কলিকাতা

জগদ্ধাত্রীকুমারবন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৭), ‘জাপানেরকথা-শিল্পীওকথা-সাহিত্য’, wewPÎv, মাঘ

নিখিল সেন (১৯৬০), Gwkqvi mvwnZ¨, কলিকাতা


*Dhaka University Institutional Repository*

ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৩৪৫), ‘জাপানীকবিতা’, cwiPq, ভাদ্র

বিশ্বজিৎ ঘোষ(২০১২), AvšÍRwZK d¨wmev` we‡ivax Av‡›`vjb I ie›`bv_, গদ্যপদ্য, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৬), Rvcvb-hvÎx, কলিকাতা: বিশ্বভারতী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩১৫), ‘জাপানিকবিতা’, mwnZ¨, ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈয়্যষ্ঠ

সুরেন্দ্রনাথমৈত্র (১৩৪২), ‘জাপানী-পঞ্চাশিকা’, wewPÎv, অগ্রহায়ণ

সুরেন্দ্রনাথমৈত্র (১৩৪২), ‘জাপানীকবিতায়জোনাকী’, fviZel,পৌষ

Ishii Kikujiro (1936), *Diplomat Commentaries*, Johns Hopkins Press, Tokyo.

Murasaki Shikibu (Translated by Kencho Suematsu) (2000), *The Tale of Genji*, Tokyo : Tuttle Publishing; Isako Hirose (Translated by Susan Tyler) (1989), *An Introduction to The Tale of Genji*, Tokyo: University of Tokyo Press.

*Dhaka University Institutional Repository*

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# জাপানের সংস্কৃতি

জাপানের সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে বিবর্তিত হয়ে সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল বিশেষত 'জুমন' সময় থেকে প্রারম্ভিক পর্যায় শুরু হয় এবং ক্রমে পত্র-পল্লবে কুসুমিত হয়ে নব পর্যায় ও কলেবর লাভ করে। জাপানের সংস্কৃতিতে কোরিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুগভীর প্রভাব রয়েছে। সকলের জানা যে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চারটি বড় দ্বীপ ও বহু ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত জাপান সুদীর্ঘকাল একপ্রকার অবরুদ্ধ ছিল।

বর্তমান অধ্যায়ে জাপানের সংস্কৃতির যে সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো : ভাষা, লিপি, সংবাদপত্র, গান-বাজনা, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ফুল-সজ্জা বা ইকেবানা, চারুলিপি, চিত্রশিল্প, ধর্ম, ফুল-বাগিচা, প্রদর্শনযোগ্য শিল্প-নৈপুণ্য, ঐতিহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-দ্রব্য, খেলাধুলা ও চিত্ত-বিনোদন, গেইসা, সুমো, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, চা-উৎসব, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, থিয়েটার ও নাটক, ঘুড়ি উড়ানো, জাতীয় চরিত্র ইত্যাদি।

ভাষা ও উপভাষা : জাপানের সরকারি ভাষা জাপানি। বাংলা ভাষার যেমন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ; তেমনি জাপানি ভাষায় হিরাগানা ও কাতাকানা। এই দুই বর্ণমালার সাহায্যে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা অনেকাংশে অসম্ভব বিবেচনা করে পরবর্তীকালে চীনের বর্ণমালা 'কাঞ্জি' গ্রহণ করে। কাঞ্জি চৈনিক বর্ণমালা হলেও এর অর্থ জাপানি এবং এর মাধ্যমে জাপানি ভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করা যায়। বাংলা ভাষার মতো জাপানেও উপভাষা রয়েছে। ধন্যবাদ জানানোর জন্য জাপানিরা বলে 'আরিগাতো গোজাইমাস্'। এটি জাপানের সর্বত্র প্রচলিত। তবে স্থানীয়ভাবে বহু ওসাকাবাসী ধন্যবাদ জানানোর জন্য বলে 'ওকিনি' (যদুনাথ, ১৩১৩: ২৫৩)।

জাপানের সংবাদপত্র

যাদুকর পি.সি. সরকার জাপান ভ্রমণ করে তৎকালীন জাপানের বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, জাপানি ভাষায় সংবাদপত্রকে বলা হয় 'সিনবুন'। আঠারো শতকে 'ওসাকা ক্যাসেল'-এর পতন দিয়ে জাপানে জাপানি ভাষায় প্রথম যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

তার নাম কাওয়ারাভানেভার। আঠারো শতকের শুরুতে জাপানি ভাষায় যে সংবাদপত্র হয় তার নাম ছিল উওমিউরি—যার অর্থ হলো 'পড়া ও বিক্রি' করা। উওমিউরি মাটি দিয়ে ব্লক তৈরি করে ইশতেহার আকারে প্রকাশের পর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিক্রয় করা হতো। জাপানে প্রথম আধুনিক সংবাদপত্রের নাম ছিল নাগাসাকি শিপিং লিস্ট ও এ্যাডভারটাইজার। এটি ছিল পাক্ষিক পত্রিকা এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন একজন বৃটিশ নাগরিক এ. ডব্লিউ. হানসার্ড। এটি প্রথম প্রকাশিত ১৮৬১ সালের ২২শে জুন। এ বছরেরই নভেম্বর মাসে এ. ডব্লিউ. হানসার্ড এই সংবাদপত্র ইয়োকোহামায় স্থানান্তর করেন এবং ১৮৬২ সালে নতুন নাম দেন জাপান হেরাল্ড। তোকোগাওয়া সগুনের সময় নতুন করে কামপান বাটাবিয়া সিনবুন প্রকাশিত হয় এবং এর একটি সংস্করণ ওলন্দাজদের ভাষায় অনুবাদ করে ওলন্দাজদের সরকারি সংবাদপত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এ দুই পত্রিকা বিদেশিদের জন্য প্রকাশিত হতো এবং এগুলোতে কেবল বিদেশি সংবাদ পরিবেশিত হতো। জাপানি ভাষার প্রথম দৈনিক জাপানি পত্রিকার নাম ইয়োকোহামা মাইনিচি সিনবুন। এটি ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এতে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশিত হতো। এই সময়ের সংবাদপত্রসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেমন 'ওসিবুন' অর্থাৎ বড় আকারের সংবাদপত্র এবং 'কোসিবুন' বা ছোট আকারের সংবাদপত্র। জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল 'ওসিবুন'—কেননা এই সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোত জড়িত ছিল। সংবাদপত্রসমূহ জনগণের জনপ্রিয় অধিকার ও 'ডায়েট' (জাপানের পার্লামেন্ট) প্রতিষ্ঠার দাবি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। 'ডায়েট' প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পরপর ইয়োকোহামা মাইনিচি সিনবুন ও চুগাই সিনবুন এই দুই পত্রিকা জাপানের রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হয়ে যায়। এসব পত্রিকার প্রথমদিকের অধিকাংশ পাঠক ছিলেন 'সামুরাই' শ্রেণির। অন্যদিকে কোসিবুন বা ছোট আকারের সংবাদপত্রের পাঠক ছিল সাধারণ নাগরিক। এসকল সংবাদপত্রে স্থানীয় সংবাদ, চমৎকার গল্প ও চিত্ত-বিনোদনের বিষয় প্রকাশিত হতো। কোসিবুন বা ছোট আকারের সংবাদপত্রের উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় টোকিয়ো নিচিনিচি সিনবুন-এর মধ্যে—যা এখন মাইনিচি সিনবুন নামে পরিচিত। ইওমিরি সিনবুন ও আসাহি সিনবুন যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮০-এর দশকে জাপানি সরকারের চাপে ওসিবুন অর্থাৎ বড় আকারের সংবাদপত্র ক্রমশ কমে যায় এবং কোসিবুন বা ছোট আকারের সংবাদপত্র রাজকীয় আনুকূল্য পায় (পি.সি. সরকার, ১৩৪৫: ১৮৯)।

জাপানি বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু ১৯১০-এর দশক থেকে ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত অর্থাৎ 'তাইশো গণতন্ত্রের' শাসনামলে সরকার আসাহি সিনবুন পত্রিকার স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করে, কেননা আসাহি সিনবুন পত্রিকার ছিল সরকারের কার্যক্রমের সমালোচক ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির সমর্থক। জাপানে ত্রিশ ও

Dhaka University Institutional Repository

চল্লিশের দশকে সামরিকতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। ফলে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার কাছে জাপান পরাজিত হলে যৌক্তিক কারণেই পত্রিকায় গণতন্ত্র ও কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারণা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ১৯৫১ সালে আমেরিকার দখলদার সরকার পত্রিকার স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকার করে নেয় এবং জাপানে পরিবর্তিত শাসনতন্ত্রের ২১ ধারায় তা যুক্ত হয়।

জাপানের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম যাত্রা শুরু করে ১৮৭৯ সালের ২৫শে জানুয়ারি। আসাহী শব্দের অর্থ 'প্রাতঃসূর্য' এবং এই বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন মুরায়ামা। আসাহী প্রথম দিকে খুব সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল না। এসময় আসাহীর প্রকাশনা ৭/৮ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুরায়ামা ১৮৮৮ সালে টোকিওর দৈনিক মোজামাসি পত্রিকা কিনে এটির নতুন নাম করেন টোকিও আসাহী। টোকিও শহরে তখন আসাহীর আরো ১৮টি প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ছিল। মুরায়ামা তাঁর দুরদর্শিত, সুপরিচালনা এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধির মাধ্যমে সকল প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দিন দিন অগ্রগতির পথে ধাবিত হন। আসাহীর গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়, ছোট গল্প, দৈনন্দিন ঘটনাবলি এই পত্রিকায় স্থান পেত। জাপান তথা সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতির উন্নতি সাধন ছিল এই পত্রিকা পরিচালকের মুখ্য উদ্দেশ্য (পি.সি. সরকার, ১৩৪৫: ১৯০)।

১৮৯০ সালে রোটারি প্রেসে ওসাকা আসাহী মুদ্রণের কাজ শুরু হয়। এ সময় অন্য কোনো পত্রিকা রোটারি প্রেস ব্যবহার করতে শুরু করেনি। এ পত্রিকা ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের টাটকা খবর প্রচার করে প্রকৃত জনসেবার কাজ করেছিল। জাতি-গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি কতটুকু, জনসাধারণ তখন আসাহী পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। ওসাকা মাইনিচি তখন আসাহী'র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মুরায়ামা তখন আসাহী'র মান আরও উন্নত হওয়ায় ওসাকা মাইনিচি কাবু হয়ে পড়লো।

১৯০৫ সালে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে আসাহী পত্রিকা তখন আবার জনসেবার জলন্ত আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরে। পত্রিকার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সংবাদ সংগ্রহ, প্রবন্ধের সমাবেশ ও তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে আসাহী পত্রিকা তখন জাপানের উৎকৃষ্ট দৈনিক পত্রিকা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রের খবর পরিবেশন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওসাকা আসাহীর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের বেশি। ওসাকা ও টোকিও শহর থেকে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও বিকেলে প্রকাশিত হতো। পরে টোকিও ও ওসাকা থেকে সকালে আটটি ও বিকেলে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে তখনকার প্রতিদ্বন্দ্বী মোজি পত্রিকার সকালে ও বিকেলে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। দৈনিক পত্রিকা ব্যতীত আসাহী

*Dhaka University Institutional Repository*

কোম্পানির আরো বহু পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন, আসাহি সাপ্তাহিক পত্রিকা, আসাহি গ্রাফ, আসাহি খেলাধুলা, আসাহি ছায়াছবি, মহিলা ও শিশুদের আসাহি, মাসিক আসাহি, আসাহি বর্ষপঞ্জি, আসাহি খেলাধুলা পঞ্জিকা, আসাহি অর্থনৈনিক পঞ্জিকা, ছবিতে জাপান, আসাহি কারুশিল্প ইত্যাদি।

আসাহি পত্রিকা সম্পর্কে আধুনিক জাপান গ্রন্থের প্রণেতা আনোয়ার হোসেন বলেন,

> 'আসাহির' জীবনের মূলমন্ত্র সততা, দ্রুত সংবাদ সরবরাহ, ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নীতি। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'আসাহি' আজ জাপানের অলিগলি এবং পৃথিবীর অন্যান্য নানাস্থানে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আসাহির' অংশীদারগণ সকলেই এই পত্রিকার কোনো না কোনো বিভাগে কাজ করে; বাহিরের লোক কেহই অংশীদার নাই। এই দিক দিয়া 'আসাহি' পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। জাপানে অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য যেরূপ কোনো এক বংশের—যেমন মিৎসুই, মিৎসুবিশি, ইয়াসুদা ইত্যাদির একচেটিয়া দখলে; এই 'আসাহি' সংবাদ-পত্রও ঠিক সেই রূপ একই বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'আসাহির' সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোক উহার অংশীদার, সংবাদদাতা, পরিচালক-সমিতি, চাকুরিয়া—যেন সকলে একই বংশ বা পরিবারভুক্ত' (আনোয়ার হোসেন, ১৯৪১: ৪৫)।

ওসাকার ও টোকিওর দূরত্ব ৫৭০ কিলোমিটার। মাটির নিচে সুরঙ্গ পথে দু'টো আসাহী অফিসের মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা রয়েছে। আসাহীর সকল অফিসে টেলিফটো যন্ত্র রয়েছে—যার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে ফটো আদান প্রদান করা হয়। এছাড়া 'আসাহী' কোম্পানির ১৮টি এ্যারোপ্লেন আছে—এগুলোর মাধ্যমে অফিসের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয়। কোনো কোনো এারোপ্লেনে বেতার যন্ত্র আছে। জাপানের আরো কয়েকটি সংবাদপত্রের অফিসে এ্যারোপ্লেন থাকলেও বেতার যন্ত্র নেই। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে জাপানে সংবাদ আদান ও প্রদানের জন্য পারাবত বা কবুতরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

জাপানে সংবাদপত্র প্রকার ও প্রচার করাই আসাহীর একমাত্র কাজ নয়। ১৯২৯ সাল থেকে প্রতি বছর আসাহী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও অন্যন্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার ও অর্থ প্রদান করে আসছে। আসাহী-র উদ্যোগে বছরের  সভা, কনসার্ট, শিক্ষা বিষয়ক ফিল্ম প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। আসাহীর নিজস্ব অডিটোরিয়াম রয়েছে। ১৯২৫ সালে আসাহী কর্তৃপক্ষ নারী ও শিশুদের মঙ্গলের জন্য দুটি সমিতি গঠন করে। এসব সমিতির যাবতীয় অর্থব্যয় আসাহী কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে। শিশু রক্ষা, শিশু-সেবা, ভ্রাম্যমাণ শিশু নার্সারি পরিচালনা, যুবকদের শিল্প-

*Dhaka University Institutional Repository*

শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয়ে বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করাই আসাহী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

সংবাদপত্রবাহী কবুতর

১৯৩৮ সালে বাঙালি যাদুকর পি. সি. সরকার (১৯১৩-১৯৭১) যাদু প্রদর্শনের জন্য জাপানে যান। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংবাদপত্রবাহী কবুতর দেখেছিলেন। ঘটনাটি লক্ষ্য করে তিনি আশ্চর্য হন। ceËK সাময়িকপত্রে এ সম্পর্কে তিনি লেখেন—

> বর্ত্তমানে এই সংবাদপত্রবাহী কবুতরের প্রচলন জাপানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি জাপানে ছিলাম, তখন টোকিওর একটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র (*Tokyo Asahi Shimbun*) অফিসের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব ৩৫০টি শিক্ষিত পারাবত দেখিয়া আসিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে জাপানে মোট ৮০,০০০ আশী হাজার শিক্ষিত পারাবত আছে এবং ২০,০০০ বিশ হাজার সৈন্য বিভাগে ও বাকী ৬০,০০০ ষাট হাজার সংবাদপত্রওয়ালা, মৎস্য-শিকারী, সাধারণ পুলিশ, গ্রাম্য ডাক্তার প্রভৃতির বাড়ীতে আছে (পি. সি. সরকার, ১৩৪৫ : ১৯১)।

জাপানের মাছ-শিকারীরা তাঁদের জলযানযোগে সমুদ্রপথে অনেক মাইল পর্যন্ত মাছের খোঁজে বের হয়। যখন তাঁরা অনেক মাছের সন্ধান পায়, তখন কবুতরের মাধ্যমে নিজেদের দলের অবশিষ্ট লোকদের কাছে সংবাদ পাঠায়।

পি. সি. সরকার লিখেছেন যে, জাপানের মাছ-শিকারীরা জলযানে শতাধিক মাইল সমুদ্র পরিভ্রমণের পর তাঁদের জলযান দৈবক্রমে অচল হয়ে পড়লে বেতার ব্যবস্থার সুযোগ না থাকায় এই পারাবতেরাই এই দুঃসংবাদ তীরে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের এনে দেয়। এভাবে মাছ-শিকারীদের প্রাণ রক্ষা হয়। সিজুওকা অঞ্চলের মাছ-শিকারীরা তাঁদের বিমানের সঙ্গে এক ঝাঁক পারাবত নিয়ে যায়। পথিমধ্যে বহুসংখ্যক মাছের সন্ধান পেলে বিমানে প্রত্যাবর্তন না করে সংবাদপত্রবাহী পায়রা ছেড়ে দিয়ে বিমান যোগেই অন্যত্র মাছের সন্ধান করতে থাকে। সংবাদপত্রবাহী কবুতর মাছ-শিকারীদের বন্ধুদের নিকট প্রেরিত সংবাদ সরবরাহ করে, ফলে তারা প্রচুর মাছ-শিকারে সমর্থ হন।

জাপানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে টেলিফোন, চিকিৎসক বা চিকিৎসালয়ের কোনো সুবিধা নেই, সেখানে গ্রাম্য ডাক্তাররা সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল পারাবত ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পি. সি. সরকার বার্তাবাহী কবুতরদের সম্পর্কে কিছু বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৯২৮ সালের ২৮শে মে হাচিজো দ্বীপ থেকে কয়েকটি বার্তাবাহী কবুতর ছাড়া হয়। এই কবুতরেরা ২৯০ কিলোমিটার পথ ৩৯০ মিনিট অর্থাৎ ৬.৩০ মিনিটে অতিক্রম করে। ১৯৩৪ সালে টোকিও শহরে সেনাবাহিনীর বিরাট কুচ্‌কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। তখন ১০ থেকে ১৮ই মার্চের মধ্যে জাপানের বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিস থেকে ১২৯০টি বার্তাবাহী কবুতর ছাড়া হয়। এই বার্তাবাহী কবুতর দল ১,১১১টি ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ' ও ২৮টি সংবাদ বহন করে আনে। এসব কবুতরের মধ্যে শতকরা ৯০টি ঠিকমতো কাজ করেছিল। বাকি কবুতর ফিরে আসতে সক্ষম হয়নি।

ডাক্তাররা রোগীদের গৃহে গৃহে যান। তাঁরা রোগীদের চিকিৎসাপত্র লিখে কবুতরের ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দেন। সেসময় টোকিও শহরের নিকটবর্তী ফুসু শহরের জেলখানার সঙ্গে টোকিও শহরের বিচার-প্রতিনিধির বার্তাবাহী কবুতরের সাহায্যে 'টিপ' ও স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হতো।

অবশ্য তখন অনেক কবুতর পরিশ্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল অথবা শ্যেন পাখির কবলে পড়েছিল বলে ফিরে আসতে পারে নি। শ্যেন পাখি কবুতরের পরম শত্রু। পরিশ্রান্ত হয়েছিল বলে কবুতর শ্যেন পাখির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি। জাপানের সংবাদপত্র অফিসে বার্তাবাহী কবুতর যে কাজ করে দেয় তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিকেলে খেলাধুলার সংবাদ প্রকাশ করার সময় যে সংবাদপত্র এক মিনিটি পূর্বে প্রকাশ করবে যে সংবাদপত্রই বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে বিক্রি হয়। একবার এ্যারোপ্লেন, রেলগাড়ি, মোটর ও বার্তাবাহী কবুতরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। বার্তাবাহী কবুতর এ্যারোপ্লেনকে ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। পি. সি. সরকার লিখেছেন—

> একবার জাপানের সম্রাট্ ট্রেণযোগে ওশাকা অঞ্চলে পরিভ্রমণে বাহির হন। তখন সিজুওকাতে ট্রেণ পৌঁছিলে প্লাটফরমে সম্রাটের ছবি তোলা হয় এবং কবুতরের মারফৎ উহা টোকিওতে প্রেরিত হয়। টোকিওর কর্তৃপক্ষ সেইটী টেলিফটো সাহায্যে 'ওশাকা আসাহী' নামক ওশাকার সংবাদপত্র অফিসে প্রেরণ করেন। সম্রাট্ কিছিক্ষণ পর রেলযোগে ওশাকা পৌঁছিয়া দেখেন ওখানকার 'নিচি নিচি' সংবাদপত্রে তাঁহার চিত্রসহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে (পি. সি. সরকার, ১৩৪৫ : ১৯৩)।

আগে সংবাদ সম্বলিত কাগজ গুটিয়ে কবুতরের গায়ে বেঁধে দেয়া হতো। কিন্তু ১৯৩৮ সালে এই পদ্বতি আরো অনেক উন্নত হয়। অত্যন্ত হাল্কা একটা লম্বা খাপের ভিতরে সংবাদ ও নেগেটিভ ভর্তি করে কবুতরের পিঠের পাখায় বেঁধে দেয়া হয়। এভাবে কবুতরেরা সংবাদ ও নেগেটিভ অতি দ্রুত ও অনায়াসে বহন করতে পারে। জানা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এই বার্তাবাহী কবুতরের অধিক ব্যবহার হয়েছিল। কবুতরের ব্যবহার সর্বপ্রথম ভারত ও ১২৫০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

বার্তাবাহী কবুতরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তখন মিনামোতো-নো-ওরিতোমো 'হোজো মাসাকো'র নিকট বার্তা পাঠান। তারপর ১৮৩০ সালে ওসাকার ডোজিমা চালের বাজারের সংবাদ প্রতিদিন রাখার জন্য কবুতর ব্যবহার করতো (পি. সি. সরকার, ১৩৪৫ : ১৯৩)।

টোকিও আসাহি সিনবুন সংবাদপত্রটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সেখানে বার্তাবাহী কবুতরের ব্যবহারও হয় বেশি। কবুতরকে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োগ করা হয়। মাট্‌সুডা তারু কবুতর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর মতে মাত্র আট (৮) মাস বয়সেই কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বার্তাবাহী কবুতর হিসেবে কাজে নিয়োগ করা যায়। এক একটি বার্তাবাহী কবুতর কুড়ি (২০) বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে, তবে কবুতরকে কোনোভাবেই আট (৮) বছরের বেশি কাজ করানো উচিত নয়। ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিলে কবুতর দিনে ও রাতে উভয় সময়ই কাজ করতে পারে। জাপানের সাধারণ জনগণের মধ্যে এরকম ধারণা রয়েছে যে বার্তাবাহী কবুতর জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং তাদের মধ্যে একটিকে ছেড়ে দিলে জোড়ার অন্যটিকে কোনো বাসায় আবদ্ধ রাখতে হয়। তা না হলে ঐ কবুতর আর ফিরে আসে না। কিন্তু কবুতর বিশেষজ্ঞ মাট্‌সুডা তারু একথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করেন না। তিনি বহুবার জোড়ায় জোড়ায় বার্তাবাহী কবুতর ছেড়েছেন এবং তারা আবার জোড়ায় জোড়ায় ফিরে এসেছে।

ফুল-সজ্জা বা 'ইকেবানা' : জাপান ললিতকলার লীলা-নিকেতন। দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারও সেখানে শ্রীসম্পদে সমুজ্জ্বল। সুতরাং জাপানে ফুলের সমাদর কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। তবে এই অর্থে বিচিত্র যে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছোট বা বড় ফুলের বাগান বিদ্যমান। জাপানের অধিকাংশ স্থানই পাহাড়িয়া অঞ্চল। সেখানে সামান্য অবকাশ থাকলেই ফুলের চাষ করা হয়। এমন উন্মুক্ত স্থান খুবই বিরল যেখানে ফুলের চাষ নেই। জাপানে ফুল ও ডাল-পাতার স্তবক-রচনা একটি বিশেষ আর্ট বা চারুকলা। এই আর্টের জাপানি নাম ইকেবানা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচিত 'ইকেবানা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ইকেবানা-র প্রবর্তক জাপানের রাজকুমার শোতোকু তাইশি (৫৭১-৬২১)। জাপানে তিনি অবতার হিসেবে বিবেচিত। জাপানে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম প্রচারে রাজকুমার শোতোকু তাইশি প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। আধুনিককালে মেয়েদের মধ্যেই ইকেবানার চর্চা চলে। জাপানের সকল উচ্চ-বালিকা বিদ্যালয়ে এই সুকুমার বিদ্যার শিক্ষা দেয়া হতো। ইকেবানা ছিল রাজ-পরিবারের এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের জন্য একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শহরে বা গ্রামে কোথাও এই বিদ্যার শিক্ষক বা ছাত্রীর অভাব ছিল না।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীনকালে কিন্তু কেবল মহিলাদের মধ্যে এই সুকুমার ও কলাবিদ্যার অভ্যাস ও আদর সীমিত ছিল না। দার্শনিক, সাহিত্যিক, ধর্মযাজক ও মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে এই বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল অনেক বেশি। সে সময় জাপানে ফুলের চাষ খুব বেশি ছিল না, সুগন্ধি ফুল ছিল খুবই বিরল। ফলে সেখানে ফুলের অভাবনীয় আদর ছিল। জাপানের বহু গৃহে পুষ্পপত্রের বিচিত্র পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে রমণীয়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়উল্লেখ করেছেন যে, ইকেবানা বা পুষ্প-পরিকল্পনা মূলত ত্রিভূজের আকার ধারণ করে। এই তিনটি ভূজকে যথাক্রমে ‘তেন’ বা স্বর্গ, ‘চি’ বা পৃথিবী এবং ‘জিন্’ বা মানব হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এই মূল তিনটি ভূজের সঙ্গে যথাক্রমে দুই চার, বা ছয়টি সহ-ভূজ যোগ করা যেতে পারে। ভূজের মোট সংখ্যা সবসময়েই অবিভাজ্য থাকে, যথা—পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই ভূজগুলোর নানাপ্রকার নামকরণ হতো, যেমন—বদান্যতা, বিশ্বস্ততা, জ্ঞান, সত্যবাদিতা ও সৌজন্য। অনেক সময় আবার সূর্য, তন্দ্র, তারা ইত্যাদি নামকরণ করা হতো। কখনও বা রংয়ের নাম দিয়ে যেমন নীল, হরিদ্রা, লাল প্রভৃতি নামকরণ করা হতো।  অনেকে এই পুষ্প-পরিকল্পনার পাঁচটি ভূহকে যথাক্রমে হৃদয়, সাহায্য, অতিথী, কৌশল ও সমাপ্তি আখ্যা দেন। এই বিদ্যা যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা ধর্মভাব, সংযম, নম্রতা এবং মানসিক শান্তির অধিকারী হন।

ফুলের মধ্যে অগ্রগণ্য স্থান হলো পদ্মের, তবে সাধারণভাবে তা ব্যবহার হয় না। ফুল সাজানোর এই পরিকল্পনায় ফুলের সঙ্গে থাকে তিনটি পাতা। এই পাতাগুলোর মধ্যে একটি অর্ধশুস্ক, একটি সতেজ ও একটি কুণ্ঠিত বিকশোন্মুখ। এভাবে অতীত, বর্তমান ও অনাগতকে সুকৌশলে রূপদান করা হয়। জাপানের ও পাশ্চাত্য দেশের পুষ্প-রচনার প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের মতো জাপানে কেবল ফুল দিয়েই পুষ্পপত্র রচনা করা হয় না। ডালপালা ও ফুল সমস্ত দিয়ে অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ফুল গাছের কাঠামোটি ফুটিয়ে তোলা হয়।

ঐ বিশেষ বৃক্ষের স্বাভাবিক গঠন অনুযায়ী। বিষয়টি যে কি পরিমাণ সুক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ শক্তি সাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। ছোটর মধ্যে বড় আকৃতি প্রকাশ করা অতি সুন্দর পরিপাটির বিষয়। যে-আধারে ইকেবানা রাখা হয় সেগুলি খুবই চমৎকার—সাধারণত বাঁশ ও কাঠের তৈরি এবং তার উপর নানা মনোরম চিত্র উৎকীর্ণ থাকে (সুরেশচন্দ্র, ১৩২৭ : ৬০১-৬০৩)।

ধর্ম

ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে হতে তৎকালীন জাপানের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিভিন্ন অনুশাসন ও মতবাদের তথ্য পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে cevmxôতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ধ্যানী জাপান’,

Dhaka University Institutional Repository

gvbmx'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'জাপানের ধর্ম' এবং cevmx©তে প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী রচিত প্রবন্ধ সমূহ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ জাপানি মনে করে যে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিন্তো ধর্মের বা 'শিন্‌বাৎসু-সুগোর' সাযুজ্য বিদ্যমান। এই সাযুজ্য প্রার্থনা বা 'কামি', পূর্বপুরুষের পূজার সঙ্গে সংযুক্ত। অবশ্য সাধারণ জাপানিদের মনে এ বিষয়ে তেমন কোনো অনুরাগ নেই। ধর্ম বা 'সুকিও' বলতে জাপানিরা তাঁদের সংস্কৃতির এক সাংগঠনিক রূপ বোঝায়, যেখানে নির্দিষ্ট নীতির প্রতি তাঁদের একান্ত বিশ্বাস থাকে এবং তাঁরা এর সদস্য হয়ে যায়। জাপানে যারা 'নাস্তিক' বা 'মুসুকিও', তাঁরা কোনো ধর্মে বিশ্বাস না করলেও শিন্তো আচার-আচরণ ও পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারে (মন্মথনাথ, ১৩১৯: ১৩৫)।

ঈসোমে জুনিচি ও জ্যাসন আনন্দ যোসেফ্‌সন এই দুই গবেষক মনে করেন যে, জাপানের ঐতিহ্যের ধর্ম বা 'সুকিও'-র কোনো প্রয়োজন নেই। জাপানের ধর্ম বা 'সুকিও' আঠারো শতকে উদ্ভাবিত হয়। শিন্তো বা 'কামি-নো-মিচি' জাপান ও জাপানিদের দেশিয় ধর্ম। শিন্তো ধর্মকে আবার কার্যকেন্দ্র ধর্ম বলা হয়—যা আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত। শিন্তো আচরণ বিধি 'কোজিকি' ও 'নিহন সোকি' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় আঠারো শতকে। কিন্তু প্রাচীন রচনায় শিন্তোকে একটি ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, বরং জাপানিদের দেশিয় বিশ্বাস ও কিংবদন্তির সংগ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (মন্মথনাথ, ১৩১৯: ১৩৬)।

শিন্তো আখ্যাটি প্রয়োগ করা হতো জনগণের ধর্ম মন্দিরের প্রতি, যেখানে বহুবিধ দল বহুবিধ দেব-দেবীর বা 'কামি'-র পূজা করা হতো যুদ্ধে বিজয় ও ও সুন্দর ফসল উৎপাদনের প্রত্যাশায়। 'নারা' ও 'হেইয়ান' যুগে শিন্তোরা তাদের উন্নত ভাষা, বহুবিধ বিশ্বাস অভিন্ন পোষাক ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করতো।

শিন্তো বা ঈশ্বরের পথ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'সিন্ডো' শব্দ থেকে যার চৈনিক প্রতিশব্দ 'সেন্ডো'—যা ছয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাওয়া যায়। 'কামি' শব্দের অর্থ ঐশ্বরিক—যা পৃথিবীর দৃশ্যগোচর বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। 'কামি' ও 'জাপানী' পৃথক নয় বরং তারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিন্তো ধর্মে জাপানিরা বেশি অনুরাগী। জাপানে ১ লক্ষ শিন্তো মন্দির ও প্রায় আশি হাজার পুরোহিত রয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম : ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি বা ৫৩৮ বা ৫৫২ বছরে কোরিয়ার রাজধানী 'বায়েকজি' থেকে বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে আসে। 'বায়েকজি'-র রাজা জাপানের সম্রাটের কাছে বুদ্ধদেবের একটি প্রতিকৃতি ও কিছু সূত্র প্রেরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবোধচন্দ্র বাগ্চীর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে,সংক্ষিপ্ত হলেও জাপানের রক্ষণশীলদের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া বশে এনে ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জাপানের সর্বোচ্চ আদালতে বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হয়। এ সময় কোরিয়া থেকে প্রচুর অভিবাসী জাপানে আসে এবং এক্ষেত্রে চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাবও অনেকটা ছিল—যা ‘সুই’ বংশের অধীনে জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র-ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। জাপানের অভিজাতরা হেইয়ানদের সময় জাপানের রাজধানী নারায় বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে (প্রবোধচন্দ্র, ১৩৩৪: ৮২)।

১২ শতকে যখন সগুন ক্ষমতাশালী হয় তখন প্রশাসনিক রাজধানী কামাকুরায় স্থানান্তরিত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম নতুন আঙ্গিকে চলে আসে। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল ‘জেন’। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ‘জেন’-এর কয়েকটি মতবাদ যেমন—‘রিনযাই’, ‘সোটো’ এবং ‘ওবাকু’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় জাপান সাম্রাজ্যের রাজকীয় ক্ষমতা তখন শিন্তোকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই সময় শিন্তো ও বৌদ্ধ ধর্মের পারস্পরিক প্রভাব বিষয়ক আইন পাশ হয়।

কামাকুরা পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অমিতাভ বুদ্ধের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এই শব্দধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করে যে, ‘নমু অমিদা বাৎসু’ অর্থাৎ মৃত্যুর পর অমিতাভ বৌদ্ধদের নির্বাণ লাভে সাহায্য করবে। জাপানের পবিত্র বৌদ্ধ পুরোহিতরা ভূমি ব্যবসায়ী ও কৃষক শ্রেণিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। জাপানের প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত হোনেন মারা গেলে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—যেমন একদলের নাম ‘জুদোসু’ যারা ‘নমু অমিদা বাৎসু’ বারবার প্রার্থনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদলের নাম যারা ‘নমু অমিদা বাৎসু’ একবার প্রার্থনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাঁদের মতে এতেই হৃদয় পবিত্র হয়।

জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের আর একটি শাখার নাম ‘নিচিরেন বৌদ্ধবাদ’—যা ১৩ শতকে নিচিরেন বৌদ্ধ সন্যাসী প্রতিষ্ঠা করে। বৌদ্ধ সন্যাসী নিচিরেন ‘পদ্ম সুত্রের’ উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ‘নিচিরেন বৌদ্ধবাদ’ আরো কয়েকটি শাখায় বিভক্ত—যেমন ‘নিচিরেন সু’, ‘নিচিরেন সুশি’ ইত্যাদি। জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে (প্রবোধচন্দ্র, ১৩৩৪: ৮১-৮৮)।

খৃষ্টান ধর্ম : জাপানে খৃষ্টান ধর্ম ‘ক্রিসুটোকিও নামে পরিচিত। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনারিরা জাপানে ক্যাথোলিক বা ফ্রান্সিস জেভিয়ার, কসমে ডি টোরেস ও জুয়ান ফার্নান্ডেজ কাগোসিমায় আগমন করেন। পর্তুগিজ বণিকেরা ১৫৪৩ সাল থেকে জাপানে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের ‘দাইমিওগণ অভিনন্দিত করেছিল, কেননা তাঁরা গোলা-বারুদ সরবরাহ করতেন। আনজিরো নামে খৃষ্টান ধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মান্তরিত এক ব্যক্তি মিশনারিদের জাপানি সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন এবং জাপানিদের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করেন। এই খৃষ্টান মিশনারিরা জাপানের কিউসুর কৃষক, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যোদ্ধা দলের একাংশকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'খ্রীষ্ট ধর্ম যেভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছিলো ভারতীয় কিছু প্রচারক যদি জাপানে এসে ধর্ম প্রচার করতেন তাহলে অচিরেই বহু জাপানিকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা যেতো (মন্মথনাথ, ১৯১০: ১৭১)

১৫৫৯ সালে জাপানের রাজধানী কিয়োটোতে একটি খৃষ্টান মিশন পাঠানো হয়। এরপর কিয়োটোতে নয়টি চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬০-র দশক থেকে জাপানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৫৬৯ সালে জাপানে খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার এবং চার্চের সংখ্যা হয়ে যায় ৪০টি। কিউসুতেই ব্যাপক হারে খৃষ্টানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৫৭০-এর দশকে জাপানে খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ।

ষোল শতকের শেষের দিকে ফরাসি মিশনারিরা কিয়োটো পৌঁছেন। এ সময় কিয়োটোর শক্তিশালী সমর নায়ক টয়োটোমি হিদেওসি খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৫৯৭ সালে টয়োটোমি হিদেওসি খৃষ্টানদের উপর আরো কঠিন অনুশাসন জারি করে নাগাসাকিতে ২৬ জন ফরাসি খৃষ্টান মিশনারিকে হত্যা করেন। টোকোগাওয়া শাসনের সময়, বিশেষভাবে সিমাবারা বিদ্রোহের সময়, খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার বজায় রাখে। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতেও কিছু খৃষ্টান গোপনে খৃষ্ট ধর্ম পালন করে। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ১৮৭৩ সালে খৃষ্টানদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল শুরু হয় এবং সকলের স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

হিন্দু ধর্ম : এই গবেষণার আলোচ্য সময়ে জাপানে হিন্দু ধর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তবে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে মিশে জাপানে হিন্দু ধর্মের কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন 'বেনজাইতেন' বা সরস্বতী, 'বিসামন' বা কুবের, মহাকাল বা শিব ও লক্ষী প্রমুখ।

কনফুসিয়াসবাদ : চীনের কনফুসিয়াসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) চিন্তাধারা জাপানে আসে 'এডো' শাসনামলে। জাপানের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার গভীর প্রসার ঘটে—যার প্রভাব জাপানি সভ্যতায় লক্ষ করা যায়। মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ দিয়ে মানুষ বিশ্ব সৃষ্টির যে কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে পারে, বিশ্বের সঙ্গে মানুষের আনন্দঘন যে সম্পর্ক তাই কনফুসিয়াসবাদ। 'এডো' শাসনামলে কনফুসিয়াসবাদ সামাজিক স্তর-বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। নব্য-কনফুসিয়াসবাদ—যা 'কোকুগাকু' নামে পরিচিত, তা এক প্রকার নৈতিক দর্শন। প্রকৃতপক্ষে 'শিন্তো'

Dhaka University Institutional Repository

জাপানিদের দেশিয় ধর্ম—যার মাধ্যমে পূজা, অর্চনা ও প্রার্থনা সম্পন্ন হয়। 'বৌদ্ধ' ধর্ম জাপানিদের অধ্যাত্মবাদে উৎসাহিত করে এবং কনফুসিয়াসবাদ জাপানিদের নৈতিক দর্শন।

ধর্ম ও আইন : জাপানের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে শাসক শ্রেণির বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল এবং এ সকল অনুষ্ঠান 'শিন্তো' ধর্ম সমর্থিত ছিল। টোকোগাওয়া শাসনামলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান অনেকাংশে রাজনীতির আওতায় চলে আসে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে সরকার মনে করতো যে প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব মন্দির থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বিশ শতকে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার দেয়া হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ছুটি

অধিকাংশ জাপানি বিভিন্ন ঐতিহ্যিক ধর্মীয় আচার-আচরণ ও প্রথা মেনে চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার মতো জাপানেও জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুর জন্য পৃথক পৃথক ধর্মীয় আচার-আচরণ ও প্রথা রয়েছে। কোনো শিশুর জন্ম হলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুটিকে মন্দিরে নিয়ে তার উপর দেবতার আশীর্বাদ কামনা করা হয়। শিশুটিকে তার জন্মের প্রথম মাস, তৃতীয় মাস, পঞ্চম মাস ও সপ্তম মাসে মন্দিরে নেয়ার প্রথা বিদ্যমান। সরকারিভাবে কুড়ি বছর হলেই যে কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠান শিন্তো পুরোহিতের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই গবেষণার আলোচ্য সময়ে বিয়ের জন্য পাশ্চাত্য রীতি ও প্রথার প্রচলন ছিল না। অন্যদিকে অন্ত্যষ্টিক্রিয়া বৌদ্ধ মতে সম্পন্ন হয়। বৌদ্ধ মতে মৃত্যু-দিবসও পালিত হয়। জাপানে দু'ধরনের ছুটি দেয়া হয়। শিন্তো ধর্মের অনুশাসন মেনে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা, ধান নিয়ে এক প্রকার নবান্ন-অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া স্থানীয়ভাবে মন্দির প্রাঙ্গণে বার্ষিক ভোজ হয়। এ সকল আচার ও অনুষ্ঠান হেইয়ান যুগ থেকে চলে আসছে এবং কোনো কোনো সময় স্থানীয়ভাবে ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোনো সময় স্থানীয় বিদ্যালয় বার্ষিক ভোজের ব্যবস্থাকরে। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে জাপান ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ও সভ্যতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং পূর্ব-পুরুষের শ্মশান পরিস্কার করা ব্যতীত আর কোনো ধর্মীয় ছুটি দেয়া হয় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মতে, আলোচ্য সময়ে জাপানের অধিকাংশ পুরুষ ও প্রায় সকল স্ত্রীলোক তাদের দেশিয় পোষাক পরিচ্ছদ পরতে পছন্দ করতো। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পোষাক 'কিমোনো'। সুতো বা রেশমের লম্বা জামা, প্যাগোদা ফ্যাশানের আস্তিন এবং এর রং খুব উজ্জ্বল নয়। জাপানিরা লাল, ধুসর ও শ্যামল রং পছন্দ করে। জাপানি পোষাকের রং পোষাক পরার কৌশল সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> কেবল নর্ত্তকী ও শিশুদের পরিচ্ছদের রং এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল। শীতকালে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, এইরূপ অনেকগুলি কিমোনো একটার উপর আর একটা চাপাইতে পারে। এই লম্বা জামার জেব্ আস্তিনের ভিতর থাকে। পুরুষেরা এই লম্বা জামার উপরে সরু একটা ক্রেপের কটিবন্ধ এবং স্ত্রীলোকেরা একটা চওড়া রেশমের কোমরবন্ধ ব্যবহার করে,—স্ত্রীলোকের এই কোমরবন্ধের সঙ্গে পিঠের দিকে একটা ছোট চৌকা বালিসের মত জিনিষ থাকে। স্ত্রীলোকদের কিমোনোগুলা খুব দামী; কিন্তু তাহাদের আকার বরাবর একই রকমের চলিয়া আসিতেছে; এই আকার বৎসরে বৎসরে বদ্‌লানো তাহারা আবশ্যক মনে করে না। তাহাদের নিকট এই আকারটী অতীব রমণীয়। এই পরিচ্ছদগুলি অনেক দিন টিকিয়া থাকে; অনেক সময় এই কোমরবন্ধগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে মা হইতে মেয়েতে বর্ত্তায়। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩১৫ : ৮৪)

স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ে কিমোনোর নিচে সাধারণত সূতা বা রেশমের কামিজ এবং এই কামিজের নিচে মল্‌মল্ কাপড়ের একপ্রকার চওড়া কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। রাজপুরুষ বা ধন্যাঢ্য ব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ সকলে কিমোনোর ওপরে অনেক সময় আরো একটা আচ্ছাদন বস্ত্র পরে—যাকে ‘হাওরি’ বলা হয়। রাজপুরুষ বা ধন্যাঢ্য ব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ সকলে তাঁদের তিন স্থানে পরিচ্ছদধারীর আভিজাত্যসূচক চিহ্ন আঁকা থাকে।

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর Rvcvb cevm গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জাপানিরা পোষাক হিসেবে ‘কিমোনো’ ব্যবহার করতে অভ্যস্থ ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে নারী-পুরুষের কিমোনো একই রকম দেখালেও প্রকৃতপক্ষে তা তৈরির ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ‘গেতা’ বা কাঠ দিয়ে তৈরি জুতার ব্যবহার জাপানিদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মধ্যে অন্যতম (মন্মথনাথ, ১৯১০: ১০৩)।

বিশ শতকের পূর্বে জাপানের পুরুষেরা এক প্রকার খোঁপা পরতো, খোলা মাথায় চলতো, মাথার ওপর ছাতা থাকতো বা মাথার ওপর মস্ত বড় খরের একটা টুপি পরতো। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানি পুরুষেরা খুব ছোট করে চুল ছাঁটে ও ইউরোপীয় ধরনের কিনারা-ওয়ালা টুপি পরে। স্ত্রীলোকেরা ছাতা মাথায় দিয়ে নগ্ন মস্তকে চলাফেরা করে, কেবল শীতকালে তাঁরা এক প্রকার কিনারাহীন টুপি পরে। জাপানি নারী খুব যত্ন করে খোঁপা বাঁধে। তাঁদের খোঁপা যেমন সুন্দর তেমন জটিল। খোঁপাটি কাঁটা, সোনা, রূপা, কড়ি গালা, ঝিনুকের চিরুনি দ্বারা বিভূষিত। স্ত্রীলোকদের বয়স ও সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের খোঁপার একটু রকম-ফের হয়ে থাকে। জাপানি নারীর খোঁপা বাঁধ্‌তে অন্তত এক বা দু’ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই অধিকাংশ নারী সপ্তাহে শুধু তিনদিন খোঁপা বাঁধে। সকালে ঘর পরিস্কার করার সময় ধুলার ভয়ে খোঁপা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখে।

*Dhaka University Institutional Repository*

পুরুষ ও নারী চামড়ার তৈরি এক প্রকার জুতো পরে—যাকে 'টাবি' বলা হয়। এই জুতো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রায় পৌঁছে না, এই জুতোর দুটি খোপ আছে, একটি খোপ বুড়ো আঙ্গুলের জন্য ও অন্য খোপটি অন্যান্য আঙুলের জন্য। তাঁরা বাড়ি থেকে বেড়ানোর সময় খড়ের বা কাঠের খড়ম পড়ে এবং এই খড়মের আকারে খুব একটা বিশেষত্ব বিদ্যমান।

স্ত্রীলোকের খোঁপার কাঁটা ও চিঁরুনি যদি বাদ দেয়া যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে জাপানি পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কোনো প্রকার অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে না; তারা না পরে কান-বালা, না পরে কণ্ঠমালা, না পরে ব্রোচ, না পরে বলয়, না পরে আংটি। ইউরোপীয় ও অন্য জাতি থেকে এই বিষয়ে জাপানিরা আলাদা।

জাপানি শিশুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সেখানের বয়স্ক লোকের পরিচ্ছদের খুদ্র নমুনা। কেবল কচি শিশুর পরিচ্ছদের রং বেশি উজ্জ্বল। মায়েদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী শিশুদের চুলের ছাঁট ও ভঙ্গি নানা প্রকারের হতে পারে। হারিয়ে যাবার ভয়ে শিশুদের গায়ে অনেক সময় পরিচয় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

খনক, কুলিমজুর, পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ির পরিচালক—এদের পরিচ্ছদ একটু বিশেষ ধরনের। একটা ফতুয়া ও একটা পা-জামা। যে বাড়ির চাকর সেই বাড়ির নাম ফতুয়ার পিঠে বড় চীনে অক্ষরে লেখা থাকে। মাঠ ময়দানে, কৃষকেরা স্ত্রী ও পুরুষ ইভয়েই প্রায় একই প্রকার পাজামা ব্যবহার করে; গোল খড়ের টোকা মাথায় পরে; যখন বৃষ্টি হয়, তখন একটা বিপুল খড়ের চাদরে দেহ আচ্ছাদন করে।

জাপানের জনগণ নিজদের পোষাক-পরিচ্ছদই ব্যবহার করতে পছন্দ করে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> রাজবাড়ীর মহিলা ছাড়া, জাপানের আর সমস্ত রমণীই দেশিয় পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছে; অধিকাংশ জাপানি পুরুষেরাও দেশিয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; কেবল সুবিধা মনে করিয়া য়ূরোপীয় টুপিটা গ্রহণ করিয়াছে। যেখানে বিদেশি দূতদিগের নিত্য যাতায়াত, সেই রাজ দরবারে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই য়ূরোপীয় পোষাক পরিতে বাধ্য; বোধ হয় জাপানের মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য উত্তপদস্থ ব্যক্তিরা ভাবে যে, যদি তাহারা আমাদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদের সহিত সমকক্ষভাবে ব্যবহার করিব। দেশিয় পরিচ্ছদ কি কিমোনো পরিলে যাদের একন সুন্দর দেখায় সেই জাপানি রমণীরা কর্সেট ও অন্যান্য জটিল য়ূরোপীয় পরিচ্ছদ বিশ্রী করিয়া পরিধান করে। আবার জাপানি রাজকর্ম্মচারীরাও আমাদের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে,—কেননা, তাহাদের আফিসে তাহারা টেবিল, চৌকি প্রভৃতি য়ূরোপীয় আস্‌বাব ব্যবহার করে এবং এই সকল বিলাতী আস্‌বাবের সহিত বিলাতী পোষাক

*Dhaka University Institutional Repository*

মানায় ভাল। কিন্তু যখন তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায়, তখন আবার প্রায়ই জাপানি পরিচ্ছদ পরিধান করে। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩১৫ : ৮৫)।

প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের প্রথম দশকেই অধিকাংশ জাপানি ইউরোপীয় পোষাকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশিয় পোষাক- দেশিয় পোষাক-পরিচ্ছদের সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এই পোষাক জাপানি জীবনের সকল খুঁটিনাটির সঙ্গে বিশেষ উপযোগী। যেমন জাপানিদের হাঁটু গেড়ে বসার অভ্যাস; তাই তারা মনে করে নিজস্ব পোষাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধা ও বেশি মানানসই ও বেশি সুন্দর। তাঁদের এই বিপুল ও সুরম্য পোষাকে মানবদেহ যে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয় অন্য কোনো পোষাক-পরিচ্ছদে তা হয় না।

জাপানি সভ্যতায় 'কিমোনো'-র ধারণা চীনের 'হান্' বংশের পোষাক থেকে আসে। বর্তমানে চীনা শব্দ 'হান্‌ফু' যা জাপানি শব্দ 'কান্‌ফুকো' কিমোনোর প্রাচীন নাম। ৫ম শতকে জাপানের রাষ্ট্রদূত চীন থেকে জাপানের সংস্কৃতির বেশকিছু উপাদান নিয়ে আসেন। ৮ম দশকে চীনের পোষাকের নমুনা, বিশেষত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য হয়। জাপানের পোষাক সমষ্টিগতভাবে 'ওয়াফুকো' নামে পরিচিত। কিমোনো বিভিন্ন রং, ধরণ ও আকারের হয়। পুরুষেরা প্রধানত কালো অথবা অধিকতর ধূসর রংয়ের কিমোনো; অন্যদিকে যুবতী মেয়েরা উজ্জ্বল এবং রঙিন কিমোনো পছন্দ করে। জাপানি বিবাহিত যুবতীর কিমোনোকে বলা হয় 'তোমেসোদে' যা অবিবাহিত যুবতীর কিমোনো (ফুরিসোদে) থেকে পৃথক। 'তোমেসোদে' পৃথক, কেননা এর ধরন কটিদেশের উপরে থাকে না, কিন্তু 'ফুরিসোদে' অনেকটাই লম্বা এবং বুটিকা-সম্পন্ন। অধিকাংশ অবিবাহিত যুবতীর কিমোনো 'ফুরিসোদে' এবং 'ফুরিসোদে' পরার অর্থ হলো যুবতী অবিবাহিত (মন্মথনাথ, ১৯১০: ৮৭)।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিমোনোর ধরনের পরিবর্তন হয়। যেমন—বসন্তের সময় উজ্জ্বল ও রোমাঞ্চকর রং এবং তার উপর বসন্তকালের ফুলের সূচি-শিল্প আঁকা হয়। কিন্তু শরতে কিমোনোর রং এতো উজ্জ্বল হয় না। শীতকালে পশমি কিমোনোর প্রচলন খুব বেশি, তা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে শরীর গরম থাকে। জাপানের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে রুচিশীল কিমোনো 'উচিকাকে' নামে পরিচিত। এই কিমোনো রেশম দিয়ে তৈরি এবং এটি বিয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। উচিকাকে কিমোনোতে সাধারণত সোনা বা রূপার সূতো দিয়ে পাখি বা ফুল আঁকা হয়। পাশ্চাত্যের মতো কিমোনোর নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মাপটি আনুমানিক ও এক বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে তা যথাযোগ্য করে তোলা হয় (মন্মথনাথ, ১৯১০: ৮৮)।

কিমোনোর মূল্যবান অংশকে 'ওবি' বলা হয়। 'ওবি' হলো শোভাবর্ধক—যা পুরুষ ও মহিলা উভয়েই পরতে পারে। বিভিন্ন ঐতিহ্যিক পোষাকের মতো ওবি পরা যায়। তবে সাধারণত কিমোনোর

*Dhaka University Institutional Repository*

সঙ্গে ওবি পরা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়িতেই কিমোনো পরা হয়, কখনো কখনো নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য কিমোনো পরা হয়। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘটনায় পুরুষ 'হাওরি' ও 'হাকামা' নামে এক ধরনের পোষাক পরতে পারে। হাকামাতে কিমোনোর উপর কব্জি পর্যন্ত আবৃত থাকে। পূর্বে হাকামা কেবল পুরুষেরা ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে মাহিলারাও হাকামা ব্যবহার করতে থাকে। গরমের দিনে কিমোনো একটি নতুন মাত্রা ও নাম পায় এবং তা হলো 'ইউকাতা'।গ্রীষ্মের উৎসবের সময় পুরুষেরা সকলেই 'ইউকাতা' পরে। কিমোনোর আকার, আকৃতি, অলংকরণ, ঋতুভেদে কিমোনোর রং পরিবর্তন কোনো ব্যক্তির সামাজিক পদমর্যাদা নির্ণয় করে। ক্রমে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ বিধায় পাশ্চাত্যের পোষাক কিমোনোর স্থান দখল করেছে। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিমোনো পরা অনেকটাই আনুষ্ঠানিকতা। নারীদের পক্ষে একা কিমোনো পরা খুবই কষ্টকর। সেজন্য বয়স্ক নারীরা কিমোনো পরতে শিখান। জাপানিদের 'হ্যাপি' নামে আর একটি জনপ্রিয় পোষাক রয়েছে। জাপানে জুতার নাম 'টাবি', কোনো কোনো সময় তা 'গেতা' নামেও পরিচিত। অনেক সময় ইউকাতার সঙ্গে গেতাও জাপানিরা পরে (মন্মথনাথ, ১৯১০: ৮৮)।

খাদ্যদ্রব্য

যে কোনো দেশের খাদ্য ও পানীয় পূর্বে নির্ধারিত হতো সে দেশের ভূমি ধরন, ভূমির প্রকারভেদ, উৎপাদন, নৈসর্গিক প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু ইত্যাদির ভিত্তিতে। কোনো ব্যক্তির খাদ্যের প্রতি নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, কিন্তু একটি দূর-প্রাচ্যের দুটি দেশ—চীন ও জাপান প্রায় সর্বভূক। তবে জাপানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ও স্বদেশের উৎপাদনের মধ্যেই খাদ্য সীমিত। জাপানে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু জাপানের নিজস্ব খাবারই অধিকাংশ জাপানি খেয়ে থাকে বা বলা চলে প্রায় সকল জাপানি তাদের নিজস্ব খাবারই পছন্দ করে। অনেক সময় রুচি পাল্টানোর জন্য তারা বিদেশি খাবার খায়। এই গবেষণায় আলোচিত সময়ে জাপানে বিদেশি খাবার এক প্রকার ছিল না বললেই চলে।

জাপানের খাদ্য অনেকাংশে আঞ্চলিক ও ঐতিহ্যিক—যা সুদীর্ঘ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাপানের ঐতিহ্যিক খাবার—যা 'ওয়াসোকিউ' নামে পরিচিত, তাহলো ভাত, মিশো স্যুপ ও অন্যান্য খাবার, অর্থাৎ মূল খাবারের সঙ্গে পরিবেশিত অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী। অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মাছ, সঞ্জী-আচার (সুকেমনো) ও সিদ্ধ সঞ্জী ইত্যাদি থাকে। জাপানিদের কাছে সামুদ্রিক বা সৈন্ধব খাদ্য বিশেষত মাছ অতি প্রিয়—যদিও তা কখনো পুড়িয়ে বা কাঁচাই খায়—যা 'সুসি' বা 'সাসিমি' নামে পরিচিত। অনেক সময় সামুদ্রিক বা সৈন্ধব খাদ্য সঞ্জীর সঙ্গে মিশিয়ে কিছুটা মাখন দিয়ে ভাজা হয়—যা 'টেম্পুরা' নামে পরিচিত। ভাত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতীত জাপানিরা 'নুডুলস' খায়—যা রান্নার ও বিষয়ের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে 'উদন' ও 'সোবা' নামে পরিচিত। চৈনিক খাদ্য 'রামেন'ও জাপানিদের দুপুরের প্রিয় খাবার (কিমুরা, ১৩২৯: ৫১)।

প্রাতঃরাশ : অধিকাংশ জাপানি গৃহে অবস্থান করলে প্রাতঃরাশ বাড়িতেই সম্পন্ন করে। প্রাতঃরাশকে জাপানি ভাষায় বলা হয় 'আসা গোহান'। প্রাতঃরাশে সামুদ্রিক মাছ, গরম ভাত, কাঁচা ডিম ও মিসো স্যুপ থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সময় সঞ্চী-আচার থাকে। সঞ্চী-আচার সাধারণত মূলা, আদা ইতাদির হয়ে থাকে। খাদ্য পরিবেশন বিষয়ক একটি শব্দ (Phrase) হলো 'ইচিজু-সানসাই', অর্থ তিনমুখো একটি বাটিতে স্যুপ পরিবেশন। কিন্তু এই বিশিষ্টার্থক শব্দটির মূল জাপানি খাদ্য-ভাষার মধ্যে নিহিত। যেমন 'কেইসেকি', 'হোনজেন' ও 'ইউসোকু'—যাকে 'কেইসেকি' খাবার বলা হয়।

জাপানি চালে শর্করা বা শ্বেতসার অধিক পরিমাণে থাকে এবং এজন্য জাপানিরা খুব কম ভাত খায়। ভাতগুলো পরস্পর যুক্ত থাকে এবং এজন্য 'কাঠি' (হাশি) দিয়ে ভাত ও অন্যান্য খাদ্য সহজেই খেতে পারে। খুব ছোট একটি বাটিতে (চোয়ান) ভাত দেয়া হয়, একটি ছোট প্লেটে (সারা) বা বাটিতে (হাচি) প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে অন্যান্য খাবার পরিবেশন করা হয়। জাপানের এই খাদ্যাভ্যাসের অধিকাংশই চীনের উচ্চাঙ্গ সভ্যতার অনুকরণ। কামাকুরা পর্বে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশীলনের সঙ্গে চীনের উচ্চাঙ্গ সভ্যতার অনুকরণ চা-এর অনুষ্ঠানের সূচনা হয় (কিমুরা, ১৩২৯: ৫৫)।

আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে খাবার পরিবেশনের পূর্বে রুমাল দেয়ার রীতি ছিল—যাকে 'জেন' বলা হয়। খাবার ভাঁজ করা যায় একটি ছোট টেবিলে—যা 'জাইসিকি' নামে পরিচিত। খাবার পছন্দ করার ক্ষেত্রে জাপানিরা মৌসুমী ফলমূল, মাছ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতো। মৌসুমী খাবারকে তারা 'সুন' হিসেবে অভিহিত করতো। জাপানের পাহাড়ে বসন্তকালে বহু প্রকার বাঁশ জন্মে, ফলে বাঁশের কোড় (Bamboo shoot) ও এক প্রকার বাদাম এবং সাগরের ফলমূল—যাকে 'উমি নো সাচি'—তা মৌসুমী খাবার হিসেবে জাপানিদের প্রিয়। সাগরের বড় মাছ—যা 'চুনা' বা 'টুনা' (হাট্‌সু গাট্‌সুও) নামে পরিচিত, সেই মাছের প্রথম চালানকে জাপানিরা স্বাগত জানায়। কেননা এই মাছ তাদের প্রধান সম্বল। আকারেও বড় এবং খেতেও ভালো (কিমুরা, ১৩২৯: ৫৫)।

দুধ ইত্যাদি পরিহার করা। তাঁদের খাদ্যের উপকরণের মধ্যে থাকে সয়াসস্‌, মিসো স্যুপ ও ওমেবোসি—যার মধ্যে থাকে অতিরিক্ত লবণ।

ইয়াকিনিকু : প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত বলে জাপান অন্যান্য সভ্যতা থেকে সমুদ্রের কারণে পৃথক। অন্যদিকে এই অবস্থা জাপানকে সমুদ্রের প্রচুর খাদ্যের ওপর নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

হতে বাধ্য করেছে। খাদ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে জাপানিদের প্রধান খাদ্য ভাত, সব্জি ও সমুদ্রশৈবাল এবং মাঝে মধ্যে হাঁস বা মুরগি। 'লাল মাংশ' অর্থাৎ গরু, ভেড়া ও খাসির মাংশ খুব কম পরিমাণে খাওয়া হতো। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী তথ্য পাওয়া গেছে। এডো অধ্যায়ে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের আগেই চার-পায়ের জীব-জন্তু (ইয়োৎসুয়াসি) খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। মঙ্গোলিয়ান  বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থকরা গোমাংশ খায়, কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থকরা গোমাংশ খায় না। জাপানিরাও পরবর্তীকালে মঙ্গোলিয়ানদের মতো গোমাংশ খেতে শুরু করে। তবে জাপানে তিমি ও কাছিমের মাংশের ওপর কখনই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। গবেষণার আলোচ্য সময়ে বনের পাখির মাংশ ও ডিম জাপানিরা খেতো। তবে নিরামিশ খাবারও জাপানিরা খেতো।

জাপানিদের খাবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে তাঁরা রান্নার জন্য বেশি তেল ব্যবহার করে না; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। কড়কড়ে করে 'টেম্পুরা', 'আবুরাজে' ও 'সাতসুমায়েজ' ইত্যাদি ভাজার জন্য বেশি তেল ব্যবহার করতে হতো (কিমুরা, ১৩২৯: ৫৫)।

'ইয়াকিনিকু' পাশ্চাত্যের 'বারবিকিউ'-এর মতো ঝলসানে। তবে এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত সময়ে জ্বালানি হিসেবে 'গ্যাস'-এর ব্যবহার ছিল না, তাই কাঠ-কয়লায় (সুমিবি) ইয়াকিনিকু তৈরি করা হতো। এই সময় রেস্টুরেন্ট থাকলেও কোনো কোনো সময় বাড়িতেই ইয়াকিনিকু প্রস্তুত করার নিয়ম ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইয়াকিনিকু পোড়া হতো, ভাজার পদ্বতি ছিল না। রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন প্রকার মাংসের সঙ্গে তরকারি দেয়া হতো। কোন উত্তাপে ইয়াকিনিকু প্রস্তুত করা সম্ভব হবে তা নির্ধারণে রেস্টুরেন্টের কর্মচারীরা সাহায্য করতো। সাধারণত বেশি উত্তাপেই ইয়াকিনিকু প্রস্তুত করা হতো। তবে কখনোও এক সঙ্গে অনেক মাংশ ইয়াকিনিকু করা উচিত নয়, কেননা খেতে বিলম্ব হলে পোড়া মাংশ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। মাংশ পোড়ার ক্ষেত্রে মাংশের উভয় দিকই পুড়তে হবে, তা না হলে খেতে ভালো লাগবে না। ইয়াকিনিকু প্রস্তুত করার সময় মাংশের ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই। অধিকাংশ ইয়াকিনিকু রেস্টুরেন্টে আগত ব্যক্তিদের মাংশের সঙ্গে বিভিন্ন সব্জি যেমন গাজর, মুলা, পেঁয়াজ, বেগুন, রসুন, অঙ্কুরিত শিম বা মটরশুঁটি দেয়া হতো।

যাহোক, ইয়াকিনিকু হলো আগুনে ঝলসানো মাংশ। অনুরূপ আরো কিছু জাপানি খাবার ছিল। যেমন—

সারণি: ৭

বাংলা অর্থসহ জাপানি খাদ্য তালিকা

| ক্রমিক সংখ্যা | জাপানি খাবোরে নাম | বাংলা অর্থ |
|---|---|---|
| ১ | ইয়াকিমনো | ঝলসানো ও ভাজা খাবার |

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| ২ | নিমনো | কোনো প্রকার রসের মধ্যে সিদ্ধ বা ফোটানো খাবার |
| ৩ | ইতামেমনো | তাড়াতাড়ি সিদ্ধ খাবার |
| ৪ | মুশিমনো | সিদ্ধ খাবার |
| ৫ | এগেমনো | ভালোভাবে ভাজা খাবার |
| ৬ | গাসিমি | কাঁচা মাছের টুকরা |
| ৭ | সুইমনো বা শিরুমনো | এক ধরনের স্যুপ |
| ৮ | সুকেমনো | লবণাক্ত আচার |
| ৯ | এইমনো | বিভিন্ন ‘সস্’ বা ‘আখনি’ দিয়ে তৈরি খাবার |
| ১০ | সুনোমনো | অমলরসাত্মক খাবার |
| ১১ | ছিন্‌মি | সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত খাবার |

সূত্রঃ আর. কিমুরা, ১৩২৯: ৫০-৫৬

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে দিন ও রাত সব মিলিয়ে সাধারণত তিনবার খাবারের নিয়ম ছিল এবং খাবারের তিনটি নাম ছিল, যেমন—

বাংলায় ভাষায় জাপানি ভাষায়

প্রাতঃরাশ = আসা গোহান

দুপুরের খাবার = হিরো গোহান

নৈশভোজ = বান গোহান

নাত্তো : নাত্তো হলো একমাত্র জাপানি খাদ্য, মানব সভ্যতার অন্য কোথাও এ ধরনের খাবার পাওয়া যায় কিনা—তা সন্দেহের বিষয়। সাধারণত ‘সয়াবিন’ দিয়ে নাত্তো তৈরি করা হয়। নাত্তো নিরামিশ খাদ্য। সকালে ভাতের সঙ্গে কাঁচা ডিম ও সয়াবিনের নাত্তো দেয়া হয়। জাপানিদের মতে নাত্তো খুবই উপকারী। কিন্তু অনেকেই আবার নাত্তো খেতে অপছন্দ  সয়াবিন ব্যতীত আরো কয়েক প্রকার নাত্তো তৈরি করা সম্ভব।

খেলাধুলা ও চিত্ত-বিনোদন : ২০ শতকের প্রথম দশকে জাপানের শিশুদের খেলাধুলার প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। সে সময় যুদ্ধবিদ্যা ছিল জাপানিদের মজ্জাগত। তাদের প্রিয় খেলার নাম ‘কেন্দ’। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী যদুনাথ সরকার লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> তাহারা (জাপানি ছেলেরা) দলে দলে সৈন্য সাজিয়া বাঁশী (bungle) বাজাইয়া জাতীয় সঙ্গীত ঘাহিতে ঘাহিতে জাতীয় নিশান উড়াইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। জাপানের অনেক জায়গায়ই খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে। কোনো পাহাড়ের নিকট গিয়া উহারা দুই দল হয়। একদল পাহাড়ের উপর যাইয়া কাগজ দিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করে। তৎপর দুই দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ফাঁকা বন্দুক এবং বাঁশের লাঠিই ইহাদের অস্ত্র। ক্রমে নিচের দল উপরের দলকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং দুর্গ দখল করিয়া লয়। মাঝে মাঝে দুর্গে আগুনও লাগাইয়া থাকে। অনেক সময় দুই-একজন বয়স্ক ব্যক্তিও ছেলেদের যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে উহাদের সঙ্গে যাইয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ খেলায় বিরত থাকিত বরং শাসন করা হয়। এখানকার ছোট ছোট ছেলেগুলিও বিস্তর কষ্টসহিষ্ণু (যদুনাথ, ১৩১৩ : ১০৬৩-৬৪)।

জাপানি ছেলেমেয়েদের খেলা ও খেলনার অন্ত নাই। প্রধান কিছু খেলা হলো :

১. ও-তেদামা : জাপানি শব্দ 'তেদামা'-এর অর্থ হলো লাল শিম-ভরা থলে।

    এক-একজন ছেলে ৭টা থেকে ২০টা করে শিম-ভরা থলে নিয়ে ক্রমাগত উপরে ছুড়তে থাকে এবং মাটিতে পড়ার আগেই তা লুফে নেয়। ক্রমাগত এভাবে থলেগুলো শূন্যে ওঠানামা করতে থাকলে একটা মালার আকার ধারণ করে। থলেগুলো শুকনো শিমে ভড়া থাকে বলে ঝমঝম করে বাজে। ছেলেমেয়েরা এ খেলায় কখনো ক্লান্ত বা বিরক্ত হয় না, বরং তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ খেলা খেলে।

২. ইশিকেরি : ইশিকেরির অর্থ হলো পাথরে লাফ দেয়া। রাস্তায় খড়ি দিয়ে লম্বা চতুষ্কোণ একটা ঘর কাটা হয় এবং সেই ঘরকে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হয়। পরে সেই ছোট ঘরগুলোতে পাথরের নুড়ি বা খোয়া রাখা হয়। ছেলেমেয়েরা এক পায়ে লাফাতে লাফাতে অন্য পা মাটিতে না নামিয়েই লাফাতে লাফাতে নুড়িগুলিকে ঘরগুলো থেকে বাইরে বের করে দেয়। এ কাজে সফল হলে তারা অপার আনন্দ পায়।

৩. ইকুদা-গোকে : এ খেলা এক প্রকার যুদ্ধ বিশেষ। জাপানি ছেলেমেয়েরা কাগজের তৈরি একই ধরনের পোষাক পড়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে আওয়াজ করতে থাকে।

৪. মিমিহিকি : 'মিমিহিকি' শব্দের অর্থ হলো কান টানাটানি। ছেলেমেয়েরা একটা লম্বা দড়ির দুটি মুখ বেঁধে মালার মতন করে হাতে নেয়। এরপর মালা হাতে নিয়ে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী

Dhaka University Institutional Repository

সামনাসামনি বসে এবং একে অন্যের কানে সেই মালা ছুড়ে আট্‌কাতে চেষ্টা করে। যে সফল হয়, সেই জয়লাভ করে।

৫. কামিফুকি : এই খেলায় ছেলেমেয়েরা এক-এক টুক্‌রা কাগজ জলে ভিজিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কপালে এঁটে দায় এবং 'ফু' দিয়ে সে কাগজ উড়াতে চেষ্টা করে। 'ফু' দেবার সময় তাদের যে মুখভঙ্গি ও মুখবিকৃতি হয় তাতে বালক-বালিকাদের প্রচুর আনন্দ হয়।

৬. কুবিহিকি : 'কুবিহিকি' শব্দের অর্থ হলো গলা টানাটানি। দুজন ছেলের গলায় গলায় বেঁধে দেয়া হয়। ছেলে দুটি একে অন্যকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে। যে গলা টেনে আনতে সক্ষম হয়—সে জয়লাভ করে।

৭. উদেগুনী : এ খেলায় দুজন জাপানি ছেলে মুখোমুখি বসে হাতে হাত ধরে প্রতিদ্বন্ধীর হাতকে চারদিকে ঘুরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। যে সফল হয় সেই জয়লাভ করে। এ খেলা বাংলার বহুল প্রচলিত অনেকটা পাঞ্জা-কষার মতো।

৮. মুবিসুমো : 'মুবিসুমো' শব্দের অর্থ হলো 'আঙ্‌গুলের লড়াই'। এ খেলায় দুজন জাপানি ছেলে মুখোমুখি বসে তাদের আঙ্‌গুলে আঙ্‌গুলে জোড় বাঁধে, কেবল বুড়ো আঙ্‌গুল দুটি খোলা থাকে। এখন যে কঞ্জির জোরে অন্যের হাতকে কাবু করতে পারে—সে খেলায় জয়লাভ করে।

৯. মিয়ামেক্কুর : এ খেলায় দুজন ছেলে বা মেয়ে মুখোমুখি বসে একে অন্যের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে। যে না হেসে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারে—সেই জেতে।

১০. জনিগোকে : প্রকৃতপক্ষে এ খেলা বাংলার 'চোর-চোর' খেলা। ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে একজন সর্বসম্মতিক্রমে 'চোর' হয়। এ খেলার নিয়ম হলো মনোনীত 'চোর'—যাকে স্পর্শ করতে পারবে সেই 'চোর' হবে। মনোনীত 'চোর' সাধুদের দলে ফিরে যাবে। এ খেলা অনেকক্ষণ চলে। খেলা দ্রুত শেষ করার জন্য মনোনীত 'চোর' অন্য 'চোরদের' সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর সকলের চেষ্টায় 'চোরদের' দল বড় হয়। অবশেষে 'ঠগ্ বাঁছতে গাঁ উজার'। যে ছেলে বা মেয়ে সকলের শেষে চোর হয় সে সকলের সেরা।

১১. কাক্‌রেন্ত : চোর চোর খেলার রূপান্তর লুকোচুরি খেলা। চোর চোখ বুঝিয়ে দাঁড়ায়, আর সকলে লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ কেউ টু শব্দ করলে চোরের কাজ তাকে খুঁজে বের করা।

Dhaka University Institutional Repository

১২. কাণামাছিও জাপানি ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা এবং তারা এ খেলা খুব খেলে। একজনের চোখ বেঁধে দেয়া হয় এবং সকলে এদিক ওদিক পালিয়ে থাকে। ধরতে গেলেই সরে যায়। তবে যাকে ধরে সে কাণামাছি হয়। এ খেলা অন্যভাবেও খেলা যায়। একটি গোল চক্র এঁকে সকলে গোল চক্রটির উপর বসে। এ সময় একজনে চোখ বেঁধে তার হাতে এক পেয়ালা 'ওচা' (জাপানি চা) দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় তারই পরিচিত কাউকে 'ওচা' পরিবেশন করতে বলা হয়। চোখ বাঁধা বালক ও বালিকারা এ কাজে সফল হলে—যাকে ধরেছিল সে কাণামাছি হয়। এ খেলাকে জাপানিরা 'ওচাবাল্লু' বলে।

১৩. 'মুকো-নো-ওবাসান' অর্থাৎ 'মাসি গো মামী'—এও একরকম চোর-চোর খেলা। ছেলেমেয়েদের একদল রাস্তার এপারে ও অপর দল রাস্তার ওপারে দাঁড়ায়। একদল ডাকে—

'মাসি গো মামী হেথায় আয়!'

অপর দল জবাব দেয়—

'বাছা গো বাছা ভুতের ভয়!'

তখন প্রথম দল—

'আপনি  না এসো ধরবে যে ভুত,

যাকে ছোঁবে তার লাগবে যে ছুঁত।'

বলে ছুটে অপর দলের উপর গিয়া পড়ে। যে প্রথম ধরা পড়ে সে ভুত হয়।

এ বাক্যের অর্থ হলো 'সবকটাকে ছেড়ে দিয়ে শেষের জনকে ধর'।

১৪. একদল জাপানি ছেলেমেয়ে সারবন্দি হয়ে একে অন্যের পেছনে যায় এবং কোমরের কাপড় চেপে ধরে দাঁড়ায়। দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ছেলেটি সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে ছোট ছেলেটি সবার পেছনে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সবচেয়ে লম্বা ছেলেটি সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে কাছে আনার চেষ্টা করে। অন্যদিকে সবচেয়ে ছোট ছেলেটির কাজ হলো সবচেয়ে লম্বা ছেলেটি থেকে দূরে থাকা।

১৫. ইমোমুশি-কোরোকোরো : 'ইমোমুশি-কোরোকোরো' শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো গুটিপোকার গুটিগুটি। ১৪ নম্বর খেলার মতো ছেলেরা সারবন্দি হয়ে একে অন্যের পেছনে যায় এবং

*Dhaka University Institutional Repository*

কোমরের কাপড় চেপে ধরে দাঁড়ায়। এরপর তারা ‘গুটিপোকার গুটিগুটি’ বলে চিৎকার করে ঘুরে বেড়ায়।

১৬. হিতোতোবি বা ছেলেধরা। বাংলার ‘কাবাডি’ বা ‘হাডুডুডু’ খেলার মতো। খেলোয়াররা দুভাগে বিভক্ত একটি কোর্টে দু’দলে বিভক্ত হয় এবং সামনাসামনি থেকে এক পক্ষ অপর পক্ষের লোককে নিজেদের কোর্টে বলপূর্বক আনার চেষ্টা করে। এতে যারা সফল হয়, তারা জয়ী হয়।

১৭. ‘কোবত্তেব-তোরে-কো-তোরে’ : এ একরকম চোর চোর খেলা। দলের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সে হয় ডাকাত। পুলিশ ডাকাতকে ধরার চেষ্টা করে, অন্যদিকে ডাকাত পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে গ্রেফ্‌তার এড়াতে চায়। এ খেলা ছেলেমেয়েদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক।

১৮. পুতুল খেলা জাপানের অতি প্রাচীন খেলা। জানা যায় যে খৃষ্টের জন্মের ৫০ বছর আগেও জাপানে পুতুল ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে এ পুতুল খেলার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৯. তাকেউমা : এ খেলায় একটা সরু বাঁশের লাঠির মাথায় রশি বেঁধে বাঁশটিকে বাঁকা করে তুলে ধরে। ছেলেরা বাঁশের দুদিকে পা রেখে ঘোড়া ঘোড়া খেলে। ‘তাকেউমা’ খেলা ৫০০ বছরের পুরানো। এ খেলা পরে কিছুটা বিবর্তিত হয়। ক্রমে লাঠির মাথায় ঘোড়ার কাঠের মুখ লাগানো হয় এবং আস্তে আস্তে পূর্ণাবয়ব ঘোড়ায় পরিণত করা হয়। পরে তিন চাকার গাড়িতে বা নাগরদোলায় না অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একজোড়া কাঠের পায়ার উপর জুড়িয়া চালানো না ঘোরানো বা দোলানো হয়ে থাকে।

২০. কোমা : লাটিম খেলা। এ খেলা কোরিয়া থেকে জাপানে প্রবর্তিত হয়। এটি অতি প্রাচীন খেলা।

২১. তোগোমা : এও একপ্রকার লাটিম। একটা বাঁশের চোঙার মধ্যে একটা কাঠের পুতিয়া ঘোরানো হয়। কাঠির স্তরে চোঙা ঘুরতে থাকলে বাতাস প্রবেশ করে বাঁশির মতো শব্দ হয়।

২২. শামুকের খোলের মধ্যে সীসা গলে ঢেলে দেয়া হয় এবং পরে সেই শামুকটাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।

২৩. তাতাকিগোমা : এই খেলা উপরে উল্লিখিত (২২ নম্বরে) খেলার মতোই। পার্থক্য এই যে খোলটা শামুকের নয়, কাঠের হয়।

২৪. জেনিগোমা : একটা পয়সার মধ্যখানে ছিদ্র করে সেখানে একটা গোঁজ পরানো হয়, পরে সেই গোঁজ ধরে আলোর উপর ঘোরায়।

২৫. তাকে-না-ঘুড়ি : বহু পুরানো ও বহু সমাদৃত খেলা। ঘুরি উড়ানো জাপানের একটা বিশেষ উৎসব।

Dhaka University Institutional Repository

২৬.হাগোইতা অর্থাৎ ডাণ্ডা-গুলি।

২৭.ইনুহারিকো : কাগজের কুকুর; আগে সুপ্রসব হবার তুকতাক-রূপে প্রসুতির আঁতুরঘরে রাখা হতো—অর্থাৎ কুকুর যেমন সহজে বাচ্ছা প্রসব করে তেমনি সহজে প্রসব হোক। এখন এই বিষয় ছেলেদের খেলনা হয়ে গেছে।

২৮.ঢোল ও বাঁশি।

২৯.ওকিয়াগারি কিবোলি : দারুলা নামে এক দেবতার কাগজের মূর্তি, এর নিচে ভার থাকে। পুতুল যেভাবেই খেলা হোক, সে সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে যায়। পুতুলেই এ কার্যকলাপ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হাসির সঞ্চার করে।

৩০.হাজিকিজারু : চোঙার বাঁদর। একটা লম্বা কাঠির মাথায় একটা বানরের মুর্তি বসানো থাকে। কাঠির নিচে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, সেই কাঠিটা একটা চোঙার মধ্যে ভরিয়া লম্বা দড়ির অংশ চোঙার বাইরে রাখা হয়; দড়ি ধরে টানলেই কাঠিটা উপরের দিকে ওঠে এবং পরে সুযোগ পেলেই চোঙার মধ্যে নেমে যায়। এভাবে বানরের খেলা চলতে থাকে। জাপানিরা পরে এই খেলা আরো উন্নত পর্যায়ে খেলে। একটা কাঠির নিচে একটা বানর থাকে, একটা স্প্রিং খুলে দিলেই বানরটা ধীরে ধীরে কাঠি বেয়ে গাছের উপর চলে যায়।

৩১.কাজাগুরুণ : কাগজ ও বাঁশের চেঁচাড়িতে তৈরি পবন-চক্র। এক একটা সুন্দর ও চিত্র শোভিত কারুকৌশলময় হয়।

৩২.কুস্তিগির পুতুল : পুতুলের নিচে খুব শক্ত আটা থাকে; পুতুলগুলিকে একটু উপর থেকে মাটিতে ফেল্‌লে তরাং তরাং করে কুস্তিগিরের মতো লাফাতে থাকে। যে পুতুলটা আগে আগে কাত হয়ে পড়ে, তার হার হয়।

৩৩.তুলা বা রেশমের বল।

৩৪.পুতুল নাচ : দড়ি বা তার বাঁধিয়া পুতুলবাজির মতো বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচানো হয়।

৩৫.ওশাবুরি : ঝুমঝুমি বাঁশী।

৩৬.হারিকোজোতার বড়লাফ পুতুল।

৩৭.প্যাঁকপেঁকে পুতুল।

৩৮.বিলাতি খেলার অনুকরণে দম দেয়া কলের গাড়ি, জন্তু জানোয়ার মোটরকার, ঠেলা বা টানা গাড়ি, ঘরকন্যার রান্না-বান্নার জিনিষের ক্ষুদ্র সংস্করণ, তারে তৈরি হার, ছবির তাস, খণ্ড খণ্ড চিত্রিত কাঠ জুড়ে একটা ছোট ছবির আকারে গড়া, যুদ্ধোপকরণ, তরোয়াল, বন্দুক, কামান, নিশান প্রভৃতি খেলনা জাপানি ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানের দেশি খেলায় শিশুদের ব্যায়াম ও আনন্দ দুই-ই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায়। দেশি খেলা শান্ত রকমের। তবে যেসব খেলায় হিংসা-দ্বেষের চিহ্ন, তা সকলই ইউরোপ থেকে আমদানি করা। জাপানিরা প্রাচীন কোম্পানির খেলনা ব্যবসা তৈরির খুব উঁচু নজরে দেখতো না। এজন্য বড় কারখানা কখনো হয়নি। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্বতির প্রচলনের পর ছেলেদের শিক্ষায় খেলা যে কত দরকার তা বুঝে খেলনা প্রস্তুতের প্রতি মানুষের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পাইকাররা ফরিয়াদের বাড়ি ঘুরে মানুষের তৈরি খেলনা সংগ্রহ করে দোকানে সরবরাহ করে। এক সময় সমগ্র পৃথিবীর খেলনা সরবরাহ করতো জার্মানি। জার্মানির খেলনা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে সুযোগ লাভ করে জাপান। জাপান অনুকরণ করে খেলনা তৈরি করছে। জাপানি খেলনা জার্মানির খেলনা অপেক্ষা সস্তা, কিন্তু কম মজবুত। ১৯১৫ সালে জাপান বিশ লক্ষ ইয়েন (বাংলাদেশে ২ টাকা সমান ১ ইয়েন) মূল্যের দেশি খেলনা রপ্তানি করে (জাপানী, ১৩২২ : ৪১-৪৩)।

চিত্রকর্ম

জাপানে আঠারো ও উনিশ শতকের মধ্যে হকুসাই, উতামারু, তৈয়োকুনি, কুনিসাদা ও আরো অনেক চিত্রকরের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের চিত্রকর্ম নিয়ে আলোচনার পূর্বে বলা দরকার যে, জাপানিরা কোনো কিছুই ছোট বলে অবহেলা করে না। বিশ্ব-চরাচরের সকল জিনিষের মধ্যে তারা মহাসৌন্দর্য অনুভব করে। তারা মনে করে যে নর-নারী, জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মধ্যে স্রষ্টার যে মহিমা প্রকাশিত—তা সর্বজনীন। জাপানি আর্টের তুলির টানে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে এনং এ তুলির টানেই নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় করে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। জাপানিরা কোনো কিছু তত্ত্ব হিসেবে আঁকে না, আকা বস্তুকে তারা ভালবাসে এবং আঁকতেও ভালোবাসে, তাই আঁকে (মনীন্দ্রভূষণ, ১৩৩০: ৫১১)।

আঠারো শতকের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন হকুসাই। তিনি আবার হাইকু বা ছোট ছোট কবিতাও লিখে বাজারে বিক্রয় করতেন। আর্টে হকুসাই-এর প্রতিভা ছিল সর্বগামী এবং অনেক বিষয়ে তিনি ছবি একেঁছেন। জাপানি সাংসারিক জীবনের ছবি, ব্যঙ্গ চিত্র, সাধু, দেবতা, বীর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছবি একেঁছেন। প্রাণীর চিত্র আঁকায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর বহু দৃশ্য চিত্র আছে।

নবম শতকের বিখ্যাত শিল্পী কানোকা। জাপানের মিচিজান সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তিনি তাঁর নিজের বাগানে গিয়ে পুষ্পিত পাম গাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান। সে সময় তাঁর বিখ্যাত কবিতা পাম-এ লিখেন ‘প্লাম, তোমার প্রভূ হতে যদিও দূরে চলে যাচ্ছে, তবুও তুমি বসন্তকে ভুলো না’ (মনীন্দ্রভূষণ, ১৩৩০ : ৫১১)।

*Dhaka University Institutional Repository*

নারা যুগ বা বৌদ্ধ যুগের পর আসে ইয়ামাতো চিত্রকরদের যুগ। এ সময় জাপানিদের কাছে জাপান পরিচিত ছিল ইয়ামাতো হিসেবে। এ সকল চিত্রকরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন কানোকা, যিনি নবম শতকে তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কানকো অনেক প্রতিমূর্তি এবং দৃশ্য-চিত্র এঁকেছিলেন। কানোকার শ্রেষ্ঠ ছবি ‘নাচির জলপ্রপাত’। এর মধ্যে রয়েছে পর্বত-শিখরের উপর শর্বরী মেঘমগ্ন, ঝরনার জল, যা অনেক উঁচু থেকে বরফের মতো ঝরে পড়ুছে। নিচে পাইন বন।

তারপর আসে টোসা চিত্রকরদের যুগ। টোসা চিত্রকরেরা প্রধানত রাজ দরবারের দৃশ্য, জাপান সম্রাট এবং ওমরাহদের ছবি আঁকতেন।

১৮ শতকের চিত্রশিল্পী সোসেনর আঁকা বানরের ছবি খুব বিখ্যাত ছিল। জাপানি চিত্রশিল্পীদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে তাঁরা কখনো বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন না। সেজন্য চিত্রশিল্পী সোসেন দীর্ঘদিন ওসাকার বনে ফলমূল খেয়ে কাটান এবং অত্যন্ত কাছ থেকে বানরদের স্বভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য করেন। এ কারণেই সোসেনর আঁকা বানরের ছবি এত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

এরপর আসে সেৎসু ও অন্য চিত্রকরদের পালা। সেৎসু ছিলেন একজন প্রতিভাবান ও উঁচুদরের দৃশ্য চিত্রকর। ১৬ শতকে কানো চিত্রকরদের যুগ ছিল। কানো প্রতিষ্ঠিত এ শিল্পীরা জাপানের চিত্তকে সৌন্দর্যবোধের দ্বারা এতই বিমোহিত করেছিলেন যে, দীর্ঘদিন তাদের প্রভাব অব্যাহত ছিল। এ চিত্রকরদের বিশেষত্ব হলো রেখার দৃঢ়তা, বর্ণের উজ্জ্বলতা ও আলো-ছায়ার এ তিনটি বিশেষত্বই তখন জাপানিদের কাছে আর্টের বিশেষত্ব হিসেবে গণ্য হতো। তাদের ভাষায় এ তিন বিশেষ অঙ্গকে বলা হয় Fude no chicara trya I suni। কানোরা প্রথম চীনের চিত্রকারদের মতো দৃশ্যচিত্র আঁকতেন। কানোদের মধ্যে কোরিন, ওকিও প্রভৃতি আরো কয়েকটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কোরিন চিত্রকরেরা লাক্ষার উপর ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত। ওকিও চিত্রকরেরা খুব স্বাভাবিক করে ছবি আঁকতে পারতেন। সে সময়ে ওকিও চিত্রকরদের খুব সুনাম ছিল (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩১৫ : ১৭৭)।

জাপানের কলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেবল অবলোকন করে না, তারা আদর্শ হিসেবে এসকল চিত্রের নকলও করে থাকে। কোনো কোনো জাপানি চিত্রকর ইউরোপীয় ধরনের চিত্র নকল করার চেষ্টা করেন, তবে এক্ষেত্রে আনাড়ি হাতের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৭ শতকের প্রখ্যাত চিত্রকরদের অনেক জনপ্রিয় ও প্রকাশিত চিত্র পুনঃপ্রকাশ করে বড় লোকের ঘর সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ধনী ব্যক্তিরা এরূপ প্রয়াসকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কোনো গালার বাক্সে ওপর অথবা

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কোনো কাপড়ের উপর যে ছবির নক্সা দেখে জাপানিরা প্রশংসা করে তা জাপানের প্রাচীন চিত্রকর তান্যু বা ওকিয়ো অথবা বাস্তবধর্মী চিত্রকর হকুসাইর মূল্যবান অবদান।

পুরানো কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার আদর জাপানের অভিজাতবর্গের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৬) জাপানের শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভারতী সাময়িকপত্রে লিখেছেন—

> হরিউজি নগরে একদিন আমি ব্যারন্‌কিতাবাতাকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়েছিলাম; ইনি জাপানের একজন প্রাচীন 'দাইমিও'—সামন্ত শাসন আমলের একজন সেকেলে বড় আমীর; ১৮৬৮'র রাষ্ট্রবিপ্লব তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, অথচ তাঁহার ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁহার বৈঠকখানা ঘরটি খুব সাদাসিধা ধরণের, কিন্তু কতকগুলি অপূর্ব্ব ও চমৎকার শিল্পসামগ্রীর দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার খাবার ঘরটিতেও আস্‌বাবের কোন আড়ম্বর নাই। যখন তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিলাম, দুইশত বৎসরের পুরাতন গালার ছোট ছোট বাটিতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনীত হইল। তিনি জাপানের পুরাতন শিল্পকলার বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে তিনি জ্বলন্ত অনুরাগের সহিত বলিলেন : 'পুরাতন শিল্পকলা, নীতি-প্রতিবিম্বিত শিল্পকলা, উচ্চকুলের উপযোগী শিল্পকলা,—এই সমস্ত শিল্পকলার বিষয়গুলি খুব উচ্চও মহৎ।' আমার দুর্ভাগ্য,—আমি দোভাষীর মুখ দিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম, 'বাস্তবধর্মী চিত্রকর-সম্প্রদায়ের এই যে লোকপ্রিয় ছাপা-চিত্রগুলি দেখিতেছি এগুলি খুবই সুন্দর'—আমার এই কুরুচি দর্শনে, বৃদ্ধ ব্যারন্ আমাকে শিষ্ঠতার সহিত ভর্ৎসনা করিলেন : 'য়ুরোপীয়দের শিল্পকলা হদ্দ দুইশত কিংবা তিনশত বৎসর পুরাতন, আমাদের শিল্পকলা পঁচিশ-শ বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে; অতএব, য়ুরোপীয়দের রুচি যে আমাদের মত এখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা স্বাভাবিক (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩১৫ : ১৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

আর. কিমুরা (১৩২৯), জাপানের সামাজিক প্রথাঃ খাদ্যদ্রব্য, e½evYx, ভাদ্র, কার্তিক

জাপানী ছেলেমেয়ের খেলা ও খেলনা (১৩২২), পঞ্চশস্য, cevmx, কার্তিক

জাপানের সংবাদপত্র (১৩২৮), e½xq gmj gvb-mwnZ¨-cwÎKv,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৫), 'আধুনিক জাপান : পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার', fviZx, জ্যৈষ্ঠ

*Dhaka University Institutional Repository*

### বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৫), ‘আধুনিক জাপান : শিল্পকলা ও নাট্যাভিনয়’ (ফরাসী লেখক লে ফেলেসিঁার অনুবাদ), fviZx, শ্রাবণ

পি. সি. সরকার (১৩৪৫), ‘জাপানের সংবাদপত্রবাহী কবুতর’, ceËK, জ্যৈষ্ঠ

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (১৩৩৪), কো-বা-দাইশি ও কোইয়াসান্‌ আশ্রম, cevmx, কার্তিক

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (১৩৩৪), কোইয়া-সানের যাত্রী, cevmx, আশ্বিন

মন্মথনাথ ঘোষ (১৩১৯, ১৩২০), জাপানের ধর্ম, gvbmx, চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ

মন্মথনাথ ঘোষ (১৯১০), Rvcvb cevm, দি এম্পায়ার লাইব্রেরী, কলকাতা

মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৩৩০), ‘জাপানী আর্টের যৎকিনিচত’, fviZel, চৈত্র

যদুনাথ সরকার (১৩১৩), ‘জাপানের অভ্যুদয়’ (শিক্ষা), fviZx, ফাল্‌গুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩৬), ধানী জাপান, cevmx

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৭), ‘ইকেবানা’, fviZx, কার্তিক


Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

১৮৬৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে জাপান সম্পর্কে বাংলাভাষায় ৯৭টি গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এসব বইয়ের লেখকদের চারটি দলে ভাগ করা যায়। প্রথম দলের লেখকেরা জাপান গিয়েছিলেন এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মনাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পারুল দেবী,  সরোজ নাথ ঘোষ, শান্তা দেবী, সরোজ নলিনী দত্ত, হরিপ্রভা তাকেদা, যদুনাথ সরকার, মুকুল দে. রাসবিহারী বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত অনেকের রচনা বর্ণনামূলক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই জাপানের সভ্যতা ও অন্তর্নিহিত সংস্কৃতির স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য একটি দল জাপান সম্পর্কিত ইংরেজি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই দলের লেখকদের মধ্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, উমাকান্ত হাজারী, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আর একটি দল সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে জাপানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। এই দলে আছেন আবদুল আমিন ভূঁয়া, নরেন্দ্র দেব ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। আর একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যা লেখকের নামহীন। বাংলা ভাষায় ১৮৬৩ সালে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনূদিত †Rcvb গ্রন্থের পর ১৮৯৯ সালে লেখকের নামহীন bvbv †'‡ki bvix-wPÎ শীর্ষক গ্রন্থটিকলিকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, যেসব বাঙালি জাপান গিয়েছিলেন তাঁদের সকলেই জাপানের প্রবৃদ্ধির প্রশংসা ও ঔপনিবেশিক ভারতের দুরাবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

জাপানের প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের চারটি প্রধান দ্বীপ তথা হন্‌শু, হোক্কাইডো, কিওসু ও শিককু নিয়ে জাপান গঠিত। জাপানিরা তাদের দেশকে 'নিপ্পন' বা 'নিহন' বলে আখ্যায়িত করে—যার অর্থ হলো 'সূর্যোদয়ের দেশ'। অবশ্য জাপান চর্চা করতে গিয়ে বাঙালিরা কখনো কখনো জাপান সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেছেন। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাপান 'দূর প্রাচ্য' হিসেবে পরিচিত। তৎকালীন পরিবেশ, মানচিত্রের অবস্থা ও সাংখ্যবিজ্ঞানের অগ্রগতি ছিলো অসন্তোষজনক, ফলে জাপানের আয়তন, জনমিতি ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাঙালির জ্ঞান ছিলো সীমাবদ্ধ। সম্ভবত এর ফলে তথ্য বিভ্রান্তি ঘটেছে। এই সময়ে বিশ্বের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার চেয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহেরই প্রাধান্য ছিলো। পাহাড় ও পর্বতে মূল্যবান ও বিচিত্র বিটপি

Dhaka University Institutional Repository

সজ্জিত জাপান। পাহাড় ও পর্বত বেষ্টিত অপ্রতুল সমতল ভূমি জাপানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে কোনো সভ্যতার মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনীতি, সমাজ ও সামাজিক অবস্থা নিরুপণে ভূসংস্থাপনিক অবস্থা প্রধান নিয়ামক এবং জাপানও তার ব্যতিক্রম নয়। মারাত্মক ভূমিকম্পপ্রবণ বলে জাপানে জনগণ কাঠের বাড়ি নির্মাণ করে। সমতল ভূমির অপ্রতুলতা জাপানের কৃষকদের পাহাড়ের স্তরে স্তরে চাষের স্থান ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাধ্য করেছে।

জাপানের ঋতু যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং গরম সহনশীল। বৃষ্টি সেখানে প্রায় বারোমাসই থাকে। ছাতা প্রায় সকল জাপানির নিত্যদিনের সঙ্গী। জাপানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শীতকালে বরফ পড়ে। উত্তরে হোক্কাইদোতে অনেক বেশি বরফ পড়ে এবং দীর্ঘকাল তা থাকে। হোক্কাইদোতেই বাস করে জাপানের আদিবাসী 'আইনু' জনগোষ্ঠী। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে বর্তমান জাপানিদের পূর্বপুরুষ 'আইনু'দের পরাজিত করে বসতি বিস্তার করতে থাকে। আইনু এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভূমিকম্পের দেশ হিসেবে জাপান পরিচিত। সেখানে বিদ্যমান বহু আগ্নেয়গিরির মধ্যে কিছু সুপ্ত হলেও কিছু আগ্নেয়গিরি জীবন্ত। ভূমিকম্প হলে আত্মরক্ষার বিষয়টি জাপানিদের বংশ পরম্পরায় জ্ঞাত। জাপানের ইয়োকোহামা ও টোকিও অঞ্চলে ১৩২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এক প্রবল ও জন-বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের স্থিতিকাল ছিলো ৪ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। ভূমিকম্পের ফলে জাপানের আতামি, সিজোওকা ও টোকাই ইত্যাদি সমুদ্র নিকটবর্তী স্থানে ৩৯ ফিট উঁচু 'সুনামি' বা জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিলো। ভূমিকম্পের পরবর্তী ধাক্কা হয়েছিলো কয়েকবার। আগে জাপানিদের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর নিচে একটি বড় তিমি আছে, এই তিমি একটু নড়লেই পৃথিবী কেঁপে উঠে। যে স্থান কম্পিত হয় না, মনে করা হয়, সে স্থানে দেবতাদের বিশেষ অনুগ্রহ আছে। 'উন্‌জেন' আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গন্ধক জলে মিশ্রিত হয়ে এক উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টধর্ম আসার পর স্বধর্মত্যাগীদের উপর অনেক অত্যাচার করা হতো। কোনো কোনো সময় স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যারা খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করতো, তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য সম্রাটের আদেশে উষ্ণ প্রস্রবণে নিক্ষেপ করা হতো।

জাপান ফুলের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। ফুল সাজানোর কাজ তথা 'ইকেবানা' শেখানো একটি জনপ্রিয় শিল্প। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপানের 'ইকেবানা' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জাপানিরা শহর বলতে বোঝে সেই স্থানকে যেখানে অবশ্যই একটি ফুলের দোকান, একটি গ্রন্থাগার ও একটি সুরের দোকান থাকবে। এই ধারণা জাপানিরা পাশ্চাত্য থেকে পেয়েছে। কমোডোর পেরির জাপান আক্রমণের ফলে জাপান পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার কাছে উন্মুক্ত হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অতীব সুন্দর। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জাপানের জন্য শক্ত ও সুরক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। টোকিয়ো জাপানের রাজধানী এবং এশিয়া মহাদেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বাণিজ্যিক স্থান। বহু অট্টালিকা ও প্রশস্ত রাস্তা এবং সেতু এই স্থানের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। টোকিওতে জাপানের সম্রাটের বিশাল বাসভবন রয়েছে। অতীব সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা এই বিশাল শহরে বাস করে। টোকিওতে জাপানের জাতীয় সংসদ, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক বিদ্যালয় রয়েছে। ওসাকা জাপানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শহর। সমুদ্র তীরে অবস্থিত ওসাকা সুরক্ষিত বন্দর। এখানে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি হয়।

১৮৫৩-১৮৫৪ সালে কমোডোর মেথিউ কলব্রেথ পেরির (১৭৯৪-১৮৫৮) আক্রমণের পূর্বে জাপানে বিদেশিদের চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিধি নিষেধ আরোপিত ছিলো। জাপানে প্রবেশাধিকার বিদেশিদের সহজ ছিলো না। কোনোক্রমে জাপানে বিদেশিদের প্রবেশাধিকার দেয়া হলেও দেশের সর্বত্র তাদের যাতায়াত করতে দেয়া হতো না। পূর্বে একমাত্র ওলন্দাজরাই জাপানের নাগাসাকি বন্দরে বাণিজ্য করতে পারতো। এজন্য ওলন্দাজদের প্রতি বছর জাপান সম্রাটের দরবারে তাঁর সম্মানার্থে একজন দূত পাঠাতে হতো। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমদিকে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে সন্ধি হয়, তার পরম্পরায় অনেক বিদেশি জাতি জাপানের কয়েকটি শহরে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। যদিও ১৬ শতক থেকে ইংরেজরা জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৬১৩ থেকে ১৬২৩ সাল পর্যন্ত জাপানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা বাণিজ্য কুঠি ছিল। ক্রমে জাপানিরা পৃথিবীর অনেক জাতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর ফলে জাপানি সমাজ, রাজ্যশাসন ও ধর্ম বিষয়ে অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

জাপানিরা প্রধানত মঙ্গোলীয় জাতি। জাতি হিসেবে তাদের মৌলিক কিছু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিলো। চীনের কাছ থেকে জাপান প্রধানত সভ্যতা শিখেছিলো। কিন্তু অনুকরণের দিকে থেকে জাপানিরা ছিলো অদ্বিতীয়। কমোডোর পেরির জাপান অভিযানের পরে জাপান সরকার বহু জাপানিকে জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তারা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে, অতি দ্রুত সে সকল বিষয়ে জাপানিরা উৎকর্ষতা আনে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরে। সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি করতে জাপানিদের লক্ষণীয় নিপুণতা রয়েছে। মৃন্ময় পাত্র নির্মাণে উৎকর্ষতা ও পারঙ্গমতার ক্ষেত্রে জাপানিদের মধ্যে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। এই বিদ্যার উৎপত্তি হয় ইতিহাসের বহু যুগ আগে নামুচিমিকোটের সময়। পূর্বে মিশরীয়দের ন্যায় মৃত সম্রাটের সঙ্গে তার সহচরদের সমাধিস্থ করার প্রথার অবসান ঘটে ২৯ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর।

Dhaka University Institutional Repository

আদিকালে জাপানিরা শারীরিকভাবে খাটো এবং অতিশয় হিংস্র ছিলো। কালক্রমে তারা শান্ত, শিষ্ট ও দয়ালু হয়। জাপানের স্ত্রীলোকদের হাত ও পা ছোট; তাদের দাঁত ও গলার গঠন খুব সুন্দর ছিলো। ইউরোপীয়রা জাপানিদের মারাত্মকভাবে সমালোচনা করে। বলা হয়েছিলো যে, জাপানি স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন, কিন্তু মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট-চরিত্র। এসব ইউরোপীয়দের মিথ্যা-ভাষণ। আগে জাপানে কোনো উচ্চ বংশীয় লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে প্রথমে দণ্ডিত ব্যক্তি আপনা আপনি হারিকিরি করে আহত হতেন। পরে তার কোনো মনোনীত বন্ধু তাঁর শিরোশ্ছেদ করতো। ১৪ শতক থেকে এই নিয়ম বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিলো।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবির (১৭৯৭-১৮৫৮) প্রতিকূলতার তত্ত্ব (Challenge and Response) সভ্যতার উৎপত্তির জন্য একটি স্বীকৃত তত্ত্ব। কিন্তু মানব সভ্যতায় সকল দেশ ও জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এক বা একাধিক মত, কিংবদন্তি বা ধারণা রয়েছে। কিন্তু এ সকল মত, কিংবদন্তি বা ধারণার সারবত্তা নেই বললেই চলে। জাপানিরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেও শিন্তো তাদের আদি ধর্ম। জাপানিরা অনেক পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের কয়েকটি অনুশাসন জাপানে শুদ্ধভাবে পালিত হতে দেখা যায়। জাপানের কিংবদন্তি অনুযায়ী ‘শিন্তো’ সূর্য থেকে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপানের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুরুষ। জাপানের অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১?-৪৭৯? খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) প্রবর্তিত মতাবলম্বী লোকও জাপানে রয়েছে। পর্তুগিজদের সহায়তায় ১৫৪৮ সালের দিকে জাপানে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারিত হয়। জাপানে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মারাত্মক রাজরোষের সম্মুখীন হয়। জাপানের হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সমিতির তথ্য অনুযায়ী অতীতে সম্রাটের জাপান শাসনের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিলো। তিনি সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা প্রদেশে বিভক্ত করে শাসনের জন্য রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত করতেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত ছোট প্রদেশ শাসন করতেন, তাঁদের ‘সিওমিও’ বলা হতো। জাপানের সকল ক্ষমতাই বংশানুক্রমিক; সকল জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার পদ পায়। জাপানি সমাজকে ৮টি ভাগে বিভক্ত করা হয়; যেমন শাসনকর্তা, উচ্চ বংশীয় অভিজাত শ্রেণি, যাজক, সামরিক কর্মচারী, বিচার বিভাগীয় ব্যবসায়ী বা বণিক, শিল্প ব্যবসায়ী এবং মজুর। জাপান দ্রুত উন্নতিশীল দেশ। অল্প সময়ের মধ্যে তারা লক্ষণীয় উন্নতি সাধন করেছে। জাপানকে বলা হয় এশিয়ার ‘ব্রিটেন’। জাপানিরা আহার ও পোষাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে অনুকরণ করে। ১৮৮৪ সালে মাৎসুহিতো জাপানের সম্রাট হন। মাৎসুহিতো জিম্মুতেন্না থেকে ১২৩ পুরুষ অধস্তন। এই সম্রাটের উপাধি ‘মিকাডো’। সম্রাটকে ১৮৭৫ সালে ‘জেনরোইন’ নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিলো, যে সভা শাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। ১৮৯০ সালে জাপানে প্রথম পার্লামেন্ট সভা আহুত

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়। জাপানের শাসন প্রণালি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলেও 'মিকাডো' অর্থাৎ জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা অনেকটাই অক্ষুণ্ন রয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে জাপানের জাতীয় প্রশাসনের জন্য ৫৭টি বিভাগ ছিলো এবং প্রতিটি বিভাগে একজন প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। প্রতিটি বিভাগের অধীনে কতগুলো শহর ও গ্রাম ছিলো। এশিয়ায় জাপান পাশ্চাত্য ধরনের দেশ। প্রত্যেক জাপানির জন্য সামরিক শিক্ষা ছিলো বাধ্যতামূলক। জাপান পরবর্তীকালে যুদ্ধবিদ্যার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো।

১৮৬৮ সালে জাপানে মেইজি শাসনের পুন:প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় ষাট বছরের মধ্যে জাপান সম্পর্কে বাঙালি লেখকেরা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কেবল ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজের evgv‡ewabx পত্রিকায় 'জাপানি কুকুর' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আর ১৮৯৯ সালে কোলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত লেখকের নামহীন অথচ bvbvb †'‡ki bvix wPÎ শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জাপানি নারীর উপর একটি অধ্যায় রয়েছে। ১৮৬৮ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে জাপানের রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিলো এবং এই সময়ে বাংলাভাষায় চীন ও জার্মানির ইতিহাস লিখিত হয়েছিলো। এর কারণ ব্রিটিশ ভারতের জনগণের সঙ্গে জাপানের তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যদিও সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ হয়েছিলো। কোরিয়ার সঙ্গে ১৮৭৬ সালে জাপানের খানাগাওয়া চুক্তি চীনের চিন্তা ও ইর্ষার কারণ হয়। ১৮৯৪ সালে জাপান কোরিয়ায় অবস্থানরত চীনের নৌ-বাহিনীকে হঠাৎ আক্রমণ করে। স্থল ও নৌ যুদ্ধে জাপান চীনকে পরাজিত করে এবং ১৮৯৫ সালে 'সিমনোসেকি' সন্ধির মাধ্যমে কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া চীন তার কয়েকটি দ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দেয়। এই যুদ্ধ প্রথম সিনো-জাপানি বা চীন-জাপান যুদ্ধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় সিনো-জাপান বা দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ১৯৩৭ সালে শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। ১৯০৪-১৯০৫ সালে প্রধানত পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয় এবং জাপান বিশ্বে একটি শক্তিধর জাতি হিসেবে পরিচিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অতি সক্রিয়তা এবং অতি মাত্রায় যুদ্ধংদেহী মনোভাব ছিলো না। তবে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সঙ্গে আঁতাঁত গঠন করেছিলো । এ সময় জাপান চীনের ওপর রণ-কৌশলের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে জার্মানির রণতরীর ওপর তারা চালায় আক্রমণ। জাপান আমেরিকার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজস্ব শক্তি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলাভাষার কোনো গ্রন্থ রচিত না হলেও সমকালীন বাংলা পত্রিকায় এই যুদ্ধ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাপান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। কেননা সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধে বাংলা ও ভারত জড়িয়ে পড়ে। এমনকি এই যুদ্ধ ভারতের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করে। এই যুদ্ধে যোগদান করতে ভারতকে ইংল্যান্ড বাধ্য করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বমোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। ভারত এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগদান না করলেও তাঁর ২৪ হাজার সামরিক ও বহু বেসামরিক নাগরিককে প্রাণ দিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৩৯ সালের  ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে সূচিত হয়। ইতোপূর্বে ১৯৩১ সালে জাপান চীন আক্রমণ করে চীনের অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরপর জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৯৪০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অক্ষ চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেই জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোচীনে সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিমারো কোনোই পদত্যাগ করলে প্রধান সেনাপতি জেনারেল হিদেকি তোজো নিজে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরবর্তীকালে জাপান আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত আমেরিকার নৌ-ঘাঁটি পাল হারবারের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ফলে আমেরিকা এই যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান থাইল্যান্ডে প্রবেশপূর্বক জাপান ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয়।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জাপান বেশ কয়েকবার বার্মায় আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত চীনা সেনাবাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে বার্মায় জাপানিদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তারা বার্মা ত্যাগ করে। বার্মায় জাপানিদের আক্রমণের তীব্রতা ছিলো মারাত্মক ও ফল ছিলো ভয়াবহ। এজন্য বহু বাঙালি ও ভারতীয় বার্মা ত্যাগ করে স্বদেশ চলে আসে। বার্মা থেকে ভারতে আসার ক্ষেত্রে বাঙালি ও ভারতীয়রা বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়, যা অনেকেই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে জাপান বাংলা আক্রমণ করে। বাংলার কোলকাতা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ছিলো জাপানি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যকেন্দ্র। এ সকল স্থানে কয়েকবার জাপানের বোমারু আক্রমণ চলে, ফলে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলায় জাপানি আক্রমণের ভয়ে সকল প্রকার যানবাহন লুকিয়ে রাখা হয়। এরই ফলে বাংলায় ঘটে 'মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ'—যার ফলে wÎk jÿ লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

জাপানে ঐতিহাসিক কালে গ্রামীণ জনগণ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিলো। এদের মধ্যে যে নিজের জমি নিজেই চাষ করতো সেই কৃষকের প্রাধান্য ছিলো। এদের মধ্যে জমি চাষের পরিমাণ

*Dhaka University Institutional Repository*

অনুযায়ী কয়েকটি উপবিভাগ বা শ্রেণি ছিলো। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরি করতো বলে কারিগর ছিলো কৃষকের সহযোগী। সবার নিচে ছিলো বণিকের স্থান, তার কারণ হলো সে অন্যের উৎপাদন থেকে লভ্যাংশ ভোগ করতো। জাপানের আইন অনুযায়ী কোনো বিদেশি জাপানে জমির মালিক থেকে পারতো না। একইভাবে কোনো বিদেশির জাপানের ভূগর্ভ থেকে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও বিক্রয় করার অধিকার ছিলো না। জাপানের চারদিকের সমুদ্র মাছে পরিপূর্ণ ছিলো। উপকূল আঁকাবাঁকা ও সমুদ্র অগভীর এবং উষ্ণ কুরোশিও শীতল সুমেরু বা কিউরাইল স্রোতের মিলনের ফলে জাপানের সমুদ্র অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সরকার জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

কৃষকদের জন্য উৎকৃষ্ট ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার ব্যবস্থা করেছে সরকার। একইভাবে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের কারখানা স্থাপনের জন্য প্রজাদের অনুপ্রাণিত করে। বাণিজ্য জাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের দায়িত্ব জাপান সরকার নিজ হাতে রেখেছে। জাপানিদের সরকারকে বেশি করও দিতে হয়। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার এবং উন্নতির ক্ষেত্রে সরকার বেশি খরচ করতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে জাপানে বাঁশ ও বেত উৎপাদন হয়। সেখানের দরিদ্র পরিবার গৃহ নির্মাণ ও শিল্পের জন্য বাঁশ ও বেত কাজে লাগাতো। কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ফলে সেখানে শিল্প নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জাপানে ছিলো। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু দ্রব্য আমদানি করতো। প্রথমদিকে জাপান একটি কৃষি-নির্ভর দেশ হলেও পরে কয়েকটি ধাপে কৃষি-নির্ভর শিল্পের দেশে উন্নীত হয়। জাপানিরা ছিলো অনুকরণ প্রিয়, তাই মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দেশের উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ছিলো জাপানের প্রতিষ্ঠিত নীতি। সেই নীতি অবলম্বন করে তারা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রেলওয়ে, ট্রাম, স্টিমার ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় এবং ক্রমে রপ্তানি-প্রধান দেশে পরিণত হয়।

জাপানের ওসাকায় ১৮৯১ সালে 'চেম্বার অব কমার্স' স্থাপন করা হয়। এই চেম্বার অব কমার্স জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহজনক বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পাদন করে। এ সকল কার্যকলাপের মধ্যে ছিলো ব্যবসায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। জাপান, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রতি বছর দু'বার 'যাযাবর মেলার' আয়োজন করা হয়। চেম্বার অব কমার্স-এর পরিচালনায় প্রতি বছর দু'বার শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া শিল্পমেলার আয়োজনও এই চেম্বার অব কমার্স করে থাকে। আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৫ সালে শিল্প প্রদর্শনী হয়। জাপান এই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে জাপানি সুতি, চিনামাটির বাসন-পত্র, রেশমি বস্ত্র, বাঁশ ও বেতের জিনিস, মাদুর ও বার্নিশের কাজ দেখে আমেরিকার জনগণ স্তম্ভিত হয়েছিলো। জাপানি শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বেই তারা বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলো। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার জন্য জাপান সরকার বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার জন্য বহু ছাত্রকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে এবং এসকল ছাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও জ্ঞান অর্জন করে জাপানে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁর জাপানে শিল্পবিজ্ঞানের কার্যকর ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলে এবং জাপানের অগ্রগতি নিশ্চিত করে। জাপানিরা তাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে। জাপান আমদানি ও রপ্তানি সমানভাবে করছে অন্যান্য দেশের মতো। কারখানা পরিচালনার জন্য জাপানের তুলা, পশম ও চামড়া ইত্যাদি কাঁচামাল প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন জাপান আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। জাপানের কোনো অধিবাসী অবসরে সময় নষ্ট করে না। পাশ্চাত্যের জনগণ জাপানি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কারণ হিসেবে মনে করে যে, জাপানি কারিগর অল্প বেতনে সন্তুষ্ট এবং জাপান সরকার নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। জাপান থেকে প্রধানত রেশম, রেশমি বস্ত্র, কার্পেট, মাদুর, চিনামাটির বাসন, বার্নিশের জিনিস, ছাতা, চা, কয়লা, মাছ, মাছের তেল, পাখা, কাগজ, মদ, ওসুধ, সুতা, শিঙের দ্রব্য এবং সাবান আমেরিকা-সহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়, জাপানে উন্নত শিল্পের সকল পূর্বশর্ত মেইজি শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে গড়ে ওঠে।

জাপানে ১৮৭২ সালে রেললাইন চালু হয়। সেখানে তখন রেললাইন ছিলো ১৮ মাইল। রেললাইন ছিলো সরকারি ও বেসরকারি। মাত্র ৩০ বছরে মধ্যে মোট রেললাইনের পরিমাপ দাঁড়ায় ৪০২৫ মাইল। অনুরূপভাবে ১৮৮৪ সালে জাপানে প্রথম জাহাজ নির্মাণ করা আরম্ভ হয়। ১৫ বছরের মধ্যে জাপানি জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৪১৫-তে। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সকল জাহাজ ক্রমে অত্যাধুনিকভাবে তৈরি করা হয়। জাপান সরকার শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতির জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, তার সবই করে। সামরিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং পাহাড় থেকে দ্রুতবেগে চলে আসা জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রপেলার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। টেলিফোন পাওয়া যায় জাপানের প্রায় সর্বত্র। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ১৮৯৪ সালের মধ্যে ২৯৬৭টি কোম্পানি খোলা হয়েছিলো। পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২৯৪। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাপানিদের বেতন প্রায় প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হতো। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারত ও জাপানের সঙ্গে ইন্দো-জাপানিজ এসোসিয়েশন ও 'ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি' নামে দুটি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠন দুটি জাপানের টোকিওতে একটি যাদুঘর স্থাপন করে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রদর্শনী শুরু করে। অতি সহজেই ইন্দো-জাপানিজ এসোসিয়েশন ও ইন্দো-জাপানিজ ট্রেডিং কোম্পানি ভারতের তদানীন্তন শাসক ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেননা এরূপ সংগঠন উভয় দেশের জন্য আর্থিকভাবে কল্যাণকর

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের স্বার্থে ইংল্যান্ডের বস্ত্র ব্যতীত অন্য সকল দেশের বস্ত্র আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করে। ১৯১২ সালে জাপানের মোটর গাড়ির প্রচলন হয়নি। জনগণ তখন গুটি কয়েক গাড়ি, রিক্সা ও ট্রাম ব্যবহার করতো। অতি স্বচ্ছল ব্যক্তি বা পরিবার কয়েকটি কারণে ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলো। জাপানের গ্রামে ও শহরে রয়েছে রিক্সা এবং সাইকেল। জাপানিরা রিক্সাকে 'জিন্-রিক্সা' বলে। 'রিক্সা' ইংরেজি শব্দ এবং 'জিন্' জাপানি শব্দ। জিন্ শব্দের অর্থ 'মানুষ', অর্থাৎ মানুষ-চালিত দু'চাকার গাড়িই হলো রিক্সা।

জাপানি শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। পৃথিবীর মধ্যে জাপান সবচেয়ে উন্নত মানের ও ব্যাপক পরিমাণের সিল্ক উৎপাদনকারী দেশ। সিল্কের কাজে মেয়েরা লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করে। সেখানকার কল-কারখানায় মেয়েদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাপানি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের ৬০-৮০% নারী। শিল্পে কাজ করার জন্য দূরের পল্লী থেকে দালালেরা মেয়েদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসে। খারাপ পরিবেশে মেয়েরা বসবাস করতে বাধ্য হয়। অনেকে যৌন হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু এই পরিবেশে মেয়েদের বাস করা পাপ বলে গণ্য করা হয় না এবং এসকল মেয়ের পরে বিয়ে করে সংসারী হবার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না।

জাপানিদের চরিত্রের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুণ হলো কষ্টসহিষ্ণুতা। ইশ্বর জাপানিদের আবাস-ভূমি তাদের উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। জাপানিরা ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে। মারাত্মক অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করলেও জন-সমক্ষে তা প্রচার করে না। জাপানে নিঃসহায়, দীন দরিদ্র ও কর্মক্ষম ব্যক্তি অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবন ধারণ করতে অপমান বোধ করে। তারা পরিবারের উপর নির্ভরশীল থাকতে লজ্জা বোধ করে। তারা মনে করে সক্ষম অবস্থায় সোপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ না করতে পারলে পশু-পাখির মতো জীবন অতিবাহিত করা হয়।

জাপানিদের চরিত্রের সহজাত দিক হলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা। দীন ও দরিদ্রের কুটিরের অভ্যন্তরটি যেন একটি চিত্রিত পট। কাজকর্ম সবই পরিষ্কার। জাপানি শব্দ 'দাইতোকোরো'-র অর্থ হলো রান্নাঘর বা প্রধানঘর। জাপানিদের আহার্য্য সম্পর্কে অনেকেই জানার জন্য উৎসুক। অনেকেরই ধারণা জাপানিরা নিরামিষভোজী; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। জাপানিদের সুদৃঢ় গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখলে স্বাভাবিক কারণে তাদের আহার্য নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু তাদের রান্নাঘর ও আহার্যে কোনো আড়ম্বর নেই। অতি সাধারণভাবে তারা জীবন যাপন করে। জাপানিরা হাত দিয়ে ভাত খায় না, এজন্য বাঁশ বা কাঠের তৈরি কয়েক জোড়া কাঠি—জাপানি ভাষার 'হাসি' ব্যবহার করে। ভাত জাপানিদের প্রধান খাদ্য। ডাল দিয়ে অনেক রকম খাবার হয়, যেমন পিঠা, মিঠাই, তফু ইত্যাদি। জাপানে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। জাপানিরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ কাঁচাই খায়।

Dhaka University Institutional Repository

তখন একে বলা হয় ‘ছাসিমি’। ছাসিমি জাপানিদের খুব প্রিয় খাদ্য। শুক্না বা শুট্কি মাছ খেতে জাপানিরা ভালোবাসে। সব্জি রান্নার সময় জাপানিরা শুক্নো মাছ চেঁছে চেঁছে তার কণা সব্জিতে মিশিয়ে দেয়। জাপানে কোনো কোনো গাছপালার রস তাদের মশলা।

অনেকেরই জানা যে, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এবং জাপানেও এ অবস্থা লক্ষ করা যায়। জাপানে মৃত ব্যক্তির জন্য দুই পদ্ধতিতে শোক প্রকাশ করা হয়। (ক) শোক প্রকাশক শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধানের মাধ্যমে ও (খ) নিরামিষ ভোজনের মাধ্যমে। প্রত্যেক আত্মীয়ের জন্য শোক প্রকাশের দিন নির্দিষ্ট থাকে। জাপানিদের ঐতিহ্যিক পোষাক ‘কিমোনো’ ও ‘ইউকাতা’। কিন্তু কমোডোর পেরির জাপান অভিযানের পর পোষাকে ক্রমশ পাশ্চাত্য প্রভাব প্রকটিত এবং স্কুল, কলেজ, অফিস ও আদালত, এমন কি কৃষিক্ষেত্রেও ভিন্নতর পোষাক লক্ষ করা যায়। প্রায় সর্বত্র জামা, প্যান্ট ও কোর্টের ব্যবহার লক্ষণীয়। জাপানে মেয়েরা অতি সামান্য ধাতুর অলঙ্কার ব্যবহার করে। অবস্থাপন্ন গৃহের মেয়েরা ঘড়ির সঙ্গে সরু সোনার চেইন এবং পুরুষেরা নেকটাই-এ সোনার পিন ব্যবহার করে। জাপানিরা কোনো ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে না-পারলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের অভ্যর্থনা ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

প্রাচ্য সমাজের একটি বিষয় লক্ষ করে প্রতীচ্যের মানুষ চমৎকৃত হন। প্রাচ্য দেশসমূহের প্রায় সর্বত্র বয়োবৃদ্ধরা তাদের বায়োজ্যেষ্ঠতার জন্য সম্মান পান। এ সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম জাপানেও নেই। এজন্য পূর্বে জাপানে নববধুর স্থান ছিলো অনেক নিচে। জাপানে শিশুর ছয় বছর, ছয় মাস ও ছয় দিন বয়স হলে তার বিদ্যারম্ভ হয়। শিশুর জন্মের সাত দিনের দিন তার নামকরণ করা হয়। এক মাস পর শিশুর মাথার চুল ফেলে দিয়ে শিশুকে স্থানীয় মন্দিরে নিয়ে ইষ্ট দেবতার পূজা করা হয়। শিশু তিন বছর পর্যন্ত মুণ্ডিত মস্তকে থাকে এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করতে দেয়া হয়।

অতিথিপরায়ণতাও জাপানি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নারীরা অতিথির সমাদার করতে জানে। অতিথির সম্মান রক্ষায় পুরুষের ন্যায় জাপানি নারী উদাসীন নয়। ত্রিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিয়ে সম্বন্ধে চীন ও জাপানের নিয়ম ছিলো অনেকটা অভিন্ন। ত্রিশের দশকের পরে জাপানের বিয়ের পদ্ধতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যাহোক, ধর্মের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ এবং একথা জাপানিরা ভালো করে বুঝে—এজন্য সেখানে ব্যভিচার নিন্দিত। তবে একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, জাপানি পুরুষের বহু নারী আসক্তি তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান এবং সমাজের এরূপ ব্যবস্থায় জাপানি নারীরা অভ্যস্থ্য ছিলো। এক সময় জাপানে বিয়ের বিচ্ছেদ ছিলো প্রায় অপ্রচলিত। স্বামীপরায়ণ জাপানি নারী বিয়ে বিচ্ছেদ কামনা করে না। অবশ্য পরিবর্তনের হাওয়ায় প্রতীচ্য শিক্ষিত নারীদের মনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষোভের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেলেও সাধারণভাবে প্রতিবাদ প্রবল হবার সম্ভাবনা নেই। নারীর কোনও বিষয়ে সত্ত্বাধিকার না থাকলেও, পুরুষ নারীকে কোনো প্রকার অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেনা। বরং শ্রদ্ধার অঞ্জলীই তাকে প্রদান করে। অন্যদিকে নারীরা নিজেদের অবস্থায় কতটুকু সন্তুষ্ট ছিলো সে বিষয়ে অধিক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি জাপানকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলো এবং তখন এই আমূল সংস্কার ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার বিরুদ্ধে জাপানিদের মনে এক গোপন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। উন্নত ও খাঁটি জাপানি পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের জন্য সকলের মনে সৃষ্টি হয় এক আলোড়ন। ফলে পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ জাপানিদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। কিন্তু জাপানিদের এই স্বদেশিভাব দীর্ঘস্থায়ী ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর জাপানের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকবার জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও নগ্ন স্নান দেখেছেন এবং জাপানের নগ্ন স্নান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কবি গুরু নগ্ন স্নানের মধ্যে কুরুচিকর কিছু খুঁজে পাননি।

জাপানি মহিলা নিজের পরিবারের চেয়েও দেশকে বেশি ভালোবাসেন। ১৯০৪ সালে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধে রাশিয়া বেশ সঙ্কটে পড়ে। স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি-মমতা জাপানিদের মজ্জাগত। ১৯০৪ সালে জাপানি মহিলারা তাদের স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের লক্ষণ থেকে সমাজের সভ্যতা বিকাশের ধারাক্রম অনুধাবন করা যায়। জাপানি সমাজে নারী স্বাধীনতা থাকলেও তা কখনো অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান ছিল না। সেখানে নারী চিরকালই পুরুষের মুখাপেক্ষী। তবে পুরুষ কখনো নারীকে দাস গণ্য করেনি। বরং নারী-পুরুষের সহমর্মীতা ও সহযেগিতার আবহে সমাজ প্রবাহ অগ্রসর হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধেও জাপানে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। অন্দরে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেও বাইরে তাদের অধিকার তখনো অধরাই রয়ে গিয়েছিলো।

উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান প্রধানত একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত ছিলো। তখন জাপানের শতকরা ৬০ জনের উপজীবিকা ছিল কৃষি। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা ব্যতীত অন্য মহিলারা পুরুষের এই কাজে সহযোগিতা করতেন। নানা যুগে জাপানে ষোল জন শাসক শাসন করেছেন। এই ষোলো জন শাসকের আট জন ছিলেন সম্রাজ্ঞী। তৎকালীন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার, শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যের কীর্তি স্থাপনে এসব সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা অক্ষয় হয় আছে। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাপানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন সম্রাজ্ঞীদের এরূপ প্রয়াস সমাজে নারীর অধিকারও নারীদের অগ্রযাত্রার পথ উন্মোচন করে। ব্যারনেস ইশিমোতো, কাউন্টেস ইসুগারু এবং মার্কিওনেস শে-এর মতো অগ্রগামী নারী নেত্রীদের প্রচেষ্টায় সমাজে নারী জাগরণের এক নব অধ্যায় দেখা দেয়। তাঁরা জাপানের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

*Dhaka University Institutional Repository*

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি চা-চক্র এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবেত হয়ে নারী স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে।

জাপানি সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো কাব্যচর্চা। আট শতকের পদ্য ছন্দে রচিত gvb l m জাপানের শ্রেষ্ঠ আদি কাব্যের সংগ্রহ গ্রন্থ। সাহিত্যে গদ্যের তখনো সূচনা হয়নি। জাপানি সাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদি যুগ ৭৯৪ সাল থেকে ১১৯২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। †MwÄ হলো জাপানের সত্যিকারের প্রথম উপন্যাসের নাম, যাতে চীনের সিয়ান রাজ-দরবারের হুবহু চিত্র প্রতিবিম্বিত। এটি পৃথিবীর সেরা উপন্যাসের একটি বলে বিবেচিত হয়। একদিকে জাপানের রাজ পরিবারে চক্রান্ত, ঈর্ষা ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা এবং পরিণতিতে মৃত্যু, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজ পরিবারের সামাজিক ও মনস্তাত্তিক দ্বন্দ্ব গেঞ্জি কাহিনির মূল বিষয়। ১৪ শতকেই প্রথম গীতধর্মী 'নো' নাটক বিকাশ লাভ করে। জাপানের কাব্য জগতে এ সময় 'তকনা' নামে 'হাইকু' কবিতার প্রচলন হয়। কবি মাৎসুও বাসো (১৬৪৪-১৬৯৪) ছিলেন 'হাইকু' বা 'হোক্কু' কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি মাৎসুও বাসোর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন তাঁর 'যাত্রী'তে। ক্ষুদ্রাকার এই কবিতাকে বলা হয় 'তনকা' বা 'ওয়াকা'। 'তনকা' হলো পাঁচ চরণের (৫+৭+৫+৭+৭) ৩১ অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট কবিতা। মিল বা ছন্দের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা জাপানি কবিতামাত্রই ছন্দ প্রাণ। এ শ্রেণির কবিতাকে ব্যঞ্জনাত্মক, গীতধর্মী ও আবেগময় হতে হয়। সোজা কথা হলো, এখানে আড়ম্বর বা অতি কথনের অবকাশ নেই। 'হাইকু' বা 'হক্কু' কবিতার অক্ষরমাত্রা ৫+৭+৫ =১৭, আর চরণ মাত্র তিনটি। মানুষ, প্রেম আর প্রকৃতি এই কবিতার প্রধান বিষয় যা 'তনকার'ও আলোচ্য বিষয়। 'হাইকু' বা 'হক্কু' প্রতীকধর্মী, ইঙ্গিতময় এবং সংক্ষিপ্ত। 'তনকার' জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ম্রিয়মান হয়ে যায়, যখন 'হাইকু' বা 'হক্কু'র ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব কাব্য, কবিতা, উপন্যাস ও সাহিত্য রয়েছে রয়েছে, তার নিজস্ব সৃজনী শক্তি ও প্রতিভা। বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করার প্রবণতা জাপানি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাপানি কবির ধারণা যে, আভাস ইঙ্গিতেই সাহিত্য সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়। জাপানের বিখ্যাত কবি ইয়োনে নোগুচি 'জাপানি কবিতার মর্ম্মকথা' বিষয়টির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাপানি কবিতায় কথার কোনো অত্যাচার নেই, সেখানে আছে ইঙ্গিত ও মনের গভীর আলোড়ন, মানুষের মনের অন্তর্নিহিত মৌলিক আবেদন। এতে আছে নিত্যদিনের জীবন ও জগতের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক, সহজবোধ ও পথ-চলার গান—জীবনের গান। সৌন্দর্যের সর্বজনীন উপাসনা জাপানি কাব্য-রীতির এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ। জাপানিদের এই সৌন্দর্যবোধ এবং তাকে সার্থক রূপ দেবার প্রয়াস বিশ্বকবি

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিমুগ্ধ করেছিলো। জাপানি কবিতার সর্বপ্রধান উৎস জাপানের প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য।

মেইজি যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে জাপানি সাহিত্যে অনুকৃতিবাদ বা প্রকৃতিবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময় রোমান্টিক রচনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। জাপানি লেখকেরা এ সময় 'শিল্পের জন্য শিল্প' সৃষ্টিতে আগ্রহ পোষণ না করে টলস্টয়, জোলা, হাক্সলি, ইবসেন, ডারউইন প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকের রচনা ও ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। এক সময় জাপানে প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদ একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলেন শিমারো হোগেৎসু ও পাশ্চাত্য ঘরাণার কবিতা 'শিনতাই'-এর প্রবর্তক কবি শিমাজাকি।

পরবর্তীকালে প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদের বিরোধিতা করেন একদল পণ্ডিত ও লেখক। এঁদের মধ্যে ছিলেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি সাহিত্যের অধ্যাপক বিন উহদা, ড. ওগাই মোরি-নাৎসুমে কিনোসুকে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সোসেফি নাৎসুমে প্রমুখ। এই সাহিত্য আন্দোলনের সময় তরুণ জাপানি লেখকদের উপর অধ্যাপক সোসেকি নাৎসুমের আদর্শের তীব্র প্রভাব ছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সাহিত্যে অন্য একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়—যা সম্পূর্ণভাবে ধর্মাবলম্বী। এক্ষেত্রে কাগাওয়া তাওহিকো ও কুরতা মমজোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাইসো যুগের সময়ও প্রকৃতিবাদ বা অনুকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

একটি জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার পরিচিতি বা সংস্কৃতি, যা সুদীর্ঘকালীন প্রতিপালিত প্রথা ও ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতির মধ্যেই সেই জাতির সমষ্টিগত সামাজিক ব্যবহার, আদর্শ, মানসিকতা এবং চিন্তা ও চেতনা প্রকাশ পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রতিবেশি দেশের সংস্কৃতির কোনো কোনো বিশেষ বিষয়ও অন্য দেশের সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই কথা জাপানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাপানের সরকারি ভাষা হলো জাপানি, যেমন 'হিরাগানা' (স্বরবর্ণ) ও কাতাকানা (ব্যাঞ্জনবর্ণ)। কিন্তু এই দুই বর্ণমালার সাহায্যে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা অনেকাংশে অসম্ভব বিধায় সমাধান হিসেবে পরবর্তীকালে চীনের বর্ণমালা 'কাঞ্জি' জাপান গ্রহণ করে। ভাষার মতো জাপানে উপভাষাও রয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুপ্রাচীন জাপানি সভ্যতা সুদীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে পৃথক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বিরাজমান ছিলো। কালক্রমে জাপানি সভ্যতা তার নিজস্ব প্রয়োজনে চীন, কোরিয়া, জার্মানি, স্পেন, ওলন্দাজ ও পর্তুগালের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৮৫৩-১৮৫৪ সালে আমেরিকার কমোডোর কলব্রেথ পেরি জাপান আক্রমণ করে সেখানে বাণিজ্যের

*Dhaka University Institutional Repository*

জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলে জাপান বিশ্ববাসীর নিকট উন্মোচিত হয়। ১৮৬৫ সালে মেইজি রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে জাপানি সরকার নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে বহু মেধাবী ছাত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নততর প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে। আগেই বলা হয়েছে, জাপানিরা খুবই অনুকরণ প্রিয়। এ সকল মেধাবী জাপানি ছাত্র বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে উৎকর্ষতার সঙ্গে যা তৈরি করে, যা বিশ্বের বাজারে সমাদৃত হয়। লক্ষ করা যায় যে, জাপানিরা তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বেশকিছু বিদেশ থেকে শিখেছে। তাই বলে একথা মনে করা কোনো ক্রমেই সমীচীন হবে না যে তাদের নিজস্ব কোনো সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিলো না। এই বিশ্বের কোনো সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব এবং কোনোভাবেই অবিমিশ্র নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত এবং একই সঙ্গে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জাপানি সভ্যতাও এই প্রবণতার ব্যতিক্রম নয় এবং সেখানকার বেশ কিছু বিষয় অনন্য উৎকর্ষতার দাবিদার।

অভিসন্দর্ভের সময়কাল ১৮৬৩-১৯৪৭। এই সময়কালের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং প্রাপ্ত গ্রন্থ ও রচনাবলীর সহায়তায় এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্তিযোগ্য সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সরকারি বিভিন্ন নথি পর্যালোচনার মাধ্যেমে অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত ছয়টি অধ্যায় রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপসংহারে উল্লেখিত ছয়টি অধ্যায়ের সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্তের বাইরেও হয়তো এ সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্য রয়েছে যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের এ বিষয়ে অধিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সহায়কগ্রন্থ

## বই

আনোয়ারহোসেন (১৯৪১), AvaywbK Rvcvb, জেনারেলপ্রিন্টার্সএন্ডপাবলিশার্সলিমিটেড, কলিকাতা

উমাকান্ত হাজারী (১৯০৫), be¨ Rvcvb I iæl-Rvcvb h‡×i msw¶ß BwZnvm, কলিকাতা

উত্তমচাঁদ (১৩৫৩), mfvlP‡›`ª i Aš—×vb Kvwnbx, কলিকাতা

চন্দ্রশেখর সেন (১৯০৭), fc©‡Ub, কলিকাতা

চারুচন্দ্র ঘোষ (১৯১৭), Rvcv‡bi DbœwZ nBj wKi‡c, কলিকাতা

দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৬), wekmsMv‡giMwZ, বেঙ্গলপাবলিশার্স, কলিকাতা

নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত (১৩০২-১৩০৩), wek‡Kvl, খণ্ড-৭, কলিকাতা

নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (১৩৪৭), eþ-cevm kirP›`ª, কলিকাতা

নরেন্দ্র নাথ সিংহ (১৯৪৪), AvaywbK Rvcvb I eËgvb h×, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা

নরেন্দ্রনাথ লাহা ও জীতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯৩০), দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক, কলকাতা

নানা দেশের নারী-চিত্র (১৮৯৯), কলিকাতা, ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ ও অন্যান্য (২০১৩), Rvcv‡bi miKvi I ivRbxwZ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ (১৩৫২), †bZvRxi Rxebx I evYx, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা

নিখিল সেন (১৯৬০), Gwkqvi mvwnZ¨, কলিকাতা

প্রবীর বিকাশ সরকার (১৪১৪), Rvbv ARvbv, দ্বিতীয় পর্ব, মানচিত্র পাবলিশার্স, ঢাকা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৩৫২), AvRv` wn›`‡`i A¼i, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২), Avš—RwZK d¨wmev` we‡ivax Av‡›`vjb I iex›`bv_, গদ্যপদ্য, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (১৯৪২), †evgvi f‡q evs&gv Z¨vM, কলিকাতা

মন্মথ নাথ ঘোষ (১৩২২), be¨ Rvcvb, কলিকাতা

মন্মথনাথ ঘোষ (১৯১০), Rvcvb cevm, দি এম্পায়ার লাইব্রেরী, কলকাতা

মানসী মুখোপাধ্যায় (১৩৫৭), we'vq egv, কলিকাতা

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৭), Rvcvbx e›'x wkwe‡i, কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স।

মণীলাল বন্দ্যোপধ্যায় (১৯১০), iæk-Rvcvb h×, কলকাতা।

মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা (১৯২৩), Rvcvb I e‡½ cjq fwgK¤ú, ময়মনসিংহ

রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (১৯৯৬), wØ‡R›' iPbvewj, দ্বিতীয় খণ্ড,কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ,তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৭),evsjv‡'‡ki 'wjj I msev'c‡Î †bZvRx mfvl, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (২০০৯), XvKv wekwe'¨vj‡qi AMwšZ BwZnvm (1921-1952), দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ঢাকা

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও সুস্নাত দাশ সম্পাদিত (২০১৬) BwZnv‡mi c‡_ c‡_ : Aa¨vcK Awbiæ× ivq m¤§vbbv MÖš, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১০), Rvcvb-hvÎx, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রসিকলাল গুপ্ত (১৯০৭), bexb Rvcvb, কলিকাতা

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯৩), wek‡Kvl, প্রথম খণ্ড, রাহুতা, কলিকাতা

শান্তিলাল রায় (১৩৫২), AvivKvb d‡›U, কলিকাতা

শাহ্নওয়াজ খান (১৯৪৬), AvRv' wn›' †dŠR I †bZvRx, নয়াদিল্লী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৩৫৩), ivó-msMÖv‡gi GK Aa¨vq, কলিকাতা

শিশির মিত্র, সম্পাদিত (১৯২২), †'k we‡'kwP‡Î I M‡í, ৪র্থ সংস্করণ, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত(১৯১৮), Zx_-mwj j, কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্

সরোজ নাথ ঘোষ (১৩৪৫), wek-bvix cMwZ, কলিকাতা

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৭), Rvcvb, কলিকাতা

সুব্রত কুমার দাস (২০১২), †mKv‡ji evsjv mvgwqKc‡Î Rvcvb, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

সুশীলকুমার বসু (১৯৪২), G h× Avgv‡'i, কলিকাতা

সরোজনলিনী দত্ত (১৯২৮), Rvcv‡b e½bvix, এম. সি, সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (১৯৮৭), e½mwnZ¨wfavb, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (১৯৯২), e½mwnZ¨wfavb, তৃতীয় খণ্ড,কলিকাতা:ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

হরিপ্রভা তাকেদা (১৯১৫), e½gwnjvi Rvcvb hvÎv, ঢাকা

Amartya Sen (1982), *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford University Press, Oxford

Bing Wang, Aya Nakamura, Makoto Suzuki (2015), *The Historical Development of Modern Fountains in Japanese Gardens*, Tokyo.

B. Pattabhi Sitaramayya (1947), *History of the Indian National Congress*, Vol. 2, (1935-1947), New Delhi

Gavan McCormack (1996), *The Emptiness of Japanese Affluence*, ME Sharpe: Armonk, New York.

I.H. Nish （1977）, *Japan's Foreign Policy, 1869-1942*, London

Inazo Nitobe (1969), *Bushido: The Soul of Japan*, Charles E. Tuttle Company, Rutland, Vermont

Isako Hirose (Translated by Susan Tyler) (1989), An Introduction to The Tale of Genji, Tokyo: University of Tokyo Press.

Isao Tomita (1999), The Tale of Genji, Viking.

Ishii Kikujiro (1936), *Diplomat Commentaries*, Johns Hopkins Press

J. Frost Dennis (2010), *Seeing Stars: Sports Celebrity, Identity, and Body Culture in Modern Japan*, Harvard University Press

J. Hall (1978), Political Thought in Japanese Historical writing from Kojiki, Ontario, Canada.

J. Ingram Bryan (1924), *Japan from Within* : An inquiry into the Political, industrial, Commercial, financial, agricultural, arnamental and educational Conditions of modern Japan, London : T. F. Unwin Ltd.

Jacquetta Hawkes (1962), Man and the Sun Gaithersburg, MD, USA, Solpub Co.

James Huffman (2010), *Japan and Imperialism, 1853-1945,* An Arbor: Association for Asian Studies Ins

Jason Ananda Josephson (2012), *The Invention of Religion in Japan*. Chicago, University of Chicago Press

Joseph Azize (2005), The Phoenician Solar Theory, NJ : Gorgias Press.

Letter from R.B. Banik, Head Clerk, Collector's Office to Khan Sahib B. Rahman (1942), Sub-divisional Officer, Patuakhali. 25 December, *F.O. Bell Papers: Additional Papers. MSS. Eur. D733/40. India Office Library, London* (Currently the British Library).

Letter from the Consul of Japan to the Magistarte of Chittagong (1956), 3 March, Government of East Pakistan, B-Proceedings, Department of Home (Political), *Bangladesh National Archives*, Bundle No. 153, July, 1957, Proceedings Nos. 84-95

Lewis Sydney Steward O'malley (1914), *Bengal District Gazetteers, Murshidabad*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta

Matthew Calbraith Perry (1856), *Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan*, New York.

Michele Marra (1993), Representations of Power : Literary Politics of Mediaval Japan, University of Hawaii, USA.

Moshe Yegar (1972), *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group*, Otto Harrassowitz, Wiesbaden

Murasaki Shikibu (Translated by Kencho Suematsu) (2000), The Tale of Genji, Tokyo : Tuttle Publishing

*Dhaka University Institutional Repository*

Nalini Ranjan Chakravarti (1971), *Indian Minority in Burma: The Rise and Decline of an Immigrant Community*, (London: Oxford University Press)

Nandalal Chatterjee (1962), ‘Netaji Subhash Chandra Bose and India’s Struggle for Freedom’, *Journal of Indian History*, Vol. 40, April

P. Ebrey, A, Walthall and J. Palias (2006), *Modern East Asia: A Cultural, Social, & Political History*, New York

Samuel Mossman (1880), *Japan*, Sampson Low, London

Secret Letter from District Magistrate of Barisal to G.H. Mannoach, Inspector General of Police, Bengal, Calcutta (1942), 30 December, *F.O. Bell Papers: Additional Papers. MSS. Eur. D733/40. India Office Library, London* (Currently the British Library).

Stephen P. Cohen (1963-64), ‘Subhas Chandra Bose and Indian National Army”, *Pacific Affairs*, Vol. 36, (Winter)

Sumit Sarkar (1959), *Modern India*, 1885-1947, Macmillan India Limited, Delhi

*The Oxford Companion to World War II* (2002), British Commonwealth, London: Oxford University Press

The Statesman, 22 December, 1942. The Statesman: An Anthology, (compiled by Niranjan Majumder, (Calcutta: The Statesman, 1975), p. 480.

Walter Theimer (1950), *Encyclopedia of World Politics*, London Faber and Faber Limited, London

William Tylor Olcott (1914/2003), Sun Lore of All Ages: A Collection of Mythes and Legends Concerning the Sun and its worship, Adamant Media Corporation.

Yuichiro Atsushi, *Japanese Cockroach*, Tokyo, 1971.

প্রবন্ধ

অবনীকুমার দে (১৩৩১), ‘ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতি-বৃদ্ধি’,gvbmx I g¤§evYx, শ্রাবণ

অকিঞ্চন দাস (১৩২২), ‘জাপানী জাতির বিশেষত্ব’, be¨fviZ, মাঘ

আর. কিমুরা (১৩২৯), ‘জাপানের সামাজিক প্রথা: খাদ্যদ্রব্য’, e½evYx, ভাদ্র

*Dhaka University Institutional Repository*

কালীচরণ (১৩৪২), 'জাপানীকবিনোগুচি', wewPÎv, অগ্রহায়ণ

ক্ষিতিনাথ সুর (১৩৩৮), 'আধুনিক জাপানের সমাজ', wewPÎv, জৈষ্ঠ্য

ক্ষিতিনাথ সুর (১৩৩৮), 'আধুনিক জাপানের সমাজ', wewPÎv, জ্যৈষ্ঠ

চন্দন সান্যাল (২০১৫), 'অভিনেতা চিন্ময় রায়ের খোলা খাতা', ˆ`wbK †óUmg¨vb, ৮ আগস্ট

জগদ্ধাত্রীকুমারবন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৩৭), 'জাপানেরকথা-শিল্পীওকথা-সাহিত্য', wewPÎv, মাঘ

'জাপানী কুকুর' (১২৮১), evgv‡ewabx cwÎKv, মাঘ ও ফাল্‌গুন

জাপানী ছেলেমেয়ের খেলা ও খেলনা (১৩২২), পঞ্চশস্য, cevmx, কার্তিক

'জাপানের ব্যবসায় বৃদ্ধি' (১৩৩২), cevmx, জ্যৈষ্ঠ

'জাপানী কাপড় ও বিলাতী কাপড়'(১৩৩৯), বিবিধ প্রসঙ্গ, cevmx, আশ্বিন

ÔRvcvb-gwnjvi mvgwRK Ae¯'vÕ(১৩১৫), fviZ gwnjv, চৈত্র

'জাপানের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়'( ১৩১৫), ভারত মহিলা, ভাদ্র

জাপানের সংবাদপত্র (১৩২৮), e½xq gmjgvb mvwnZ¨ cwÎKv

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৫), 'আধুনিক জাপান : পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার', fviZx, জ্যৈষ্ঠ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৫), 'আধুনিক জাপান : শিল্পকলা ও নাট্যাভিনয়' (ফরাসী লেখক লে ফেলেসিঁয়ার অনুবাদ), fviZx, শ্রাবণ

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩১৩), Rvcv‡bi Af¨'q, নব্য ভারত, ২৪ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৯), 'চল্‌তি ইতিহাসঃ সুদূর প্রাচী ও ভারতবর্ষ', fviZel, অগ্রহায়ণ

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪৬), 'জাপানে নারী জাগরণ', Rqkx, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫), 'আধুনিক জাপান (ফরাসী হইতে): বলসঞ্চয় ও আত্মরক্ষণের চেষ্টা', fviZx, আশ্বিন

†`k (১৯৪২), বিজ্ঞাপনের পাতা, ২০ জুন

ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৩৪৫), 'জাপানীকবিতা', cwiPq, ভাদ্র

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৪৯), 'কোরিয়ায় জাপানের নীতি', fviZel, ভাদ্র

নরেন্দ্র দেব (১৩৪৯), 'কলিকাতার চিঠি', fviZel, ৩০ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন

পরিব্রাজক, জাপানের পত্র, mwwnZ¨, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

'পল্লীগ্রামে বাড়ি ভাড়া' (১৩৪৯), সাময়িকী (সচিত্র), fviZel, আষাড়

পারুল দেবী (১৩৪২), 'জাপানে কয়েক দিন', cevmx, শ্রাবণ

পি. সি. সরকার (১৩৪৫), 'জাপানের সংবাদপত্রবাহী কবুতর', ceËK, জ্যৈষ্ঠ

পি. সি. সরকার (১৩৪৫), 'জাপানের পথে, fviZel, আষাঢ়

cevmx(১৩৩০), বৈশাখ,কলিকাতা

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (১৩৩৪), কো-বা-দাইশি ও কোইয়াসান্ আশ্রম, cevmx, কার্তিক

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী (১৩৩৪), কোইয়া-সানের যাত্রী, cevmx, আশ্বিন

'বস্ত্র সমস্যা' (১৩৪৯), সাময়িকী (সচিত্র), fviZel, আষাঢ়

ভূপতি চৌধুরী (১৩৪৯), 'সমস্যার স্বরূপ', fviZel, অগ্রহায়ণ

মন্মথনাথ ঘোষ(১৩১৯), 'জাপানের ধর্ম্ম', gvbmx, চৈত্র

মন্মথনাথ ঘোষ(১৩২০), 'জাপানের ধর্ম্ম', gvbmx, জ্যৈষ্ঠ

মন্মথনাথ সিংহ (১৮৯৮), 'জাপান কাহিনীঃ জাপানীদের কয়েকটি দেশাচার', evgv‡ewabx cwÎKv, সেপ্টেম্বর

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৩২০), 'জাপানের ঝরনা', fviZx, শ্রাবণ

মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৩৩০), 'জাপানী আর্টের যৎকিনিচত', fviZel, চৈত্র

যতীন্দ্রনাথ সোম (১৩২৩), 'জাপানের অন্তর্দ্দেশীয় সাগর', A"Pbv, পৌষ

যদুনাথ সরকার (১৩১৩), 'জাপানের অভ্যুদয়' (শিক্ষা), fviZx, ফাল্গুন

যদুনাথ সরকার (১৩১৩), 'জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য', fviZx, ভাদ্র

*Dhaka University Institutional Repository*

যদুনাথ সরকার (১৩১৪), ‘নীপনীসমাজ’, fviZx, আষাঢ়

যদুনাথ সরকার (১৩১৭), ‘জাপানের সহর’, fviZx, ৩৪ বর্ষ, অষ্টম সংখা, অগ্রহায়ণ

যদুনাথ সরকার (১৩১৭), ‘জাপানে ভিক্ষুক’, fviZx, ৩৪ বর্ষ, বৈশাখ

যদুনাথ সরকার (১৩১৮), ‘জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি’, fviZx, বৈশাখ

যদুনাথ সরকার (১৩১৯), ‘জাপানের রেল ও ট্রাম’, fviZx, ফাল্গুন, কলিকাতা

যদুনাথ সরকার (১৩১৯), ‘ভারতের সহিত জাপানের সম্বন্ধ’, fviZx, ৩৬ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ

যদুনাথ সরকার (১৩২০), ‘দাইতোকোরো’, ভারতী, মাঘ

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৬), ‘বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন : প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮)’, evsjv‡`k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩৬), ধ্যানী জাপান, cevmx

রসিকলাল গুপ্ত (১৩১১), ‘জাপান সম্বন্ধে ক-একটি কথা’, দ্বিতীয় প্রস্তাব, evÜe, জ্যৈষ্ঠ

লোপামুদ্রা মালেক (২০১২), সিদ্ধম লিপির ইতিবৃত্ত, AvaybK fvlv Bbw÷wUDU cwÎKv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ২৩, ফেব্রুয়ারি

শান্তা দেবী (১৩৪৫), ‘জাপান ভ্রমণ’, cevmx, বৈশাখ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩১৫), ‘জাপানিকবিতা’, mwnZ¨, ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ

সুরেন্দ্রনাথমৈত্র (১৩৪২), ‘জাপানীকবিতায়জোনাকী’, fviZel,পৌষ

সুরেন্দ্রনাথমৈত্র(১৩৪২), ‘জাপানী-পঞ্চাশিকা’, wewPÎv, অগ্রহায়ণ

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৭), ‘ইকেবানা’, fviZx, কার্তিক

বাংলা সংবাদপত্রঃ

চীন-জাপান মহাযুদ্ধ (১৮৯৪), XvKv cKvk, ৫ আগষ্ট।

রুষ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৩), ঢাকা প্রকাশ, ১৭ এপ্রিল; ১২ জুন; ১০ জুলাই; ৭ আগষ্ট; ৪ সেপ্টেম্বর; ৯ অক্টোবর; ৭ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর; ১১ ডিসেম্বর; ১৮ ডিসেম্বর;

রুষ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫), ঢাকা প্রকাশ, ১ জানুয়ারি; ২৯ জানুয়ারি; ৫ মার্চ; ১৬ এপ্রিল; ১৪ মে; ৯ জুলাই; ২৭ জুলাই;

ইংরেজি প্রবন্ধঃ

Awazuhara Atsushi (2001), 'Perceptions of Ambiguous Reality—Life, Death and Beauty in Sakura', *Japanese Religions*, Vol. 32 (1 & 2)

'Axis Says British Leaving Chittagong' (1943), *Tweed Daily* (Murwillumbah, (NSW (1914-1954), Monday, 24 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article194674613.

'Bombs on India: Stroke at Chittagong' (1943), 30 May, *The West Australlian* (Perth. WA: (1842-1954), Monday, 31 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article46758101.

'British Force Goes into Burma: Japanese Fall Back' (1942), *The Sydney Morning Herald*, (NSW: 1842-1954), Monday, 21 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article17815897.

'Calcutta Air Raid' (1942), 21 December, 1942. *The Sydney Morning Herald*, (NSW: (1842-1954), Monday, 22 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article175821537.)

'Chittagong Evacuated: Japanese Claim' (1943), *Daily Mercury* (Mackey, Qld (1906-1954), Monday, 24 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article170876105.

*Far Eastern Economic Review* (1978), July 14

Harold Coward (1990), 'Book Review: In Search of Self in India and Japan: Towards a Cross-Cultural Psychology', *Journal of Hindu-Christian Studies*, Vol. 3

Ilse Lenz (2006), 'From Mothers of the Nation to Global Civil Society: The Changing Role of the Japanese Women's Movement in Globalization', *Social Science Japan*, Vol. 9No.1

*Dhaka University Institutional Repository*

‘Japanese Bomb Chittagong Area’ (1942), *Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate* (NSW: 1876-1954), Thursday, 17 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article132816251.

‘Japanese Raid Chittagong–Stung by Allied Bombing’ (1942), *The Sydney Morning Herald*, 14 December, National Library of Australia. http://nla.gov.au/nla.news-article17799625.

J. Charles Schencking (1920), "The Great Kanto Earthquake and the Culture of Catastrophe and Reconstruction in Japan", *Journal of Japanese Studies*, Vol. 34 No.2.

M. Ashikari (2003), ‘The Memory of the Women’s White Faces: Japanese and the Ideal Image of Women’. *Japan Forum*, Vol. 15, No. 1

‘New Raids on Chittagong’ (1942), *Examiner* (Launceston Tas: 1900-1954), Thursday, 17 December, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article91502398.

‘Troops Approaching is Japanese Claim’ (1942), *Morning Bulletin* (Rockhampton, Qld: 1878-1954), Saterday, 16 May, National Library of Australia, http://nla.gov.au/nla.news-article56118456

Vishwanath Prasad Varma (1960), ‘The Political Philosophy of Subhas Chandra Bose’, *Calcutta Review*, Vol. 157, October

Wedgwood Benn (1939), ‘The War and India’s Freedom’ *Contemporary Review*, Vol. 156, December

Yamano Katsuji, Komine Yukio (2006), *Bunkazai no Shiroari Higai to Bojo Taisaku no Genjo* [Harmful Insects and Damage to Cultural Properties], Bunkazai no Chu-kin Gai to Bojo no Kisochishiki [Encyclopedia of Insect and Mould Damage to Cultural Properties and their Control Measures], *Japan Institute of Insect Damage to Cultural Properties*, Vol. 52.

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিভাষাকোষ

| | |
|---|---|
| আইনু | জাপানের আদিবাসী জনগোষ্ঠী |
| আফোজা | বৃহৎ আকৃতির মুক্তা |
| আমাকুসা | টোকিও সংলগ্ন জাপানের একটি অঞ্চল |
| আমাতেরাসু ওমিকামি | জাপানের সূর্যদেবী |
| আসা গোহান | প্রাতঃরাশ |
| আসুকা | ৫৩৮-৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের মেইজি শাসনামলের একটি সময়কাল |
| ইউকাতা | গরমের দিনের কিমোনো |
| ইকেবানা | ফুল-সজ্জা |
| ইজানাগি | সূর্যদেবীর আশির্বাদধন্য দেবতা |
| ইতামেমনো | তাড়াতাড়ি সিদ্ধ খাবার |
| ইশিকেরি | পাথরে লাফ দেয়া |
| ইয়াকিউ | এক প্রকার জাপানি মাছ |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| ইয়াকিনিকু | পাশ্চাত্যের বারবিকিউ |
| ইয়াকিমনো | ঝলসানো ও ভাজা খাবার |
| ইয়ামতো | জাপানিদের পূর্বপুরুষ |
| ইয়েন | জাপানি মুদ্রা |
| উচিকাকে | জাপানের অভিজাত শ্রেণির কিমোনো |
| উদেগুনী | এক প্রকার জাপানি খেলা |
| উমি | সমুদ্র |
| উরমিউরি | পড়া ও বিক্রি করা |
| এইমনো | বিভিন্ন ‘সস্’ বা ‘আখনি’ দিয়ে তৈরি খাবার |
| এগেমনো | ভালোভাবে ভাজা খাবার |
| ওকিনি | স্থানীয়ভাবে বহু ওসাকাবাসীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন |
| ওচা | এক প্রকার জাপানি রঙ চা |
| ওজেন | ভাত খাবার চৌকি |
| ওতোদেমে | চুপ |
| ওবি | কোমড়বন্ধ যা কিমোনোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ |
| ওমেদেত | সুসংবাদ |
| ওশাবুরি | ঝুমঝুমি বাঁশী |
| ওসিবুন | বড় আকারের সংবাদপত্র |
| ওসোজি | পুলিশের তত্ত্বধানে পাড়ার সকল বাড়ি পরিস্কার করার ব্যবস্থা |
| ওয়াফুকো | সমষ্টিগতভাবে জাপানের পোষাক |
| কাক্রেস্ত | লুকোচুরি খেলা |
| কফুন | ২৫০-৬৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ঐতিহাসিক সময়কাল |
| কাতারিবি | প্রাচীন জাপানি মৌখিক ভাষা |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| কামাকুরা | জাপানের একটি রাজত্বকাল |
| কামি | ঐশ্বরিকদেবতা |
| কিউবো/কিউবো সোমা | জাপান সম্রাটের প্রাচীন উপাধি |
| কিওসু/কিউসিউ | জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপের একটি |
| কিমোনো/ইউকাতা | জাপানি মেয়েদে ঐতিহ্যবাহী পোষাক |
| কুবিহিকি | গলা টানাটানি |
| কুমিতরি বেন্‌জো | প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক প্রকার জাপানি সার |
| কেইকেন | জাপানি নারীদের আত্মরক্ষার জন্য ক্ষুদ্র তরবারি |
| কেসা-গোজেন | সকাল বা দিবসের প্রথম ভাগ |
| কৈনাতাম্মা | মুক্তা |
| কোকুগাকু | নব্য-কনফুসিয়াসবাদ |
| কোজিকি | প্রাচীন বিষয়ের দলিল |
| কোতো | এক প্রকার জাপানি বাদ্যযন্ত্র |
| কোমা | লাটিম খেলা |
| কোরো-পক-গুরু | জাপানের অবলুপ্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী |
| কোশিহিকারি | জাপানের এক প্রকার ধান |
| কোসিবুন | ছোট আকারের সংবাদপত্র |
| কোহাটজুকৈ | জাপানের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য গঠিত সমিতি |
| গাসিমি | কাঁচা মাছের টুকরা |
| গেইসা | বাঈজি |
| গোকিবুড়ি | আরশোলা |
| গেতা | জুতা |
| চি | পৃথিবী |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| চ্যোচীন | বিশেষ বিশষ উপলক্ষে রাস্তায় জাপানিদের মিছিল |
| ছাসিমি/সাসিমি | কাঁচা মাছের টুকরো |
| ছিন্‌মি | সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত খাবার |
| জাপোনিকা | জাপানের এক প্রকার ধান |
| জামাকাটাগো | এক প্রকার জাপানি সাপ |
| জিন | মানুষ |
| জিন্‌-রিক্সা | মানুষ চালিত দু'চাকার গাড়ি |
| জিসাস | নর্তকি |
| জুমন/ইয়াঐ | ৬০০০ বছর পূর্বে জাপানে স্বল্প পরিসরে আউশ ধান চাষের সময়কাল |
| জেনরোইন | ১৮৭৫ সালে জাপান সম্রাট কর্তৃক আয়োজিত সভা |
| টাবি | জাপানি পুরুষ ও নারীর ব্যবহৃত চামড়ার তৈরি এক প্রকার জুতো |
| টেম্পুরা | সামুদ্রিক খাদ্য সঞ্জীর সঙ্গে মিশিয়ে কিছুটা মাখন দিয়ে ভাজা খাদ্য |
| টুকেমন | এক প্রকার জাপানি আঁচার |
| ডায়েট | জাপানের পার্লামেন্ট |
| তকারকৈ | শামুক |
| তনকা/ওয়াকা | এক প্রকার জাপানি ক্ষুদ্র কাব্য |
| তাইরা | হেইয়ান শাসনামলে জাপানের একটি রাজনৈতিক গোত্র |
| তাচিবানা | হেইয়ান শাসনামলে জাপানের একটি রাজনৈতিক গোত্র |
| তামামি | মাদুর |
| তাতামী | জাপানি পাটি |
| তিতাকাজ্য | এক প্রকার জাপানি সাপ |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| তেই | এক প্রকার জাপানি মাছ |
| তেদামা | লাল শিম-ভরা থলে |
| তেন | স্বর্গ |
| তেন্‌জিকু | স্বর্গ |
| তেন্‌জিকু জিন | স্বর্গবাসী |
| তোগোমা | একপ্রকার লাটিম |
| তোমেসোদে | জাপানি বিবাহিতা যুবতীর কিমোনো |
| দাইতোকোরো | রান্নাঘর |
| দাইমিও | বড় প্রদেশের শাসনকর্তা ও উচ্চ উপাধিধারি ব্যক্তি |
| দৈরি | প্রধান ধর্মযাজক |
| দোজা | এক প্রকারজা পানি সাপ |
| দোতুস | উঁইপোকা |
| দোবিন্য | চিনা মাটির কেট্‌লি |
| নমিমোসাউকাউলি | জাপান সম্রাজ্ঞীর সমাধিতে জীবিত মানুষের পরিবর্তে মাটির মুর্তি সমাহিত করার রীতির উদ্ভাবক |
| নাগানো | রেশম উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল |
| নাগিনাতা | নারীর আত্মরক্ষার জন্য তরবারি চালনার কৌশল |
| নাগোইয়া | বস্ত্রবয়ন ও ঘড়ি তৈরীর স্থান |
| নারা | ৭১০-৭৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের মেইজি শাসনামলের একটি সময়কাল |
| নিপ্পন /নিহন | সূর্যের উৎপত্তি |
| নিমনো | কোনো প্রকার রসের মধ্যে সিদ্ধ বা ফোটানো খাবার |
| নো | জাপানি ধ্রুপদী নাটক |
| ফিনকারি | এক প্রকার জাপানি সাপ |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| ফুরিসোদে | জাপানি অবিবাহিতা যুবতীর কিমোনো |
| ফুজিওয়ারা | হেইয়ান শাসনামলে জাপানের একটি রাজনৈতিক গোত্র |
| বক | এক প্রকার জাপানি কুমির |
| বান গোহান | নৈশভোজ |
| বিসামন | কুবের |
| বেনজাইতেন | জাপানি সরস্বতী দেবী |
| বুশিদো | জাপানি যোদ্ধাশ্রেণীর জীবনাচরণ |
| মকুদ | খাবারের ঘর |
| মনিওসু | জাপানের শ্রেষ্ঠ আদি কাব্যের সংকলন |
| মাকুজু কোয়াসান | একটি বৌদ্ধ মন্দির |
| মিকাডো | জিম্মুতেন্নো বংশের সম্রাটের উপাধি |
| মিনামতো | হেইয়ান শাসনামলে জাপানের একটি রাজনৈতিক গোত্র |
| মুবিসুমো | আঙ্গুলের লড়াই |
| মিমিহিকি | কান টানাটানি |
| মিয়াকো | রাজধানী |
| মিসেসিরু | এক প্রকার জাপানি স্যুপ |
| মুশিমনো | সিদ্ধ খাবার |
| মুসুকিও | নাস্তিক |
| মুক্ষি | এক প্রকার জাপানি কুমির |
| মেইজি সময়কাল | ৫৩৮-১১৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের রাজনৈতিক |
| মোজী | অক্ষর |
| শফু | সহজ পদ্ধতিতে হাইকু রচনার রীতি |
| শিন্তো | জাপানের নিজস্ব ধর্ম |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| শিককু | জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপের একটি |
| শিচিরিণ | জাপানি ক্ষুদ্র মাটির চুলা |
| শিরোইতে | সাদা হাত |
| শেতোমনো | চীনামাটি |
| শোগুন | ১৬০৩-১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তোকুগাওয়া বংশীয় শাসকদের উপাধি |
| সর | এক প্রকার জাপানি মদ |
| সাকাই | রাগকম্বল, টুপি, চিকিৎসার দ্রব্যাদি ও লোহার জিনিস তৈরীর স্থান |
| সাকাজুকি | মদ্যপান করার পাত্র |
| সাকে | চাল দিয়ে প্রস্তুতকৃত এক প্রকার জাপানি মদ |
| সামিসেন | এক প্রকার জাপানি বাদ্যযন্ত্র |
| সামুরাই | জাপানের যোদ্ধা শ্রেণী |
| সিওমিও | ছোট প্রদেশের শাসনকর্তা |
| সিন্‌জু | শিন্তো ধর্মাবলম্বী |
| সিনবুন | সংবাদপত্র |
| সুইমনো বা শিরুমনো | এক ধরনের স্যুপ |
| সুকিও | ধর্ম |
| সুকেমনো | এক প্রকার জাপানি আচার |
| সুন | মৌসুমী খাবার |
| সুনামী | ব্যাপক বিধ্বংসী ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস |
| সুনোমনো | অমলরসাত্মক খাবার |
| সুমো | এক প্রকার জাপানি খেলা |
| সেসাবো | জাপানের রণতরীর প্রধান আশ্রয়স্থল |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | |
|---|---|
| সুসি/সাসিমি | সামুদ্রিক মাছ কাঁচা বা পুড়িয়ে তৈরী খাদ্য |
| হন্ডো/হন্তো | সত্যি |
| হন্‌শু | জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপের একটি |
| হয়োগো | ধর্মীয় আচার পালনের ভাষা |
| হাইকারা | কেতাদুরস্ত নারী |
| হাইকু/ হোক্কু | এক প্রকার জাপানি কাব্য |
| হাকামা | ঢিলা পায়জামা |
| হাজাকুরে/হাগাকুরে | সামুরাইদের অন্য নাম |
| হাজি | জাপান সম্রাজ্ঞীর সমাধিতে জীবিত মানুষের পরিবর্তে মাটির মুর্তি সমাহিত করার রীতির উদ্ভাবককে সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি |
| হারিকিরি | আত্মহত্যা |
| হাসি | খাবারের জন্য ব্যবহৃত কাঠের তৈরী কাঠি |
| হিতোতোবি | কাবাডি বা হাডুডুডুর ন্যায় খেলা |
| হিরো গোহান | দুপুরের খাবার |
| হেইয়ান | ৭৯৪-১১৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের মেইজি শাসনামলের সময়কাল |
| হোক্কাইডো | জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপের একটি |
| হোতারু | জোনাকি |

*Dhaka University Institutional Repository*

## পরিশিষ্ট- ১

## জাপান ও বঙ্গে প্রলয় ও ভূমিকম্প

মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা

ধন্য ধন্য জগদীশ মহিমা তোমার,
পলকে মারিতে পার পলকে নিস্তার।
অনাদি অনন্ত প্রভূ তোমার মহিমা,
মহাজ্ঞানী যোগী ঋষি নাহি পায় সীমা।
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের আধার,
সত্ত্ব গুণে সৃজিয়াছ বিভু এ সংসার।
রজোগুণে ০০ বিধি রক্ষ ঃ যক্ষ নরে,
তমোতে বিনাশ কর লীলা, খেলা করে।
স্বজাতি জীবের কোথা হলে বিড়ম্বনা,
স্বভাবতঃ হৃদে জন্মে বিষম যাতনা।
সহ অনুভূতি কিম্বা - সম বেদনা,
মর্ম্মান্তিক ব্যথা হয় কাঁদে রসনায়।
তাই আজ জাপানের হেরি দূর্ঘটনা,
সকল সমীহে চাই করিতে রটনা।
বাণিজ্য বিজ্ঞানে শিল্পে লভি শীর্ষস্থল,
কোথায় জাপান আজ গেল রসাতল।
ভৌগলিক বিচিত্রতা করি নিরীক্ষণ,
জাপানে আগ্নেয়গিরি পাই নিদর্শন।
‘ফিজিসান’ নামে এক আগ্নেয় ভূধর,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে এক অগ্নি নিরন্তর।
জ্বলিত করিয়া কভূ অগ্নি উদগীরণ,
পাঠাত অসংখ্য জীবে শমন ভবন।
১লা সেপ্টেম্বরের একক ঘটিকা,
তখন উঠিল এক প্রবল ঝটিকা।
উক্ত গিরি চতুপার্শ ত্রিংশ ক্রোশ ব্যাপী,
অকস্মাৎ ভূমি বেগে উঠিলেক কাপি।
আরম্ভিল মহা এক ভীষণ কম্পন,
একাধারে ঝড় বৃষ্টি না যায় সহন।
পলাবার স্থান নাই শব্দ হাহাকার,
তদুপরি গিরি অগ্নি জ্বলি অনিবার।
অগণিত লোক মরে হয়ে স্তুপিকৃত,
'ইকুমা' নগর হল অগ্নিভস্মীভূত।
দু'একজন পলাইয়া যদ্যপি জীবিত,
তাহারে জাহাজে আছে হয়ে নিরাশ্রিত।
বিনষ্ট হইল রেল ছিড়ে গেল তার,
নগর আগুনময় জীব নাই আর।
দেড় ঘন্টা অবিরাম এমত প্রলয়,
লন্ড ভন্ড চুরমার করি লোকালয়।
সমুদ্রে অবজ্ঞা করি বহু রণ তরী,
ডুবীল অতল জলে উত্তেজিত বারি।
কোথাও চলিত গাড়ী আরোহীর সহ,
বিচূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে ত্যাজিয়াছে দেহ।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

ব্যোম জানে এরোপ্লানে আরোহণ করি,
কেহবা উপরে উঠে ভগবান স্মরি।
কিন্তু ভাই, সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান,
অনন্ত অসীম বটে বিধির বিধান।
অগ্নিতাপে অবিলম্বে নিয়তি আহ্বানে,
পরিল আরোহীসহ গিরি হুতাশনে।
'ওসেকা', 'সেন্দাই' মধ্যে করিল প্রলয়।
'আসাকুল' মহাদূর্গ হইয়া পতন,
তখন উঠিল এক প্রবল ঝটিকা।
উক্ত গিরি চতুষ্পার্শে ত্রিংশ ক্রোশ ব্যাপী,
অকস্মাৎ ভূমি বেগে উঠিলেক কাপি।
আরম্ভিল মহা এক ভীষণ কম্পন,
একাধারে ঝড় বৃষ্টি না যায় সহন।
পলাবার স্থান নাই শব্দ হাহাকার,
তদুপরি গিরি অগ্নি জ্বলি অনিবার।
অগণিত লোক মরে হয়ে স্তুপিকৃত,
'ইকুমা' নগর হল অগ্নিভস্মীভূত।
দু'একজন পলাইয়া যদ্যপি জীবিত,
তাহারে জাহাজে আছে হয়ে নিরাশ্রিত।
বিনষ্ট হইল রেল ছিড়ে গেল তার,
নগর আগুনময় জীব নাই আর।
দেড় ঘন্টা অবিরাম এমত প্রলয়,
লন্ড ভন্ড চুরমার করি লোকালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রে অবজ্ঞা করি বহু রণ তরী,

ডুবীল অতল জলে উত্তেজিত বারি।

কোথাও চলিত গাড়ী আরোহীর সহ,

বিচূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে ত্যাজিয়াছে দেহ।

ব্যোম জানে এরোপ্লানে আরোহণ করি,

কেহবা উপরে উঠে ভগবান স্মরি।

কিন্তু ভাই, সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান,

অনন্ত অসীম বটে বিধির বিধান।

অগ্নিতাপে অবিলম্বে নিয়তি আহ্বানে,

পরিল আরোহীসহ গিরি হুতাশনে।

তিনশ মাইল স্থান হয়ে অগ্নিময়,

'ওসেকা' 'সেন্দাই' মধ্যে করিল প্রলয়।

'আসাকুল' মহাদূর্গ হইয়া পতন,

সপ্তশতাধিক করে মৃত্যু সংঘটন।

রেলের সুড়ঙ্গ এক হইয়া পতিত,

ছয় শত লোক হইল কাল কবলিত।

সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ হইল নিহত,

অগণ্য অসংখ্য অসংখ্য লোক হইল আহত।

তমোগুণে বিধি সব করিয়া সংহার,

রজোগুণে রক্ষা করে রাজ পরিবার।

মন্ত্রিবর 'ইউ আমা' বাঁচে পূণ্য ফলে,

বিপন্ন বিনষ্ট হল অমাত্য সকলে।

অতঃপর রাজধানী হবে স্থানান্তর,

Dhaka University Institutional Repository

কিউটা বা ওসেকেতে বার্ত্তা পরম্পর।
কলিকাতা আমেরিকা বৈজ্ঞানিক দল,
যন্ত্র চক্ষে জাপানের দুর্দ্দশা সকল।
যথাকালে হেরিলেক, আশ্চর্য্য বিজ্ঞান,
'সুসমগ্রাফ' যন্ত্র হয় তাহার নিদান।
যন্ত্র যোগে সব পার বৈজ্ঞানিক দল,
জলে স্থলে ব্যোম পথে অতি মহাবল।
গসীম বিজ্ঞান বল কি করিতে পারে,
ঐশী শক্তি অনুকূল না হইলে পরে।
অটুট অক্ষয় জান বিধির বিধান,
মহা বৈজ্ঞানিক সেই, সেই মহাজ্ঞান।
জ্ঞান বিদ্যা বিজ্ঞানেতে যতই গর্ব্বিত,
ডবধির অসীম জ্ঞানে আবদ্ধ নিয়ত।
ঈশ্বরে অস্তিত্ব আর ভকতি বিশ্বাস,
যার নাই সেই হবে সমূলে বিনাশ।
পার্থিব বিজ্ঞান জ্ঞান নব্য আবিষ্কার,
ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন নিতান্ত অসার।
অধিক পান্ডিত্য লাভে উচ্চ বৈজ্ঞানিক,
স্রষ্টার অস্তিত্ব মনে ভাবয়ে অলীক।
শিক্ষার সীমানা কেহ করি অতিক্রম,
বিধির বিধানে হেরে নানা ব্যতিক্রম।
তখনি তামস রূপে হইয়া নির্দ্দয়,
নির্ম্মম হইয়া বিধি করেন প্রলয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

হেরিলে শুনিলে কোথা অপমৃত্যু শব,

বৃথা সন্তাপিত হই অবোধ মানব।

যা করে ঈশ্বর সব মঙ্গলের তরে,

মহান্ উদ্দেশ্য তার কি বুঝিবেক নরে।

খাদ্যাভাব, স্থানাভাব, কিম্বা কি কারণে,

সৃজিলা প্রলয় লীলা বুঝিব কেমনে।

তাঁহার মহৎ কার্য্য, উদ্দেশ্য মহান,

ধন্য ধন্য জগদীশ, তোমার বিধান।

উৎস: মৌলবী আবদুল আমিন ভূঞা, জাপান ও বঙ্গে প্রলয় ভূমিকম্প, ময়মনসিংহ, ১৯২৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট- ২

## অনুশোচনা

(পোর্ট-আর্থার-বিজয়ী জেনারেল নোগি বিরচিত)

ঘুসির বদলে ঘুসি দিতে গেল
যুদ্ধে জাপানী সেনা,
ময়দানে আর কেল্লায় হ'ল
গোলাগুলি লেনা দেনা;
বিজয়ী জাপান; তবু জয়গান
গাহে না তেমন কেহ,
ভরি ময়দান পাহাড়-প্রমাণ
পড়ে' আছে মৃতদেহ।
শুধু মৃতদেহ,- শুধু মুমূর্ষু-
পাহাড়-প্রমাণ দুখ;
পাহাড়-সমাণ দুঃখের ভারে
ভেঙেছে আমার বুক।
ভাবিতেছি শুধু স্বদেশে ফিরিয়া
মন যে কেমন হবে;-
ফিরিল না যারা তাদের বারতা
সকলে সুধাবে যবে!
দুখে দুখে যারা দিন কাটায়েছে
পাকায়েছে চুল-দাড়ি;-

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

ক্ষীন আশা লয়ে আছে পথ চেয়ে,-

তারা এসে তাড়াতাড়ি

সুধালে বারতা, - কী দিব জবাব?

গেছে - সব গেছে মারা,

কেল্লা যাহারা করিল দখল কেউ ফেরে নাই তারা।

– সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, †cvU-Av_v‡ii ÿav, কলিকাতা, ১৯৩২।

*Dhaka University Institutional Repository*

## পরিশিষ্ট- ৩

### কলিকাতার চিঠি

(১৯৪৩)

শ্রী নরেন্দ্র দেব

প্রিয়বরেষু -

পঞ্চ-নদের মঞ্চ আড়ালে রয়েছ ফুল্ল-চিত্ত
'দেউলে' দাদার বিজয়ার চিঠি যেথা দেওয়ালীতে।
লা-হো-র এখন আনন্দে ভোর, এখানে 'লা-মিজারেল'-
শুরু হয়ে গেছে শহরে বাইরে ভানুমতী বাজী খেল্।
জবাব তোমার এসেছিল বটে বড়দিন ঘেঁষে হাতে
আমরা তখন বোমার হিড়িকে জেগে থাকি রোজ রাতে।
হয়ত' বসেছি সবে খেতে রাতে, বেজেছে মাত্র ন'টা
হঠাৎ ডুকরে ওঠে 'সাইরেণ্', পাড়ায় যেখানে য'টা।
বন্ধ করিয়া আহার - পর্ব উঠে পড়ি এঁটো হাতে,
পত্নী বলেন - ওকি! বোসো, সবই যে রইল পাতে।
মুখের গ্রাস কি ফেলে উঠে কেউ? এাথা খাও, খেয়ে নাও
বাজুক্ গে বাঁশী! ফাঁসি দেবে নাকি? মিছে কেন ভয় পাও?
খাঁদা বেটাদের মুখ্যে আগুন, অসময়ে উড়ে আসে
খেতেও দেবে না পোড়ার মুখোরা! থাকবো কি উপবাসে?
আমি বলি - 'দ্যাখো, আর না এখানে; রেখে আসি চলো দেশে,
গতিক ভাল না, কি জানি কি হয় -' পত্নী বলেন হেসে
'যেতে পারি যদি তুমি যাও তবে, নচেৎ নড়ছি না কো।

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

দেশে গিয়ে আমি মরব কি ভেবে তুমি যদি হেতা থাকো?
গিয়ে গেল-বারে যা-ভোগা ভুগেছি, ভুলে গেছ বুঝি? ওমা।
মরি বাঁচি আমি নড়ছিনি আর হাজার পড়ুক বোমা।
রেডিয়োতে যেই শোনাবে খবর শত্রু বিমান এসে
ফেলে গেছে কিছু সামান্য বোমা শহরের কোন ঘেঁষে।
কিংবা সকালে কাগজ খুলেই পড়িব চখের জলে
'বিমান আক্রমণের বার্তা কলিকাতা অঞ্চল'
কোথা? কোনখানে? জানাবেন কিছু, সেন্‌সারে সেটা মানা;
তোমাকে তখনি টেলিগ্রাম ছাড়া কুশল যাবে না জানা।
হয়ত বা কেউ দেশে ফিরে গিয়ে গুজব রটাবে হেঁকে -
'গুঁড়ো হয়ে গেছে হাওড়ার পুল এসেছে সে চোখে দেখে।
গঙ্গার জলে মরা ভেসে চলে সংখ্যা হয় না তার -'
এসব শুনে কি স্থিও হয়ে থাকা সম্ভব সেঁথা আর?
দুর্ভাবনার দুরন্ত চাপে অস্থির হবে মন,
তার চেয়ে আমি ঢের ভাল আছি সঙ্গে যতক্ষণ।'
কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে থেকে থেকে বিপদ-জ্ঞাপক বেণু
গৃহিনীর কাছে ছুটে চলি যেন উর্দ্ধ-পুচ্ছ ধেনু।
ছেলে মেয়েগুলো পড়েছে ঘুমিয়ে, তুলে নিয়ে কোলে কাখেঁ
নেমে আমি ভাই 'শেল্টারে' সব সিঁড়ির নীচের ফাঁকে।
কারণ, শুনেছি বাড়ী যায় ভেঙে, সিঁড়ি ঠিক থাকে খাড়া,
এমন সময় এ-আর-পি দেয় আলো নেভাবার তাড়া।
বন্ধ ঘরের অন্ধকারের করাল কবলে ঢুকে
মধুসূদনের নাম জপি দাদা ভয় কম্পিত বুকে।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

ঘন্টার পর ঘন্টা কাবার, কেটে যায় বুঝি নিশি-
মেয়ে জেগে বলে ‘জল খাব বাবা’, ছেলে উঠে বলে ‘হি-শি
গৃহিণীরে বলি - ‘চা পেলে একটু মন্দ হ’ত না, ওগো।
বিনা সিগারেটে ফুলে ওঠে পেট, একটু কষ্ট ভোগো -
চট্ করে গিয়ে প্যাকেটটা আরো জামার পকেট থেকে,
‘টর্চ’ নিয়ে যাও, হোচট খেয়োনা, উঠো নেমো সিঁড়ি দেখে-
গিন্নী যেমন যাবেন অমনি ‘দ্দুদুম’ আওয়াজ দূরে
‘ওরে বাবা গেছি।’ বলে ‘টর্চ’ ফেলে পত্নী আসেন ঘুরে।
‘এ-আর-পি’দের উপদেশ দাদা গ্রাহ্য করি নি, ভাই
শেল্টারে সব জোগাড় না-রেখে কেবলি কষ্ট পাই।
এই ভাবে দিন যেতেছিল বলে হয়নি পত্র লেখা
কৃষ্ণ পক্ষে পেয়েছি রক্ষে, নিশীথে ডাকেনি ‘কেকা’।
ছ’টা না বাজতে বন্ধ শহরে গাড়ী ঘোড়া বাস ট্রাম
সন্ধ্যার পর মনে হয় ভাই ‘কোলকাতা’ যেন গ্রাম।
‘পেট্রল’ হয়ে রোশান-গ্রস্ত মোটরে করেছে হিট্
গোদের উপরে বিষফোড়া যেন দেখা গেছে ‘পারমিট্’।
‘বিফল প্রাচীর’ ঘেরা চারিধার, ট্রেঞ্চ্ খোঁড়া আশে-পাশে,
নগর না যেন কবর ভূমি এ! দেখে শুনে মরি ত্রাসে।
নিষ্প্রদীপের শাসন বেড়েছে, ঠুলি ঢাকা সব আলো,
এখন বুঝেছি অমাবশ্যায় রাত কী নিবিড় কালো।
‘সাশি’, ‘আর্‌শি’ ‘বুকে কেস্’ ভায়া যেখানে যা ছিল কাঁচ,
চট, কানি, কাঠে ঢেকে দিচ্ছি সব বাঁচাতে বোমার আঁচ।
কেউ বলে - ‘ যেই সাইরেন্ হবে জানালা দরজা যত

খুলে রেখ' - সব - নইলে 'ব্লাষ্টে' হতে হবে বিব্রত।
কেউ বলে - 'না না, এঁটে রেখ' সব, হয় হোক্ চৌচির,
নইলে যে হবে খান্ডব-দাহ 'ইনসেন্‌ডিয়ারির।'
'ভাইব্রেশানের' বিভীষিকা আনে ভূমিকম্পের নাড়া -'
এ সব শুনে কি বুড়ো মানুষের ঠিক থাকে শিরদাঁড়া?
সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে আসি, খেয়ে নেই আটটায়,
কি জানি কখন আসে বাবাজীরা যে-রসিক ঠাট্টায়।
চাঁদের আলোয় করে আনা-গোনা চাঁদেয়া পুষ্প রথে,
খসে খসে পড়ে উল্কা-পিন্ড হাটে মাঠে ঘাটে পথে।
ফুকারিয়া ওঠে 'আগন্তুক-শিঙা' তীব্র আর্ত সুরে,
করে বিঘোষিত শত্রু আগত জ্যোৎস্না প্লাবিত পুরে।
ছুটে যায় ঘুম, শয্যা ছাড়িয়া সবই নীচেয় নামি,
পৌষ-প্রখর শীতের রাত্রে 'শেল্টারে' ঢুকে আমি।
দুই কাণ থাকে খাড়া হ'য়ে, যেন রজক - বস্ত্র - বাহী,
শব্দ শুনিলে স্মরি নারায়ণে, প্রাণ করে ত্রাহি ত্রাহি।
আকাশে বাতাসে মন্দ্রিয়া ওঠে বজ্র নিনাদে যেন,
পড়িছে হয়ত খুব কাছাকাছি মনে হয় ঠিক হেন।
সকালে উঠেই পড়ে খোঁজা খুঁজি - সবারই তাড়া -
কাল রজনীতে চুর্ণ হয়েছে কোনদিকে কোন পাড়া?
সবার মুখেই শুনি এক কথা, জটলা পাকায় যারা,
'আমাদেরই ছাদ প্রায় ছুঁয়ে নাকি উড়ে গেছে কাল তারা।'
আবার এসেছে শুক্ল-পক্ষ আবার উঠেছে চাঁদ,
সেই মায়াবিনী জ্যোৎস্না আবার পেতেছে বোমার ফাঁদ।

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

মাথার উপরে ঘোরে ঘর্ঘর কিবা দিন কিবা রাত,
হরেক রকম জঙ্গী বিমান ঃ- নগরে ‘বেলুন-ছাত’।
সারা দুনিয়ার বিদেশী সেনানী শহর ফেলেছে ছেয়ে,
সওদা করিয়া ফেরে পথে পথে শিস্ দিয়ে গান গেয়ে।
সকালে বিকেলে বেরুলেই দেখি সাদা কালো মেটে গোরা,
‘চৌরঙ্গী’র নাম এতদিনে সফল করেছে ওরা।
নিউজিল্যান্ডে কারো দেশ ভাই, কারু বা অষ্ট্রেলিয়া,
কেউ ক্যানাডার তরুণ সেনানী ঘুরিছে অস্ত্র নিয়া।
সঙ্গে তরুণী ফিরিঙ্গী মোটরে ফিটনে ঘোরে,
কারু বা জুটেছে ‘রিক্সা’ মাত্র, কেউ হাটে হাত ধরে।
ঘোরে মার্কিন ঈগলমার্কা, ব্রিটিশ জঙ্গী ‘টমি’
শিখ, রাজপুত, পাঠান গুর্খা, চীনেম্যান জে ‘মমী’।
নিউমার্কেটে যেতে ফুটপাথে কাঁধে কাঁদ যায় ঠেকে,
নির্ভাবনায় নবীন অবাক্ হই যে দেখে।
এইত’ প্রথম উঠেছে জীবনে ও যৌবনে,
চলেছে হেলায় প্রাণ দিতে তবু কী নিঃশঙ্ক মনে!
গীতার বচন ঝাড়েনাকো এরা, কিন্তু কাজের বেলা
মৃত্যুরে নিয়ে জীর্ণ বাসের মতই করিছে খেলা!
জননী জন্মভূমিতে এরাই শিখিয়াছে পূজিবারে,
যার মান লাগি প্রাণ দিত এল সপ্তসিন্ধু পারে।
যেন বা ‘টুরিষ্ট’ বেড়াতে এসেছে - লেগে আছে মুখে হাসি,
সিনেমার হলে ভীড় ক’রে আসে, ট্রামে বসে পাশাপাশি।
লিখেছ লাহোরে জিনিসপত্র কেনো তুমি চড়া দরে,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

জানোনা ত দাদা এখানে উঠেছে হাহাকার ঘরে ঘরে।
চাল ডাল দু'ইই সতেরো আঠারো, মণ দরে মন দমে,
আটা ময়দায়ত' ছোঁবার জো নেই তিরিশ টাকার কমে।
দশ আনায় কিনি গম-ভাঙ্গা ভেবে জোয়ার ভুট্টা রোতো,
'বাটা'র দোকানগুলো যদি হায় আটার দোকান হ'তো।
কয়লার মণ সাড়ে চার টাকা, গয়লা আসেনা আর,
ধোপা নাপিতেরা অদৃশ্য প্রায়, কেরোসিন মেলা তায়,
সর্ষেও তেল কিনতে গিয়েতো' দেখেছি সর্ষে ফুল।
নারিকেল তেল চড়েছে যা তাতে গিন্নী ছাঁটুন তুল।
পান সুপারির পাঠ তুলে দিয়ে হরিতকী খাই ভাই,
সিগারেট আর একটিন কিনে খাবার উপায় নাই।
হুইস্কী ব্রান্ডি অভাবে এখন 'ধোনো'ই হয়েছে সার,
'বর্ম্মাচুরুট' 'হাভানা' 'ম্যানিলা' মেনো কোথাও আর।
দু' টাকায় কিনে চায়ের পাউন্ড ভাবি বসে নিশি দিবা-
মধুর অভাবে গুড় চলে জানি, চিনির অভাবে কিবা?
রাত না পোহাতে সার বেঁধে পথে 'কন্ট্রোলে' কিছু কেনা-
দেখে যাও যদি বুঝবে কেন যে বাড়ছে মুদীর দেনা।
চিন্তামণিও চিনি নাহি পায় যোগাতে যে যায় চিনি,
একটা তুচ্ছ তামার পয়সা দুর্লভ যেন 'গিন্নী'।
'আনি' 'দু' আনিরা' উধাউ আজিকে ফাঁকি দিয়ে ট্যাকশালে,
সেই পুরাতন 'বিনিময়-প্রথা' হয়ত চলিবে কালে।
কিছু কেনা বেচা কঠিন এখন দোকানে বাজারে হাটে,
ট্রাম-কোম্পানী 'কুপন' না দিলে ব্যবসা উঠিত লাটে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

কমে গেছে গাড়ী লাইনে লাইনে, বেড়েছে লোকের ভীড়
সন্ধ্যে সকালে গাড়িতে যান হে বাদুওে বাঁধিছে নীড়।
ট্রেণের টাইমও বেঠিক এখন, ঘড়ির ধারেনা ধার,
বাড়ী-ফেরা নিয়ে ফ্যাঁসাদে পড়েছে ডেলির প্যাসেঞ্জার।
বেলা তিনটেয় থিয়েটার বসে, দু'টোয় সিনেমা শুরু-
ইস্কুলে প্রায় শুণ্য বেঞ্চি, চিন্তিত যত গুরু।
শশ্মানে এখন চুলি জ্বালা শুনি নিষেধ হয়েছে রাতে,
'বাসিমড়া' হয়ে পড়ে থাকা ভায়া, সয় কি হিদুঁর ধাতে?
বেলা চারটেয় মরি যদি তবে ভোর চারটের আগে
কেউ মুখে হায় দেবেনা আগুন-এ এক ভাবনা জাগে।
ঘাটের খরচও কর্পোরেশন বাড়িয়েছে সম্প্রতি
দেড়া মাশুলের কমে নাকি আর হবেনা মরণে গতি।
ঠাকুরের চাকর পলাতক ভায়া, ঠিকে ঝী ভরসা দিনে,
সোনা যদি হয় সস্তা কখনো দেব তাকে 'তাগা' কিনে।
দেড় টাকা সের মাছের বাজার, পাঁচসিকে হাঁকে খাসি,
ডনরামিষ আজও জুটেছে, হয়তো পরে রবো উপবাসী।
ন' টাকার কমে শাড়ী নেই আর, ধুতি চায় সাড়ে সাত,
গামছা নিয়েছে বারো আনা তাও মোটে সাড়ে তিন হাত।
দিগম্বরের দেরী নেই আর, আবার আদম-ঈভ্ -
মায়েরা হবেন শ্যামা বিবসনা মেলিয়া শুল্ক জিভ্।
বিংশ-শতকী সভ্যতা আজ খসে পড়ে ধাপে ধাপে,
ইঁদুর বিড়াল খেতে হবে শেষে চীনাদের অভিশাপে।
কোথায় লড়াই - কে করে যুদ্ধ - কারা বাঁচে কারা মরে?

*Dhaka University Institutional Repository*

উলু খগড়ার প্রাণ যায়, দাদা অন্ন বস্ত্র তরে।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যে ধেয়ে আসে ধীরে ধীরে,

যুদ্ধ-বিজয়ে শান্তি আবার দেখিব কি মোরা ফিরে?

আশা করি আছ কুশলে সকলে, ওখানে ত খুব শীত,

এখানেও বেশ ঠান্ডা পড়েছে কাঁপায় দেহের ভিৎ।

শীত বস্ত্রের অভাবে এবং পীতবর্ণের ভয়ে

কর্তা গিন্নী মিলে আছি যেন ‘ক’ রে ‘মুর্দ্ধণ্য-য’য়ে।

ব্রহ্ম-আসাম-বাংলায়-সীমা নহেত হে বেশী দূর,

আজ তবে আসি-প্রীতি নাও এই বোমা-ভীত বন্ধুর।

উৎসঃ fviZel, ফাল্গুন, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ২-৩, ১৩৪৯, পৃ. ২১১-১২।

## পরিশিষ্ট- ৪

## জাপানের জাতীয় সঙ্গীত

যতদিন এই বালুকার কণা

ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রতিহত

মেঘে-ঘেরা উঁচু শৈলচুড়ায়

নাহি হয় প্রতিহত।

যতদিনে এই শিশিরের কণা

সোনালী ফুলের পরে

ক্রমে বেড়ে বেড়ে বিরাট হৃদের

আয়তন নাহি ধরে,

ততদিন ধরি মোদের রাজার

হোক জয়-জয়কার,

হর্ষের পরে নুতন হর্ষ

জমুক জীবনে তাঁর।

উৎসঃ কালিদাস রায়, wkï-fviZx, ২য় খন্ড, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, পৃ. ৭৪৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

# আলোকচিত্র

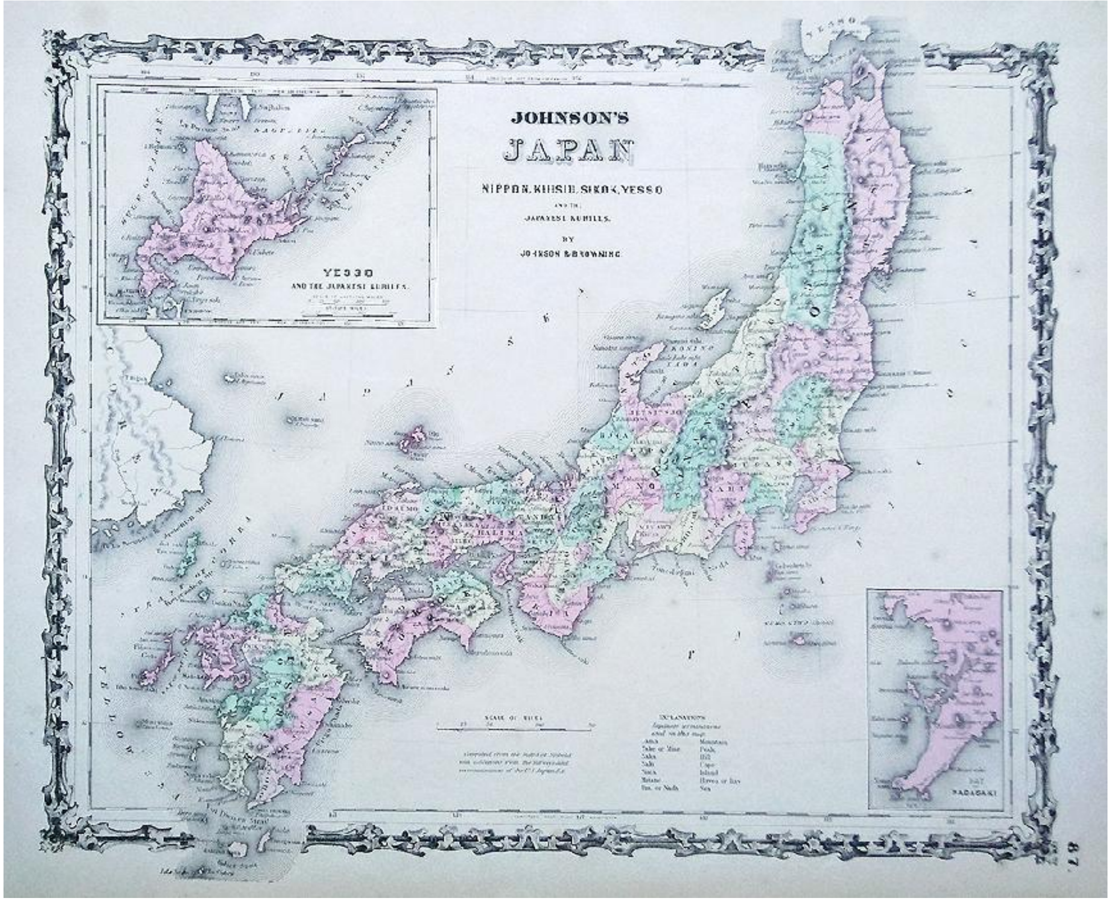


জাপানের মানচিত্র

উৎসঃ A. J. Johnson and Browning (1861), Johnson’s Japan Nippon, Nippon, Kisiu, Sikok, Yessoandthe Japanese Kuriles, retrieve from https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Japan-j-64.

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের জাতীয় পতাকা

উৎসঃ http://mayaincaaztec.com/foinanja.html

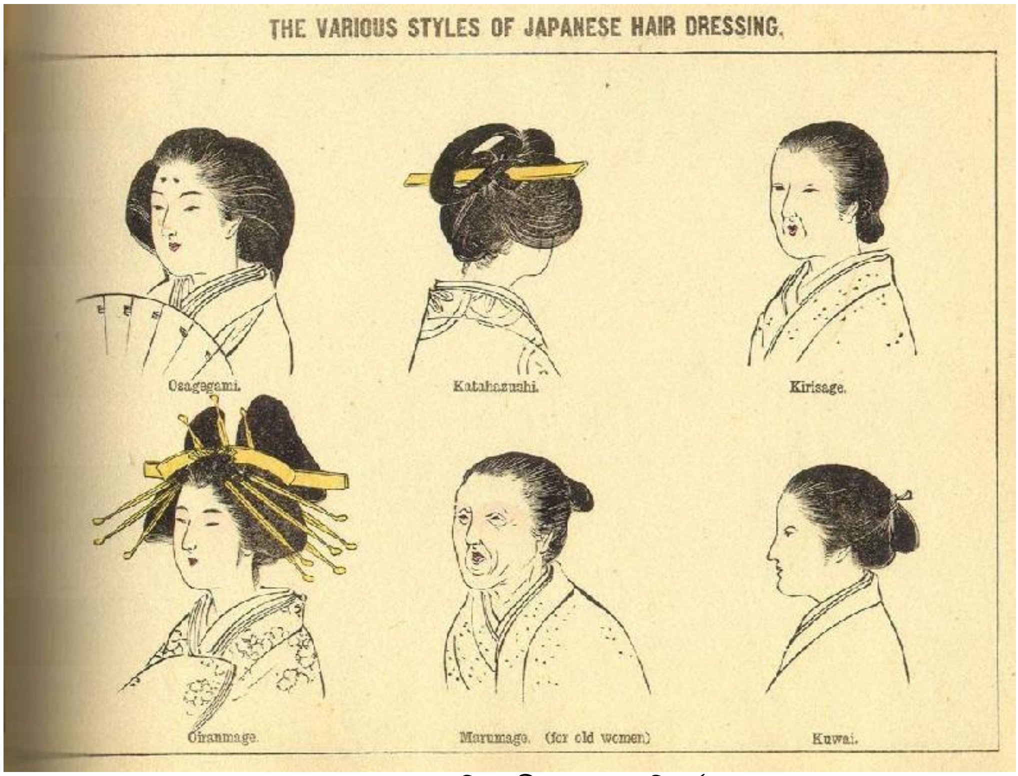


জাপানি নারীর কেশ পরিচর্যা

*Dhaka University Institutional Repository*

উৎস: http://mayaincaaztec.com/foinanja.html

জাপানি কিমোনো

উৎস: Ming-Ju Sun and Creative Haven (2013), Creative Haven Japanese Kimono Designs Coloring Book, Dover Publications Inc.: USA.

Dhaka University Institutional Repository

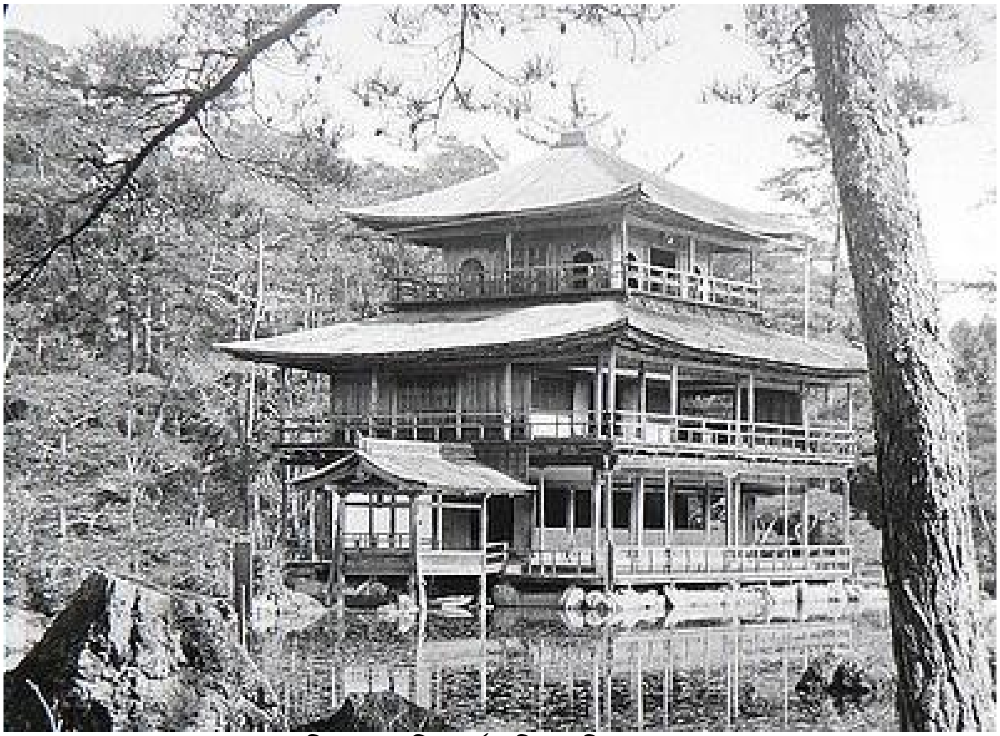

কিনকাকু-জি স্বর্ণ মন্দির, কিয়োতো

উৎসঃ https://www.flickr.com/photos/okinawa-soba/3286612676/

Dhaka University Institutional Repository

তোদাই মন্দির, নারা

উৎস:https://www.britannica.com/topic/Todai-Temple

নারার কেন্দ্রিয় মন্দিরে অবস্থিত দাইবুৎসু বুদ্ধ মুর্তি

উৎস:https://www.cntraveler.com/stories/2011-12-05/nara-where-japan-began-pico-iyer

*Dhaka University Institutional Repository*

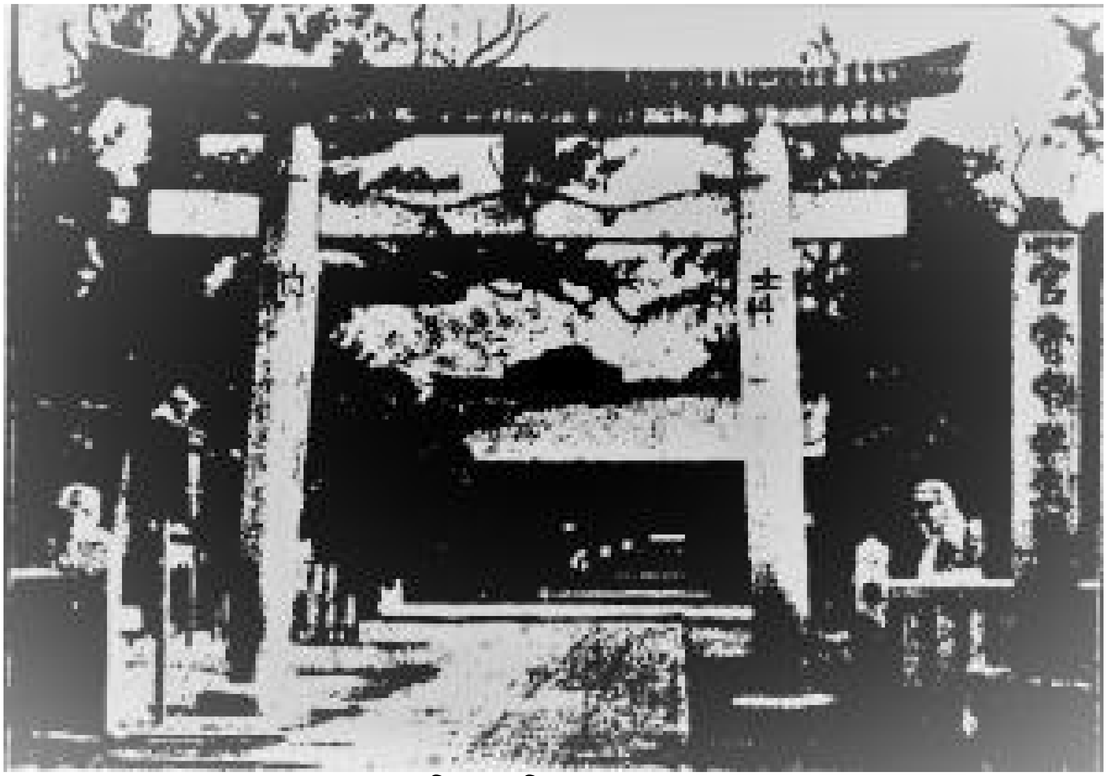

শিন্তো মন্দিরের তোরণ

উৎস: fiZel, আষাঢ়, বর্ষ ২৬, খন্ড ১, সংখ্যা ১, ১৩৪৫, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

উৎস:http://www.alamy.com/stock-photo-confucious-উৎস: প্রবোধচন্দ্র বাগচী, কোইয়া-সানের যাত্রী, cevmx, kon-fuziভাগ ২৭, খন্ড ১,আশ্বিন, ১৩৩৪, পৃ. ৮৪২।

চীনা দার্শনিক কনফুশিয়াস

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীন জাপানের খাদ্য পরিবেশন

উৎস:http://mayaincaaztec.com/foinanja.html

জাপানে চা পরিবেশন রীতি

উৎস:http://www.buddhamomtea.com/2016/05/

Dhaka University Institutional Repository

ইকেবানা

উৎসঃ http://moderntokyotimes.com/wp-content/uploads/2014/08/ikebana441.gif

সামুরাই

Dhaka University Institutional Repository

উৎস:https://sites.google.com/site/projectsamurai1010/

জাপনের প্রথম সম্রাট জিমু-তেন্নো

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

উৎস: প্রবোধচন্দ্র বাগচী, কোইয়া-সানের যাত্রী, প্রবাসী, ভাগ ২৭, খন্ড ১, আশ্বিন, ১৩৩৪, পৃ. ৮৪৩

| Hiragana (ひらがな) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | wa | ra | ya | ma | ha | na | ta | sa | ka | a | |
| ん n | わ wa | ら ra | や ya | ま ma | は ha | な na | た ta | さ sa | か ka | あ a | a |
| | | り ri | | み mi | ひ hi | に ni | ち chi | し shi | き ki | い i | i |
| | | る ru | ゆ yu | む mu | ふ fu | ぬ nu | つ tsu | す su | く ku | う u | u |
| | | れ re | | め me | へ he | ね ne | て te | せ se | け ke | え e | e |
| | を wo | ろ ro | よ yo | も mo | ほ ho | の no | と to | そ so | こ ko | お o | o |

উৎস:http://www.proposalbidsheet.com/hiragana-alphabet

Katakana (カタカナ)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wa ワ | ra ラ | ya ヤ | ma マ | pa パ | ba バ | ha ハ | na ナ | da ダ | ta タ | za ザ | sa サ | ga ガ | ka カ | a ア |
| | | ri リ | | mi ミ | pi ピ | bi ビ | hi ヒ | ni ニ | di ヂ | chi チ | ji ジ | shi シ | gi ギ | ki キ | i イ |
| | | ru ル | yu ユ | mu ム | pu プ | bu ブ | fu フ | nu ヌ | du ヅ | tsu ツ | zu ズ | su ス | gu グ | ku ク | u ウ |
| | | re レ | | me メ | pe ペ | be ベ | he ヘ | ne ネ | de デ | te テ | ze ゼ | se セ | ge ゲ | ke ケ | e エ |
| n ン | (o) ヲ | ro ロ | yo ヨ | mo モ | po ポ | bo ボ | ho ホ | no ノ | do ド | to ト | zo ゾ | so ソ | go ゴ | ko コ | o オ |

উৎস: https://www.jpvisitor.com/7-facts-you-probably-didnt-know-about-katakana

জাপানি লিপি

Dhaka University Institutional Repository

উৎস:লোপামুদ্রা মালেক (২০১২), সিদ্ধম্ লিপির ইতিবৃত্ত, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, সংখ্যা ২৩, পৃ. ২০৫।

*Dhaka University Institutional Repository*

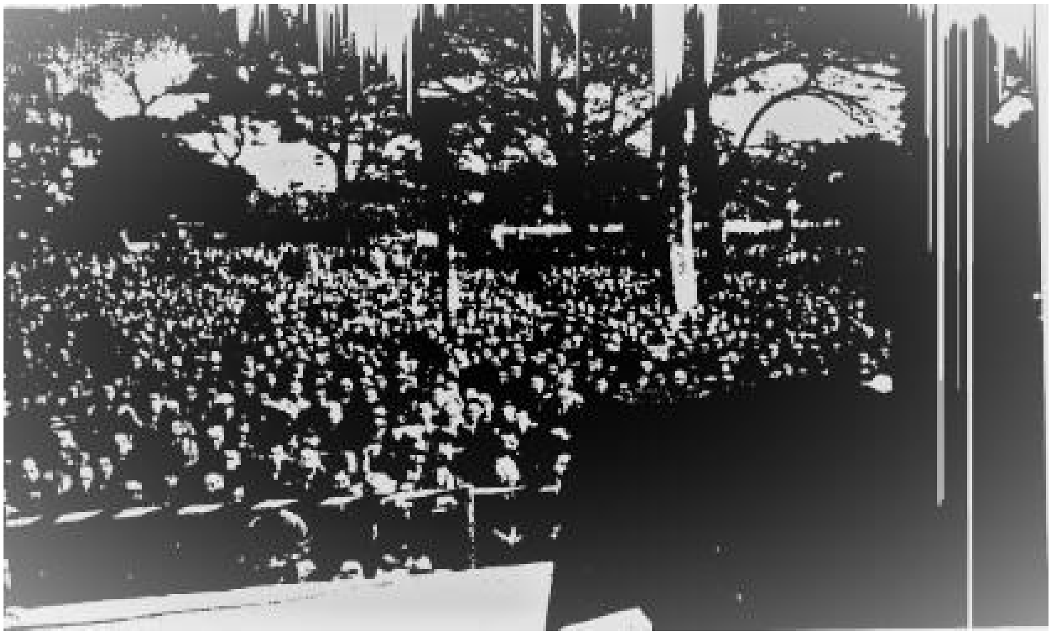

টোকিওতে বৃটিশ বিরোধী জনসভা

উৎস: শান্তা দেবী, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ভাগ ৩৮, খন্ড ১, সংখ্যা ২, ১৩৪৫, পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফুজি পর্বত

উৎস:নরেন্দ্র দেব (১৩৩০), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাপান, gwmK fviZel, কার্ত্তিক, ১১ বর্ষ, খন্ড ১, সংখ্যা ৫, পৃ. ৭৭০।

জাপানি গেইসা নৃত্য

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃhttp://www.dailymail.co.uk/femail/article-2366607/Memories-1950s-geisha-Stunning-photos

জাপানি আদিবাসী আইনু পরিবার

উৎসঃhttp://www.larskrutak.com/tattooing-among-japans-ainu-people/

জাপানি বাড়ির চা এর আসর (চা-নো-উ)

উৎসঃনরেন্দ্র দেব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাপান, fviZel, কার্ত্তিক, বর্ষ ১১, খন্ড ১, সংখ্যা ৫, ১৩৩০, পৃ. ৭৬৫

*Dhaka University Institutional Repository*

জাপানি অতিথি সেবা

উৎসঃ নরেন্দ্র দেব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাপান, f¨iZel, কার্ত্তিক, বর্ষ ১১, খন্ড ১, সংখ্যা ৫, ১৩৩০, পৃ. ৭৭৫

Dhaka University Institutional Repository

জাপানি কাবুকি নাটক

উৎস: http://www.janm.org/collections/item/97.292.4S/

জাপানি নো নাটক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় জাপান চর্চা

উৎসঃ http://minerva.union.edu/japan2008/Noh.html

তৎকালনি আধুনিক জাপানি তরুণী

উৎসঃ fviZel, আষাঢ়, বর্ষ ২৬, খন্ড ১, সংখ্যা ১, ১৩৪৫, পৃ. ৬৮

জাপানি নারী

উৎসঃ পারুল দেবী, জাপানে কয়েক দিন, cevmx, বৈশাখ-আশ্বিন, ভাগ ৩৫, খন্ড ১, ১৩৪২, পৃ.৪৮৯

চট্টগ্রামের ওয়ার সেমেট্রিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানি সৈনিকদের নামাঙ্কিত সমাধিফলক
উৎস: গবেষক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থল চট্টগ্রামের ওয়ার সেমেট্রি

*Dhaka University Institutional Repository*

উৎস: গবেষক

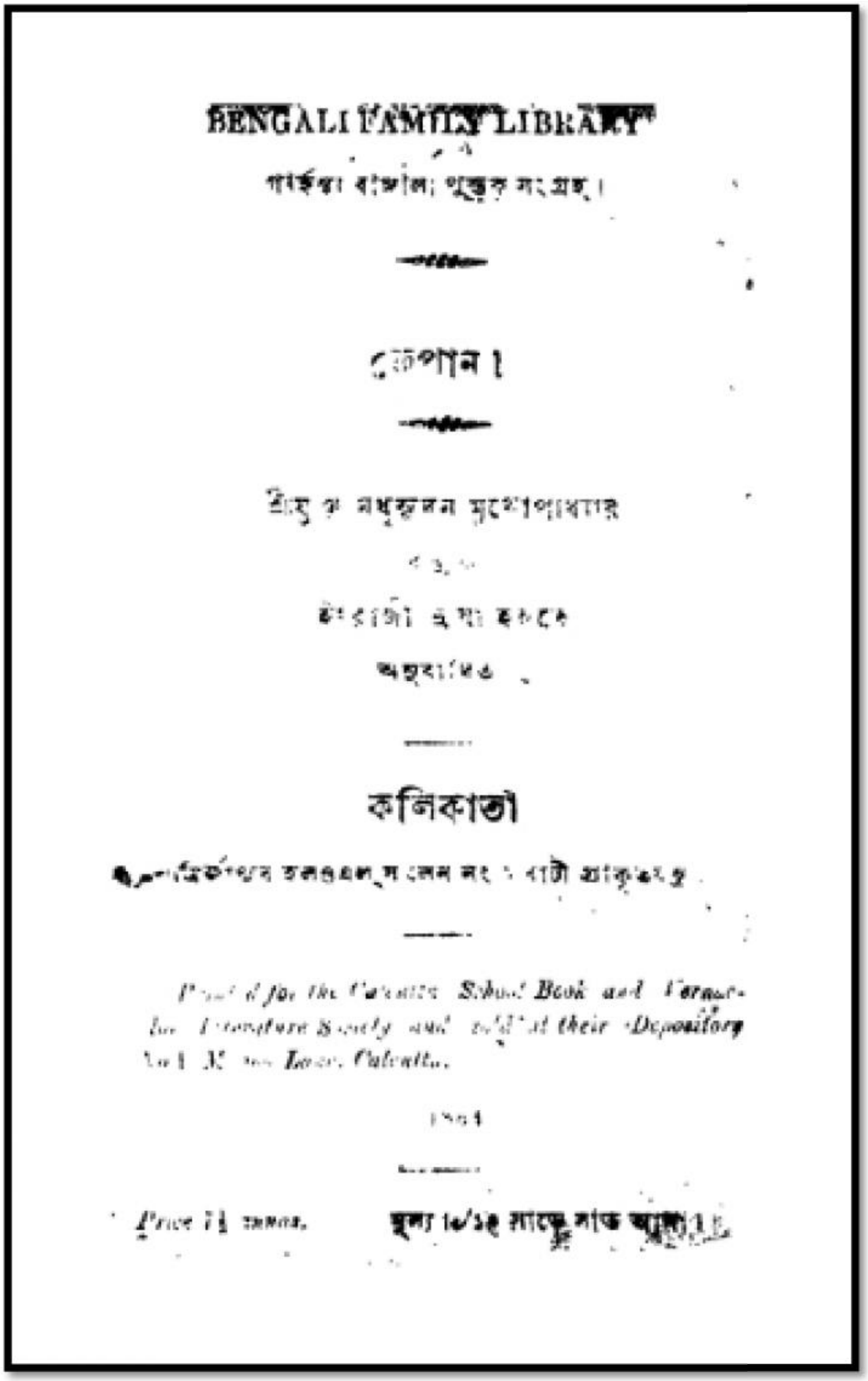
BENGALI FAMILY LIBRARY

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

জেপান।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী হইতে

অনুবাদিত

কলিকাতা

বাংলা ভাষায় লিখিত জাপান সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Dhaka University Institutional Repository

# জাপান-প্রবাস।

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ, এম্, সি, ই, (জাপান)

প্রণীত।

PUBLISHED BY
S. BANERJEE
FOR THE EMPIRE LIBRARY
*57/1 College Street,* CALCUTTA.
1910.

PRINTED BY M. GHOSE
College square, CALCUTTA.

*All rights reserved.* ] [ মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

মন্মথ নাথ ঘোষ রচিত জাপান-প্রবাস গ্রন্থের প্রচ্ছদ

*Dhaka University Institutional Repository*

দর্পণে

( জাপানী চিত্র )

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ]

জাপানি নারীর সাজসজ্জা

Dhaka University Institutional Repository